সাঁকো

দ্বাদশ বার্ষিক পত্রিকা

সম্পাদকীয়

'সাঁকো'র সান্মাষিক প্রকাশনার শুরু ২০১৪-তেও হল না। ২০১৪-র মত ভেতর ও বাহিরে ভালমন্দ মেশানো ঘটনাবহুল এত অস্থির বছর এর পূর্ব্বে ১৯৯১ ছাড়া মনে হয় 'টেম্পার কারখানা'র প্রায় চল্লিশ বছরের চলার পথে অভিজ্ঞতা হয়নি।

আমাদের শ্রদ্ধেয় Auditor ও শিক্ষক শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, বিপ্লবদার মামাত ভাই, বিমল স্যারের স্ত্রী, শ্যামলদার বেয়ান, অঞ্জনদার দাদা, তমালদার মেজবৌদি, পল্লবদার মা, দেবাশীষের ছোটবেলার বান্ধবী, বিমলের দাদা (আমাদের যখন ক্যান্টিন চলত তখন মাছ দিত), অভিষেকের মা-র মত আপনজনেদের আমরা হারিয়েছি এ বছর। তমালদার মেজবৌদি মরনোত্তর চক্ষু ও দেহদান করেছেন। সুচিত্রা সেন-পিট সিগার-কথক সাম্রাজ্ঞী সিতারা দেবীর মত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরাও এ বছর মারা গেছেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিক গার্সিয়া মার্কেজ, সংবেদনশীল ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী, সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার ফিলিফ হিউজকেও আমরা হারিয়েছি। এর বাহিরেও সামাজিক সংঘাতে প্রায় রোজই সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটছে। সবাইকে জানাই প্রণাম।

১৯৯১ সালে বিশ্বায়ণের নামে এক মেরু বিশ্ব ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর, দেশের বাজার সারা দুনিয়ার কাছে খোলা শুরু হয়েছিল, রাজ্যের শিল্পে মন্দা দশার মধ্যে আমাদের কারখানা আগুনে ভস্মীভূত হওয়া সহ সংকটে আমরা ভেঙ্গে গিয়েছিলাম।

২০১৪-য় বিশ্বায়ন মনে হয় চরম পর্যায়ে পড়েছে বা শীঘ্রই পৌঁছবে। কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সহ ধর্ম্মীয়, ভাষাগত, বর্ণগত, লিঙ্গগত, বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী, জাতিগত প্রভৃতি মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা ভেদাভেদগুলি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্রুত বাড়ছে। ফলস্বরূপ পেশোয়ার-প্যালেস্তাইন-মধ্যমগ্রামের মত পাশবিক প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে। দুর্নীতি, আনবিক যুদ্ধের আশঙ্কা, পরিবেশ দূষণ, ... এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে পৃথিবী চিরস্তরে ধ্বংসের আশঙ্কাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ঠিক ১০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল বিশ্বব্যাপী ধ্বংসস্রোতের খেলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায়। এই মরণ খেলার শতবর্ষপূর্তি চলেছে মনে হয়, তাই সহজে শেষ হবে না।

আয়ের বৈষম্য ও তার বৃদ্ধির গতি নির্ধারণে চলেছে বিশ্বব্যাপী নানান গবেষণা। আমেরিকাসহ উন্নত দেশের উপরের ১% মানুষের আয় দেশের মূলধনের বৃদ্ধির তুলনায় দ্রুত বাড়ছে। ভারতবর্ষের মত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশেও এই প্রবণতা ১৯৮০ সালের পর থেকে লক্ষ্য করা গেলেও ১৯৯৯ সালের পর থেকে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এমনকি ১%, ০.১% এবং ০.০১% মানুষের মধ্যে তুলনা করলে ০.০১% মধ্যে সর্বাধিক। নেহেরুর পরিকল্পনার সময় (১৯৫০ থেকে ১৯৭০) বৈষম্য বৃদ্ধি ঋণাত্মক ছিল বলে টমাস পিকেটি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রমাণ করেছেন All India Income-Tax Statistions (AIITS) বিশ্লেষণ করে। ওনারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ৮০-র দশক শুরু পর্যন্ত দেখিয়েছেন সারা পৃথিবীতেই আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি আজকের তুলনায় অনেক নিয়ন্ত্রিত ছিল। আজকের আমেরিকায় উপরের ১% মানুষের সম্পদের পরিমান বাকীদের তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের সময়কালের স্তরে পৌঁছে গেছে।

সংকটের ব্যাপ্তি বা গভীরতা, ১৯৯১ তুলনায় অনেক বেশী ছিল এবছর। Usha Telehoist চিরতরে বন্ধের দিকে এগোচ্ছে, তাপ প্রক্রিয়াকরণের কাজ ও বকেয়া 30 laks টাকা উভয়েই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। Spiral Knife-এর বাজারে গ্রহণযোগ্যতা বাড়লেও দেশের সর্ব্ববৃহৎ চামড়া উৎপাদন কেন্দ্র কানপুরে নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের গঙ্গা দূষণ আটকানোর পরিকল্পনার ফলে Raw চামড়া থেকে Semi Finished Product তৈরি কমিয়ে আফ্রিকা ও ব্রেজিল থেকে আমদানী শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থা যত কার্যকরী হচ্ছে ততই দেশীয় বাজারে ছুরির চাহিদা কমছে। হলদিয়ায় পরিকল্পিতভাবে যে শিল্প সম্ভবনা তৈরী হয়েছিল তা পাল্টে গেছে বিগত তিন বছরে। বন্দর ধুঁকছে, মিৎসুভিসি লোকসানে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বিগত পাঁচ মাস বন্ধ। ফলে আমাদের হলদিয়ায় স্থায়ী site এর পরিকল্পনা বানচালের পথে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিল বিদ্যুৎ উদ্ধৃত্ত রাজ্য হিসেবে। কিন্তু নতুন শিল্প প্রায় না হওয়া এবং চালু শিল্প এক এক করে বন্ধ হওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা কমছে। ফলে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি রূপায়িত হতে নানান সমস্যা তৈরি হচ্ছে আর চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব ঘটছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকেও কাজের নিশ্চয়তা দ্রুত কমছে। সবমিলিয়ে আমাদের মোট কাজের সুযোগ মাত্র ১০% রাজ্যের মধ্যে থেকে হচ্ছে। দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ১% এরও অনেক নীচে নেমে আসায় রাজ্যের বাহিরেও কাজ খুবই প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক দাদাদের গাজোয়ারি ও তোলাবাজী সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্নীতি, প্রশাসনের নিষক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে। সারদা কান্ড বা বর্ধমানে বিস্ফোরণের ঘটনা প্রমাণ করছে গভীর সামাজিক ষড়যন্ত্রের যার সঙ্গে যোগাযোগ দেশ ও বিদেশের উপরতলার দুর্নীতিবাজদের। স্বাধীন রাজনৈতিক মত প্রকাশ পঞ্চায়েত-লোকসভা নির্বাচন সহ সর্ব্বত্রই আক্রান্ত। বিরোধী দল দিয়ে শুরু হলেও প্রশাসন এমনকি নিজের দলের ভিন্ন কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রাজ্যে ৭০ দশক থেকেই নিম্নমুখী। তার ওপর ঐতিহ্যবাহী সাইন্স কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সীর মত প্রতিষ্ঠানগুলিতে শাসকদল বা প্রসাশনের তান্ডব চলছে। শিক্ষায় বাণিজ্যকরণের প্রভাবে সাধারণ মধ্যবৃত্ত ও নিম্নবৃত্ত মানুষের সাধ্যের বাহিরে চলে যাচ্ছে দ্রুত শিক্ষার খরচ। স্কুল বা কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার পরিকাঠামো ও সুযোগ ভারতবর্ষে অনান্য রাজ্যের তুলনায় কিছুটা সামনের দিকেই পৌঁছেছিল বিগত সরকারের শেষের দশ বছর, ৭০ দশকের অরাজক অবস্থা থেকে। কিন্তু বিগত

কয়েক বছরে আবার অরাজকতা ফিরে এসেছে। শিক্ষকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, গণটোকাটুকি ফিরে এসেছে, শিক্ষক নিয়োগ বা ছাত্র ভর্তি ক্রমেই শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। গ্রামে চাষীর উৎপাদন খরচা বাড়লেও মূল্য পাচ্ছে না কিন্তু ফোড়েদের দাপটে বাজার অগ্নিমূল্য, অনাহারে আত্মহত্যা বাড়ছে, জমি কেড়ে নেওয়াও শুরু হয়েছে। এককথায় 'সমাজবিরোধীদের সরকার চলছে রাজ্যে', প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর এটা কেবল কথা নয়, এখন এটা গরিষ্ঠাংশ রাজ্যবাসীর কঠিন উপলব্ধি। স্বচ্ছতা ও উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে মোদীজীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল বিজ্ঞাপন বাবদ ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করে এবার ষোড়শ লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মোদীজির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এত ব্যায়ের ফলে এবারের লোকসভার সদস্যদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১৫.৪ কোটি যা আগের লোকসভার তুলনায় প্রায় তিনগুণ। ভারতবাসীর ভরসা, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ক্রমেই সাধারণ ভারতবাসীর কাছ থেকে দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ নতুন শ্রম আইন সংস্কারের অনুমোদন, রেগার সংকোচন প্রভৃতি সরকারের ২০০ দিনের মধ্যেই ঘটেছে। প্রায় ৮০% শতাংশ শ্রমজীবী মানুষের চাকরীর আইনী নিশ্চয়তা এবং গ্রামে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা কমতে শুরু করেছে। এর বাহিরে ৬০০-র উপরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে নতুন সরকারের আমলে। আসামে ও উত্তরপ্রদেশে আমাদের সদস্যরা যথেষ্ট উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। এই রাজ্যেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দুর্গ হিসেবে দেশবাসী মনে করত স্বাধীনতার পর থেকে, এই ধারণাও দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আমরাও শঙ্কায় আছি। আমাদের মত আরব-তুরস্ক-ইউক্রেনের মানুষও মৃত্যুর আশঙ্কায় রয়েছেন। ইউরোপ-আমেরিকায় চলছে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ— কখনও বেকারীত্বের জন্য, কখনও বর্ণ বিদ্বেষের জন্য, কখনও বা জিনিষের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার জন্য। ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্রুত বৃদ্ধিই হল মূল কারণ আর বাকী ভেদাভেদ সব তার ফল।

সাম্প্রতিককালে (১) অন্ধ্র ও ওড়িশার উপর দিয়ে 'হুদ হুদ' নামক প্রাকৃতিক ঝড়ের পূর্বাভাষ বিজ্ঞানের তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে আগাম মেলায় প্রায় ৭ লক্ষ্য মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ফলে ভাইজ্যাক শহরের ক্ষতি হলেও জীবনহানি প্রায় ঘটেনি, (২) দেশের মহাকাশ বৈজ্ঞানিকরা সফলতার সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের কক্ষে নিজেদের প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি মঙ্গল যান স্থাপন করেছেন আর এই সফলতার জন্য ব্যায় করেছেন মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা, আমেরিকার NASA-র মঙ্গলযাত্রায় (MAVEN) খরচের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ, (৩) মধ্যপ্রদেশের সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থী আর প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থানের ১৭ বছরের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। মালালা মুসলিম মহিলাদের শিক্ষা প্রসারে জন্য আর কৈলাসজী শিশু শ্রমিক উদ্ধার করে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য,.....। অন্ধকার সময়ে এইসব ঘটনা ভোরের সূর্য্যের মত।

গত সম্পাদকীয়তেই 'জয় করার তাগিদ'-এর উল্লেখ ছিল। একে ভরসা করেই চলতি বছরের সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হয়েছি তুলনায় বেশী পরিকল্পিতভাবে একসাথে। সদস্যদের চারপাশ বা পরিবারেরও এর প্রভাব পড়েছে। ফলে ১৯৯১ সালের মত বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত না হয়ে এগোন সম্ভব হয়েছে সবমিলিয়ে। অনেকক্ষেত্রেই পিছিয়েও পড়েছি তবে পিছনোর গতি কমান গেছে। এমনকি পরাজয় বা মৃত্যুর মত ঘটনাও আমাদের আগামীদিনের পথচলায় বেশ কিছু উপাদান রেখে গেছে জয়ের বা বাঁচার। যেমন (১) কারখানায় সংকটে বন্ধের বিজ্ঞপতি পড়েছিল বছরের শুরুতেই, এরসাথে নানান প্ররোচনাও ছিল কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে কারখানা খোলা রাখা গেছে। সরকারী স্তরে অভিযোগ সত্ত্বেও কোন অনিয়মের প্রমাণ হয়নি। কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছুটা উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, নতুন একটি নিরাপত্তামূলক সমগ্রী (Electrode Lifter) তৈরি করা গেছে, Shed-এর প্রয়োজনীয় জরুরী repair হাত দেওয়া হয়েছে। (২) Bank এর সহায়তা প্রায় বছর খানেকের ধারাবাহিক চেষ্টায় অবশেষে দ্বিগুণ হয়েছে বছরের শুরুতে। সর্ববৃহৎ সরকারী ব্যাঙ্ক State Bank of India-র পূর্বাঞ্চলে (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে) নানান নিয়মের বেড়াজালে সহায়তা সঙ্কুচিত করা হচ্ছে ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে। (৩) আমাদের ১৯৯৫ সালে বন্ধ হওয়া সংস্থা Treatrite Product-এর ব্যাঙ্কের বকেয়া সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ আইনী জটিলতার পর। সংস্থার প্রাক্তন এক নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্য আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই পথচলায় ছিলেন এবং বকেয়ার অর্ধেক নিজে বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (৪) ম্যাঙ্গালোর ও বীনা দুটো ক্ষেত্রেই আমরা সফলতার সঙ্গে কাজ শেষ করেছি। Client ও তার Consultant, সরকারী Approval সংস্থা সমেত সবাই এই জটিল কাজে আমাদের সমাধান সূত্রের সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন। (৫) আপনজনেদের দুঃখজনক মৃত্যু সাধ্যমত চেষ্টা করেও অনেকগুলি ঠেকানো যায়নি কিন্তু অনেকক্ষেত্রে মৃত্যু বিজ্ঞানের অনুমানের চেয়ে বেশখানিকটা পেছন গেছে, ফলে 'War against Cancer'এর মত বিশ্বব্যাপী যে মরিয়া উদ্দ্যোগ জারি আছে তাতে আমরা অনেকবেশী আস্তঃবিশ্বাসী হয়ে সামিল হতে পারছি মৃতের স্ত্রী, বাবা ও মায়ের সাথে অথবা বিচ্ছেদের পরিবর্তে মেয়ে মায়ের মৃত্যুর পর বাবার কাছে স্বইচ্ছায় ফেরত গেছে। (৬) বাৎসরিক অনুষ্ঠানের July-Aug. মাসে পরিকল্পনার স্তরে বেশ দ্বিধা ছিল সংকটের সামগ্রিক কারণে। বেশ কিছু অগ্রণী সদস্য কাজের চাপে ছিলেন খুবই ব্যস্ত। নতুনদের অংশগ্রহণ ও অগ্রণীভূমিকা এবং অবশ্যই পরীক্ষিত কিছু অগ্রনীর অবিচল নেতৃত্ব এবারের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এর সাথে নতুন গানের সাথীদের মিলিত প্রয়াস বোধহয় শিল্প বৈচিত্র্যকে অনেকটাই সম্পূর্ণ করেছে। (৭) সংস্থার স্বউদ্দ্যোগ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে সদস্যদের পরিবার ও পরিবৃত্ত থেকে স্থায়ী অংশগ্রহণের বাস্তব সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। ফলে বার্ধক্য বা অন্যান্যকারণে সদস্যদের চলে যাওয়া আগেরমত ফাঁক তৈরি করতে পারছে না। ক্ষেত্রবিশেষে নতুনের সংযোজনও ঘটেছে ...। চরম প্রতিকূলতা বা ধ্বংসের তান্ডবের মধ্যে চারপাশে অবশিষ্ট সমস্ত সৃজনশীল ও মানবিক উপাদানগুলিকে সাধ্যমত খুঁজে এক করে সংকটের মুখোমুখি হলেই কেবল বাঁচার রাস্তার সন্ধান মিলছে। চরৈবেতি, চরৈবেতি...।

সাঁকো, ৩৯/৩ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৪ হইতে প্রকাশিত ও লেজার ম্যাট কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

বেঁচে থাকার গল্প, গল্পের বেঁচে থাকা	অরিত্র ভট্টাচার্য	৫
বিজ্ঞানচর্চার সংস্কৃতির পরিবর্তনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	রবীন মজুমদার	৬
স্মরণ (উৎসর্গ শিবনারায়ণ রায়কে)	উৎপল মিত্র	৮
রডোডেনড্রন	দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়	৮
প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিজ্ঞানে নারীর ভূমিকা	নন্দিনী মুখার্জী	৯
রাজা রামমোহন, সতীদাহ ও আমরা	স্বপন দত্ত	১১

শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ

ভূতের সঙ্গে কিছুক্ষণ	মল্লার দাশগুপ্ত	১৩
হৈ নাট্য গোল	অপর্ণা চক্রবর্তী	১৪
পরিশ্রম সার্থক	অন্তিমা পাল	১৫
ভূ-স্বর্গের কোলে	মুদ্রা	১৭
Pie in the Sky	Raddur	১৭
Poverty	Deepanjana Roy	১৮
THE SUN:IT'S STORY AND MYSTERY	Abir Sarkar	১৯
কলম নিয়ে কথা	অনির্বাণ রায়	২৩
প্রথাগত শিক্ষা : সীমানার জরিপ	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২৭
শেষের শুরু	গার্গী সরকার	২৯
সন্ধি হোক বয়ঃসন্ধিতে	ডাঃ বাণী দেব	৩০
রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র	কেশব ভট্টাচার্য	৩২

ভ্রমণ ও সমাজ বিজ্ঞান

অন্নপূর্ণার অঙ্গনে	গৌতমাদিত্য ভট্টাচার্য্য	৩৪
A Mythical Letter from Roopkund	Manas Hira	৩৯
সংস্কৃতির রাজনীতি, রাজনীতির সংস্কৃতি	কিন্নর রায়	৪৩
চঞ্চুতে ধরেছি মৃত কীট	দেবজিৎ চক্রবর্তী	৪৮
মানুষ হওয়ার এই মিছিল	শাশ্বত ব্যানার্জী	৪৯
পাশবিক	সঞ্জয় সিংহ	৫৪
বৃহত্তম বাম জোটের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই	বর্ণালী মুখার্জী	৫৫
A collative effort (cut & paste?) to depict the nature of Neo-liberalism	A. M.	৬২

কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ

চক্রবুহ্য	অনুপম দাশশর্মা	৭৩
আহ্বান	অমিতোষ হালদার	৭৩
সেই প্রভাতে	অনুপম চক্রবর্তী	৭৩
দুটি কবিতা	মনোতোষ চক্রবর্তী	৭৩
কবিতাগুচ্ছ	অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়	৭৪
আমার অনন্ত অনন্ত-র আমি	অনন্ত গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫
মানক	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫
ডিম	পল্লববরন পাল	৭৬
সেই লোকটা	ভবানী ঘটক	৭৮
রিয়্যালিটি শো	আইভি চট্টোপাধ্যায়	৮৩
পিয়া ভোল অভিমান	দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী	৮৯
বিরহিণী	শুভ্রা পাল	৮৯
টেনশান	সুব্রত ভট্টাচার্য	৯০
কাল	রাজু দাশ	৯২
অনুগল্প	পারমিতা	৯৩
আজকের খুশি	গার্গী সরকার	৯৩
Woman in Theatre	জয়শ্রী ভূষণ	৯৪

হাতে আঁকা

অনিন্দিতা সাউ	১২
দেবাংশী চক্রবর্তী	১৬
রিয়া জানা	১৬
ঈশিকা ঘোষ	১৬
শিবাঙ্গী চ্যাটার্জ্জী	২৬
মৌমিতা বসু	২৬
অলংকৃতা দত্ত	৩১
মেঘা পাত্র	৩৩
রাজদ্বীপ ঘোষ	৩৩
সত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য ও সত্যব্রত ভট্টাচার্য	৭১

স্মৃতিচারণা - প্রেরণা

বেঁচে থাকার গল্প, গল্পের বেঁচে থাকা

অরিত্র ভট্টাচার্য

অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু কাস্ত্রোর সঙ্গে।

'সাঁকো' পত্রিকার সংখ্যা যখন আপনাদের হাতে এসে পৌঁছবে তখন এক লম্বা বছরের বিদায়বেলা। প্রতি বছর এরকম এক বিদায় লগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা যখন পিছন ফিরে তাকাই, দেখতে পাই এমন কিছু মানুষের পদচিহ্ন যাঁরা হয়তো আর কোনোদিন পথ হাঁটবেন না, কিন্তু যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর বহু মানুষকে অন্যভাবে পথ হাঁটতে শিখিয়েছেন, বহু পথ তৈরি করেছেন তাঁদের কীর্তির মধ্য দিয়ে। আমার এই প্রবন্ধে তাঁদের-ই একজনকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। তিনি হলেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, জন্ম ৬ মার্চ ১৯২৭, মৃত্যু ১৭ এপ্রিল ২০১৪। তাঁর প্রথম উপন্যাস *Leaf Storm* প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে প্রায় সুদীর্ঘ অর্ধ শতক ধরে তাঁর কলম আমাদের কখনো রেখেছে বাস্তবের জগতে, কখনো আমাদের নিয়ে গেছে এক অদ্ভুত মায়ার দুনিয়ায়। সমাজের সাধারণ, নিঃসঙ্গ, অত্যাচারিত মানুষের বাস্তব দুঃখ কষ্টই স্থান পেয়েছে তার এই নিজস্ব যাদু বাস্তবতার (Magic Realism) দুনিয়ায়।

একজন কলম্বিয়ান লেখক হিসাবে তিনি বেড়ে ওঠেন চরম সামাজিক এবং রাজনৈতিক হানাহানিকে সাক্ষী রেখে। তার মধ্যে প্রধান দুটি ঘটনা হল—১৯২৮ সালে ঘটা কলা বাগানের শ্রমিকদের বিদ্রোহ এবং ১৯৪৮-৫৩-র আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। কলা বাগানের শ্রমিকদের বিদ্রোহ কলম্বিয়ার ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে শুধুমাত্র 'Violence' নামে। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই বিদ্রোহ দমন করা হয় চরম দমননীতির সাহায্যে। এর ফলস্বরূপ, এই বিদ্রোহে কয়েক লক্ষ শ্রমিক নিহত হন এবং প্রায় সমসংখ্যক শ্রমিক, মহিলা, শিশু নির্বিশেষে নিখোঁজ হয়ে যান চিরতরে। তাঁর *One Hundred Years of Solitude* (1967) উপন্যাসে তিনি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী রেমেদিওস-এর মৃত্যুকে শান্তভাবে, সশরীরে, ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হয়ে আকাশের সুদূর দিগন্তে হারিয়ে যাওয়ার 'যাদু' চিত্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আমরা তখন ভাবতে বাধ্য হই, এই যাদু-ই কি আমাদের জীবনে, ওই মৃতভাগ্য কলাবাগানের কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও তাদের যুবতী স্ত্রী ও পুত্রদের জীবনে একমাত্র বাস্তব নয়! আর এভাবেই তিনি মুছে দেন যাদু এবং বাস্তবতার সূক্ষ্ম সীমারেখা। এর পরবর্তীকালে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ অবধি চলা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে প্রায় ১৫০,০০০ কলম্বিয়ান মারা যান, গ্রামের পর গ্রাম ভীষ্মভূত হয়ে যায় ও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে মার্কেজ-এর লেখনীতে *The Evil Hour* (1962) উপন্যাসে। এভাবে দুই বিদ্রোহে প্রায় তিন লক্ষ স্বদেশবাসীর মৃত্যু এবং নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দেখে তিনি বলেছিলেন, লাতিন আমেরিকার লেখকদের সমস্যা গল্প উদ্ভাবন করা নয়, বরং ঠিক উল্টোটা, তাদের জীবনের বাস্তবকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। ("In Latin America. . .artists have had to invent very little. Infact their problem has been just the opposite; making their reality credible"—Marquez)

কিন্তু প্রতিবাদ-ই তাঁর উপন্যাসের শেষ কথা নয়। এই ধ্বংসলীলার মধ্যে থেকেও তিনি খুঁজেছেন মানুষের শাশ্বত ইতিহাস, নিজস্বতা, ভালোবাসা। স্মৃতি, সময় ও ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর গল্পের গ্রাম মাকোন্দোর মত গ্রাম হয়তো সময়ের স্রোতে ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তা থেকে তৈরি হয় এক নতুন গল্প, বেঁচে থাকার গল্প, ভালোবাসার ইতিহাস। তাই *Love in the time of Cholera* (1985) উপন্যাসে সমগ্র শহর কলেরায় আক্রান্ত হলেও চিররোমান্টিক ফ্লোরেন্টিনো আরিজা বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে তার প্রেমিকা ফারমিনা দাজার জন্য বুকে ভালোবাসা নিয়ে। এক ভয়ঙ্কর মহামারীর পর, প্রায় ৫২ বছর পেরিয়ে সে কাছে পায় তার প্রেমিকাকে। ততদিনে সময় তাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে যৌবন। কিন্তু পারেনি তাদের ভালোবাসার স্মৃতিকে মুছে দিতে। তেমনই আবার *No one writes to the Colonel* উপন্যাসে কর্নেল বেঁচে থাকে শুধু এই আশায় ভর করে যে তার ছেলের চিঠি একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসবেই। কিন্তু দিন, মাস, বছর কাটে, কেউ কর্নেলকে চিঠি লেখে না। এভাবেই বয়ে চলে একজন ফ্লোরেন্টিনো আরিজার গল্প। একজন কর্নেলের গল্প, তৈরি হয় নিজস্ব পদচিহ্ন। যা ধীরে ধীরে সম্মিলিত হয়ে হয়তো কখনো তৈরি করবে এক সুদৃঢ় রাস্তার, যে রাস্তা অন্যের অধিকারকে পদদলিত করার বদলে অধিকার দেবে সবাইকে নিজস্ব পথ তৈরি করার, জন্ম দেবে নতুন গল্পের। শুধুমাত্র একজন কলম্বিয়ান নোবেলজয়ী লেখক হিসাবে নয়, তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন আমাদের নিজস্ব গল্প বলার অধিকার দেওয়ার জন্য—হোক না সে গল্প যাদুর, হোক না সে গল্প এক দূরের গ্রামের, কিন্তু সে গল্প আমাদের গল্প। তাই একজন আশাবাদী মানুষ এবং সাহিত্যপ্রেমী হিসাবে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সেই লেখককে যিনি প্রকৃতই আমাদের গল্প বলার জন্য বেঁচেছিলেন। সার্থক তাঁর আত্মজীবনীর নাম Living to tell a tale।

বিজ্ঞানচর্চার সংস্কৃতির পরিবর্তনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রবীন মজুমদার

বিজ্ঞানচর্চা—ব্যাপকতম অর্থে—আমরা কেন করি, কেন করব? ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্মানজনক ও স্বনির্ভর পেশার জন্য? তার জীবিকানির্বাহের সুরাহার জন্য? সেগুলি অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা যদি না হতে পারে দেশ ও দেশের মানুষের সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক, যদি না হতে পারে সব মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার ধারক এবং বিজ্ঞানমনস্কতার বাহক, তাহলে বলতে হবে আমাদের বিজ্ঞানচর্চা দিশাহীন অথবা বিপথগামী। বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে নৈতিকতা বা মূল্যবোধও গড়ে উঠতে পারে কিনা, তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু যুক্তি ও বিচারবিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে যে বিজ্ঞান অনেকদূর আলোকিত করতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না এবং আমাদের দেশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ১৫০তম জন্মবর্ষে তো বটেই, তাঁর মৃত্যুর আগে এবং পরেও বারবার আমরা তাঁর অনেক গুণকীর্তন করেছি। পুজো করেছি, মন্দির তৈরি করে বিগ্রহ বসিয়েছি কিন্তু তাঁর জীবন থেকে 'লভিয়া জীবন' দেশ হিসেবে জেগে উঠতে পারিনি। শিক্ষায়, গবেষণায়, প্রয়োগে বিজ্ঞানের বিচারশীল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে উন্নত ও আলোকিত করে তুলতে পারিনি। কিন্তু তার জন্য হাহুতাশ করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে চলবে না। নতুন করে শুরু হওয়া দরকার তাঁর জীবন ও কর্ম এবং তাঁর অনুসৃত পথ নিয়ে ব্যাপক অনুশীলন ও চর্চা। শুরু হোক আমাদের বিজ্ঞানচর্চার সংস্কৃতির অনুশীলন ও পর্যালোচনা।

নানা প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও কারিগরির নব-নব উদ্ভাবনের ফসলগুলি আছড়ে পড়ছে আমাদের দেশেও। কিন্তু তাতে সুফলের চেয়ে কুফলই হচ্ছে বেশি। তার একটা কারণ, আমার মনে হয়, আমরা বিভ্রান্ত, আমরা প্রফুল্লচন্দ্রদের দেখানো পথ পরিত্যাগ করেছি।

প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং একটি পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন জাতীয় জীবনে এবং বাঙালির সমাজে। তাই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন অতীত ভারতের রসায়নবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায়। দু-খণ্ড *এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি* তারই স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর মতো মেধা, প্রতিভা, কর্মোদ্যোগ ও অধ্যবসায় নিয়ে কবে কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে তার জন্য বসে না থেকে, দলবদ্ধ প্রতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় আমাদের এক্ষুণি নেমে পড়া উচিত স্বাধীনতার আগের ও পরের অবস্থার পর্যালোচনায়। যে-পথ আমরা গ্রহণ করেছি তা কতখানি সুফলদায়ী ও কার্যকর? এসব বিচারের নিরিখ বা মাপকাঠিই বা কী হওয়া উচিত? প্রফুল্লচন্দ্ররা সেক্ষেত্রে কীভাবে কতখানি প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক?

প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও কর্মোদ্যোগের যে আশ্চর্য সমাহার ঘটেছিল আচার্য রায়ের জীবনে তার উৎস কি, রসদ জুটেছিল কোথা থেকে, কীভাবে ঘটেছিল সেসবের আত্তীকরণ, এ যদি আমরা জানতে বুঝতে পারতাম তাহলে হয়তো আনতে পারতাম আমাদের শিক্ষায়, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষায়, সেই প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্তন, ইংরেজরা চলে যাবার পর যা কাম্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রও সেটাই চেয়েছিলেন—'ব্রিটিশরা ভারতের মাটিতে স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই রোপণ করে গেছেন, আমরাও শাসকদের হাতে সে দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিত থেকেছি। আমাদের চাই ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও দূরদর্শিতায় ভারতের প্রথম ভারি রাসায়নিক শিল্প *বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস* (BCPW) গড়ে উঠেছিল, এ আমরা সকলেই জানি এবং তা নিয়ে গর্ব করতেও ভালোবাসি। কিন্তু BCPW কেমন করে এক আদ্যন্ত স্বদেশি স্বনির্ভর সফল শিল্প হয়ে উঠল, কীভাবে বাংলা তথা ভারতের উন্নয়নের মডেল ও দিশা হয়ে উঠেছিল, তা নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাইনি। আচার্য রায় যে পথে যেভাবে মুক্ত স্বাধীন, স্বনির্ভর ও গর্বোন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং উদাহরণের পর উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তা উপেক্ষিতই হল স্বাধীন ভারতে। উন্নয়ন গড়ে তোলার চেয়ে উন্নতি আমদানিতে আমরা আত্মনিয়োগ করলাম। এমনকি বাঙালির ব্যতিক্রমী ভূমিকাও সেখানে অন্তর্হিত হল। কালক্রমে আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলেও আমাদের শিক্ষা বা উন্নতি আমদানির নীতি পদ্ধতিতে কোনো পালাবদলের সূচনা হল না। ধীরে ধীরে রুগ্ণ হয়ে পড়ল BCPW। তার পুনরুজ্জীবনে 'জাতীয়করণ' থেকে 'আর্থিক সাহায্য' নানা দাওয়াই প্রয়োগ হলেও, BCPW আজও চাঙ্গা হয়ে উঠল না।

উঠবেই বা কী করে? আমাদের নিজেদের বিদ্যেবুদ্ধি সৃজনশীলতায় তো আমরা ইতিমধ্যেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। আর তাই প্রফুল্লচন্দ্রদের আমরা স্তুতি করি, তাঁর বা তাঁদের নামে নামাঙ্কিত করি, গড়ে তুলি নানা প্রতিষ্ঠান।

হয়তো না বুঝে অপমানও করে ফেলি। আর তাই বেঙ্গল কেমিক্যালের গর্বের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসায় অপরিহার্য এবং স্থানীয় চাহিদা মেটানো ইথাইল অ্যালকোহলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু কি তাই, কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে নাকি পরিবর্তিত আধুনিক কারখানা (অ্যালকোহলের) গড়ে তোলার জন্য জমির অংশ চিহ্নিত করা হয়েছিল! চুপিসাড়ে তা হস্তান্তর হয়ে যায় চলে যায়, মনি স্কোয়ার মলের খপ্পরে। এটা তাঁর অসম্মান এবং আমাদের লজ্জা?

অসম্মান যদি হয়, তবে তার আরও কিছু বাকি ছিল। সেটা পূর্ণ হল কেমিক্যাল হাবের নামকরণে। হ্যাঁ, সেই 'কেমিক্যাল হাব' যা প্রথমে নন্দীগ্রাম এলাকায় তৈরি করার কথা ছিল, এবং এখন যা নয়াচরে গড়ে তোলা হবে বলে উদ্যোগ আয়োজন চলছে। প্রস্তাবিত ঐ মেগা পেট্রোরসায়ন শিল্পতালুকের নামকরণ অবশ্য হয়ে গেছে—'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পেট্রোকেমিক্যালস্ প্রাইভেট লিমিটেড'। বেঙ্গল কেমিক্যালের মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, কীভাবে দেশীয় বা স্থানীয় কাঁচমাল ব্যবহার করে, প্রধানত স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, নিজেদের বা দেশের মধ্যেকার উদ্ভাবনীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় ও দেশের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন করা যায়। এবং এসবের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটানো যায়। কিন্তু 'কেমিক্যাল হাবে' এসবের কোনোটাই মান্যতা পাবে না। কাঁচামাল—খনিজ পেট্রোলিয়াম—প্রায় সম্পূর্ণতই আমদানিকৃত, উৎপাদিত পণ্যের জন্য বিদেশি বাজারই প্রধান লক্ষ্য। বস্তুত, ২৫০ বর্গকিলোমিটারের মতো বিশাল এলাকা জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম এই পেট্রোরসায়নশিল্পের আগাপাশতলা সবটুকুই এদেশের জল-মাটি মানুষের উপর আরোপিত। পরিকল্পনার কোনো স্তরে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কোনো ভূমিকা নেই। বিদেশি পরামর্শদাতা কোম্পানির সুপারিশ অনুসারে তা স্থাপন করতে চাওয়া হয়েছে। হলদিয়া-নয়াচরের মতো সুন্দরবন সংলগ্ন অত্যন্ত সংবেদনশীল উপকূল অঞ্চল, পেট্রোলিয়াম ও তা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রক্রিয়াকরণের জন্য কতখানি উপযুক্ত তার বিচার-বিবেচনা করার আগেই স্থান নির্বাচন করা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই শিল্পের ফলে স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকায় কী প্রভাব পড়বে তাও, কিংবা কীভাবে তাদের জীবনযাত্রা উন্নত হবে তারও কোনো স্পষ্ট হদিস পাওয়া গেল না। অথচ আজকাল রাজনীতিকরা কথায় কথায় বলেন—সকলকে নিয়ে উন্নয়ন করতে হবে। কীভাবে হবে, কতদিনে হবে বা কী কী ধরনের হবে এসবের কোনো হিসেব- নিকেশ ছাড়াই কখনও হাজার হাজার কখনও-বা লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে, হয়ে চলেছে। আর এসবই হচ্ছে ঠিক তখনই, যখন ইউরোপ আমেরিকায় আর কোনো পেট্রোরসায়ন শিল্প প্রায় স্থাপন করাই হচ্ছে না বা যাচ্ছে না। আমেরিকায় যেমন ১৯৭৭-এর পরে নতুন কোনো পেট্রোরসায়ন কারখানা স্থাপিতই হয়নি, পুরোনো যেগুলি ছিল বা আছে সেগুলিতে বিস্ফোরণ—দূষণ-দুর্ঘটনায় মানুষ জেরবার এবং তিতিবিরক্ত। আন্দোলন-বিক্ষোভের পরিণতিতে পরিবেশ বিধিসমূহ ভীষণরকম কঠোর হয়ে উঠেছে। আমেরিকা সচেতনভাবেই বহু আগেই রাসায়নিক ও পেট্রোরাসায়নিক উৎপাদনের চেয়ে আমদানিই শ্রেয়তার জ্ঞান করছে। আর তারই ফলে আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম রাসায়নিক রপ্তানিকারক দেশ থেকে বৃহত্তম রাসায়নিক আমদানিকারক দেশে পরিণত হচ্ছে। অথচ এই শিল্প, এ ধরনের শিল্পকেই ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি গণ্য করে আমরা উদ্বাহু হয়ে নৃত্যকরছি—শিল্পায়ন—কর্মসংস্থান—উন্নয়ন! শুধুমাত্র আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য থেকে আর্থিক উপার্জনের লোভে নেওয়া এ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাতে দেশের মানুষ এবং পরিবেশকে শুধু গণ্য করা হয় 'সাপোর্ট সিস্টেমের' অঙ্গ হিসেবে।

এহেন শিল্পের নামকরণে প্রফুল্লচন্দ্রকে দরকার পড়ল কেন? দেশবাসীকে ধোঁকা দিতে যে—দেখো আমরা প্রফুল্লচন্দ্রকে—তাঁর মতো বিজ্ঞানী সমাজকর্মী মানব ও দেশপ্রেমী মানুষকে সম্মান দিতে জানি, তাঁরই মতো মানবকল্যাণই আমাদের লক্ষ্য? এদেশের এরাজ্যের সাধারণ মানুষ—যাদেরকে এই মেগা শিল্পতালুকের জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হবে, তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া তো বটেই, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও এতদ্বারা আমরা অসম্মানই করলাম, অপমানিতই করলাম।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে, না জানলে, ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনা প্রায় সব সময়ই থাকে। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষার আলোয় আমাদের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা কঠিন ছিল না। কঠিন ছিল না একথা বোঝার যে, আধুনিক বা সর্বাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আমদানি করলেও সব সময় উন্নয়ন হয় না। আবার অনেক সময়ই পুরোনো দেশজ জ্ঞান-প্রজ্ঞা-প্রযুক্তি-ও সত্যিকার উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠতেই পারে। এমনিতেই আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে, শিক্ষা দিয়ে আধিপত্য কায়েম করার দর্শনকে ধারণ করবার পক্ষে বেশ দুর্বল। কিন্তু তার মধ্যেও আছে এমন অনেক মৌলিক উৎসাহব্যঞ্জক উপাদান যা 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' জন্য যে-দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সহজে গ্রহণ করার পক্ষে বেশ অনুকূল। 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' (Sustainable Development)—

আজকের দিনের ক্যাচওয়ার্ড। সকলেই নাকি সেই উন্নয়নই করছে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শুভফলদায়ী। যা পরিবেশ ও মানুষের উপর আগ্রাসী নয়। এই উন্নয়ন-ভাবনায় ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সমাজ ও পরম্পরাগত সামাজিক জ্ঞান যা পরিবেশে ওতপ্রোত। এই উন্নয়নের বুলি কপচে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির মোড়কে যে ধ্বংসের কর্মকাণ্ড তাকেই আমরা আবাহন জানাচ্ছি। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানীরা রাজনীতিকদের হাঁ-তে হাঁ মিলিয়ে বৈজ্ঞানক বৈধতা প্রদানে ব্যগ্র। এমনি করেই আমাদের জল, আমাদের মাটি, খনিজ, বনসম্পদ, মায় খাদ্যশস্য সবজি—সব কিছু হয়ে উঠেছে বিশ্বের তাবৎ বিত্তশালীর বাণিজ্যপণ্যের পসরা। প্রফুল্লচন্দ্রের সমসময়ে বিজ্ঞান ও রাজনীতির অশুভ আঁতাত এত স্পষ্ট ছিল না, পরিবেশ বিজ্ঞানও কিছুই প্রায় বিকশিত হয়নি। ছিল না কম্পিউটারের মতো শক্তিশালী হাতিয়ার, তবু মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর মমত্ব, উদারতা ও দায়বদ্ধতা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেই এদেশে স্থিতিশীল উন্নয়ন ভাবনার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর দেখানো পথ পরিহার করে আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছি।

শিক্ষা নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের নানা মৌলিক চিন্তা ছিল। বিজ্ঞানশিক্ষায় তার কিছু প্রয়োগের প্রয়াস তিনি করেছিলেন। সেই সংস্কৃতির চর্চাও আমরা আর করিনি। শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পোদ্যোগের মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে বার বার স্বীকার করলেও, এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও (তাঁর কর্মস্থল) সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়েই রেখেছে। একজন বিদেশি শিক্ষকের আক্ষেপ শুনেছিলাম, জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের মতো ভারতীয় বিজ্ঞানীরা থাকা সত্ত্বেও ভারত তথা বাংলার ছাত্রছাত্রীরা হয় তাঁদের নামই জানে না, জানলেও বিজ্ঞানী হিসেবে গর্বের সঙ্গে তারা এঁদের নাম উচ্চারণ করে না। অথচ অনেক বিদেশি বিজ্ঞানীর নাম তারা গড়গড়িয়ে বলে দিতে পারে। পরিতাপের নয়—এ হল আমাদের সেই বিস্মৃতির সংস্কৃতিরই প্রতিফলন! ত্রিশ ও চৌত্রিশ বছরের দু-দুটো দীর্ঘ জমানায় এ রাজ্যে এই সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন হয়নি। এখনও কি তা অধরাই থাকবে?

সূত্র: লেখকের *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র* (চর্চাপদ, ২০১৩) বই থেকে নেওয়া।

স্মরণ

(উৎসর্গ শিবনারায়ণ রায়কে)

উৎপল মিত্র

এ পৃথিবীর বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে
পাখিদের কলরব, ভ্রমরের গুঞ্জন আর
ঘাসে ঘাসে শিশিরের বিন্দুতে—
জেগে ওঠে নতুন সকাল।
সকালের সোনালী আলোয় জেগে
ওঠে শব্দেরা।
ওদের বিন্যাসে প্রাণে আসে হিল্লোল
—জেগে ওঠে ইতিহাস।

পৃথিবীর ওই বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে
এখন আর কলরব করে না পাখিরা
ভ্রমরের গুঞ্জনও শোনা যায় না আর,
ঘাসের ওপর শিশিরের বিন্দু পড়ে
তবুও জেগে ওঠে না সকাল।
নতুন শব্দেরা আজ পথ ভুল করে।
বেঁচে থাকা শব্দেরা এখনও সোনালী
আলোয় আলোকিত হয় নীল সমুদ্রের
ওপার থেকে।

রডোডেনড্রন

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

(মনসান্টো, বেয়ার, ডিউপয়েন্টের মতো বহুজাতিক সংস্থার কীটনাশক ব্যবসার ফলস্বরূপ মৌমাছিরা মারা যাচ্ছে। মৌমাছিরা মানুষের প্রায় সত্তর ভাগ খাদ্য তৈরি করে থাকে।)

রডোডেনড্রন রডোডেনড্রন
ভ্রমর তুমি কোথায় গেলে
নীল বিষাদের ছায়া ফেলে
রডোডেনড্রন রডোডেনড্রন।

মুক্ত আকাশ মুগ্ধ পলাশ
কদম্ব আর ঝাউয়ের বনে
সোনাঝুরির নিশীথ গানে
রডোডেনড্রন রডোডেনড্রন।

কালো ধোঁয়া আর মরণের বিষে
রেণু ধূসরিত উন্মাদ ডানা
সোনালি ঝিলিকে রেশমি হানা
সহসা নীলাভ রজনীগন্ধা
জুঁই অরণ্যে নিশিত সন্ধ্যা
রডোডেনড্রন রডোডেনড্রন।।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিজ্ঞানে নারীর ভূমিকা

নন্দিনী মুখার্জী

একবার একটি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় এক বৈজ্ঞানিকের ছবি আঁকতে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৮২০ জন ছাত্রী এবং ৬৯৯ জন ছাত্র বৈজ্ঞানিকের ছবি আঁকে—এক পুরুষ বৈজ্ঞানিকের বেশে এবং বৈজ্ঞানিকের কর্মে রত। আর ১২৯ জন ছাত্রী এবং ৬ জন ছাত্র আঁকে মহিলা বৈজ্ঞানিকের ছবি। এই ঘটনাটি খুব অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। আমাদের ছোটবেলা থেকে সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করা হয়, আমাদের সামনে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসাবে যাঁদের হাজির করা হয়, তার থেকেই আমরা বিভিন্ন কাজের মধ্যে ছেলেদের কাজ ও মেয়েদের কাজ—এই ভাবে ভাগ করতে শিখে যাই। এই ধারণা ছোটো বেলা থেকে শুধু আমাদের মনে প্রোথিত হয় তাই নয়, আজীবন এই ধারণা আমরা বহন করি। তাই বৈজ্ঞানিক বলতে আমাদের চোখের সামনে পুরুষের চেহারা ভেসে ওঠে।

অথচ, সভ্যতার প্রারম্ভে কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে এই বিভাজন ছিল না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো বিজ্ঞানেও নারীর ছিল পুরুষের সঙ্গে সমান তালে ঘোরাফেরা। এমনকি প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য বিবরণ থেকে সাক্ষ্য মেলে যে কৃষি, সময় রক্ষা, ক্যালেন্ডার রক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরই অধিকতর অবদান ছিল। প্রথম মহিলা চিকিৎসকের হদিশ মেলে ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সুমের অঞ্চলে, যদিও তাঁর নাম জানা যায়নি।

ইজিপ্টের পিরামিড তৈরির প্রথম স্থপতি ইমহোতেপকে (Imhotep) এখনও পর্যন্ত প্রথম পুরুষ প্রযুক্তিবিদ, স্থাপত্যবিদ এবং চিকিৎসক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইমহোতেপের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন Merit Ptah। প্রাচীন ইজিপ্টের এই মহিলা চিকিৎসককে আমরা বোধহয় নিঃসংশয়ে প্রথম মহিলা বৈজ্ঞানিকের সম্মান দিতে পারি। Merit Ptah-র ছবি ও নাম পাওয়া যায় সাক্কারার স্তর পিরামিডের কাছে একটি স্মৃতিসৌধের গায়ে যেখানে তাঁর পুরোহিত ছেলে তাঁকে বর্ণিত করেছেন মুখ্য চিকিৎসক রূপে।

২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় ব্যাবিলনে আর একজন মহিলা বৈজ্ঞানিকের নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন এন-হেদুয়ানা (En-Heduana)। উর শহরে চন্দ্রদেবতা ''নান্না''র মুখ্যপুরোহিতের পদে এন-হেদুয়ানা অভিষিক্ত হন। সেই সময় এই মর্যাদাপূর্ণ পদে শুধুমাত্র রাজপরিবারের মেয়েরাই উন্নীত হতে পারতেন। তৎকালীন জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতবিজ্ঞান চর্চা এবং ক্যালেন্ডার রক্ষণ ইত্যাদি কাজের পাশাপাশি এন-হেদুয়ানা মূলত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি হিসাবে। বস্তুত এন-হেদুয়ানাকেই লিখিত আকারে সাহিত্য রচনার ইতিহাসে যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে প্রথম কবি এবং সাহিত্যিকের মর্যাদা দেওয়া হয়।

গ্রিসে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময় থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগ শুরু হয়। বিজ্ঞানচর্চায় এই সময় নারীর অংশগ্রহণ কিছুমাত্রায় কম ছিল না। পিথাগরাসের শিষ্যকুলে বা প্লেটোর অ্যাকাডেমীতে নারীর ছিল পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলাফেরা। পিথাগরাসের মৃত্যুর পর, তাঁর শিষ্যকুলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা এবং সহধর্মিণী থিয়ানো।

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই নারীকে গৃহকর্মে বেশি নিযুক্ত করে নারীর অবারিত চলাফেরাকে অবরুদ্ধ করার প্রয়াসও সমাজে শুরু হয়। বলপূর্বক বা আইনের মাধ্যমে বহু সামাজিক কাজকর্মে নারীর অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয়। বিভিন্ন স্থানে নারী ও পুরুষের জন্য রচিত হয় দু-রকম আইন। প্রাচীন ইজিপ্টে নারী ও পুরুষের সম অধিকার থাকলেও প্রাচীন গ্রিসে কিন্তু নারী যেমন সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত, তেমনি ছিল না তার কোনরকম বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করার অধিকার। গ্রিসে নারীর স্থান ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের—দাসেদের থেকে সামান্য উচ্চস্থানে।

তাই ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসের এথেন্স নগরীতে, যেখানে নারীর চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করার কোন অধিকার ছিল না, সেখানে অ্যাগনডাইসকে (Agnodice) পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য এবং পরবর্তীকালে নারীচিকিৎসক হিসাবে মহিলাদের চিকিৎসা করার জন্য। যখন অ্যাগনডাইসের নারী পরিচয় প্রকাশিত হয়, গ্রিসের আইন অনুযায়ী তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশ্য পরবর্তীকালে, তাঁর চিকিৎসার দ্বারা উপকৃত নাগরিকদের বিদ্রোহের ফলে অ্যাগনডাইস মুক্তিলাভ করেন এবং পরের বছর এথেন্সের শাসকগোষ্ঠী আইনেরও পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

অ্যাগনডাইস মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পেলেও হাইপাসিয়ার (Hypatia) সেই সৌভাগ্য হয়নি। ৪১৫ খ্রিষ্টাব্দের আলেক্সান্দ্রিয়ায় হাইপাসিয়া ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। হাইপাসিয়া কোনসময়ই নারীর সমাজে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের স্থান তাকে মেনে নেননি। তাই বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি হাইপাসিয়া সাধারণভাবে নারীর যে ব্যবহার তৎকালীন সমাজ প্রত্যাশা করত, তাকে বর্জন করে নারীর পোশাকের পরিবর্তে পুরুষের পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্বচালিত

যানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন। তাঁর বিজ্ঞানচর্চাকে প্রতিহত করার জন্য এবং তাঁর খ্রিষ্টানবিরোধী রাজনৈতিক মতপ্রকাশকে স্তব্ধ করার জন্য আলেক্সান্দ্রিয়ার রাজপথে একদল খ্রিষ্টান তাঁকে আক্রমণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মধ্যযুগে নারীর অধিকার ক্রমশ: সীমিত হতে থাকে এবং জ্ঞান অর্জনের অধিকারও নারী হারিয়ে বসে। মানবসমাজের অর্ধেক আকাশ এইভাবে ঢেকে যায় অশিক্ষার, অজ্ঞানতার ও কুসংস্কারের কালো অন্ধকারে। আর মানবসভ্যতা হারিয়ে বসে তার অর্ধেক শক্তি আর এই শক্তির ব্যবহারের সুফলকে যা সভ্যতাকে আরও বিকশিত করতে পারত। তবে দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর নারী অন্ধকার জগতে নিমজ্জিত হলেও তৎকালীন ইউরোপে চার্চের সহযোগিতায় সন্ন্যাসিনী নানেদের সামান্য পড়াশোনা করার অধিকার মিলত। এইসময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চর্চা হত চার্চের বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায়। তাই বৈজ্ঞানিক, তিনি নারী বা পুরুষ যাই হোন না কেন, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই তাঁদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকত। এই যুগের সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা বিজ্ঞানী হলেন হিল্ডগারড (Hildegard of Bingen)। জার্মান এই বৈজ্ঞানিক তথা সন্ন্যাসিনী চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা থেকে শুরু করে কসমোলজি পর্যন্ত বহুমুখী জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখে গেছেন।

একাদশ শতাব্দীর ইতালিতে টরচুলা (Tortula) ছিলেন প্রখ্যাত নারীচিকিৎসক। তাঁর লিখিত চিকিৎসা সংক্রান্ত বই পরবর্তী প্রায় পাঁচশ বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে। তবে টরচুলা যে চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটি ছিল চার্চের আওতার বাইরে।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে সমগ্র ইউরোপ তখন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের বহুমাত্রিক সাধনায় অবিশ্বাস্য সাফল্যের নজির রাখলেও নারীমুক্তি এবং নারীজাগরণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নবজাগরণ কোনো ছাপ ফেলেনি। নারীর জন্য জ্ঞানের প্রাঙ্গন থেকে গেছে তেমনই অবরুদ্ধ। যদিও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই সময় হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধানতম সাধনাস্থল, কোন নারীর কিন্তু এই সাধনাস্থলে প্রবেশাধিকার ছিল না। একজন শিক্ষিতা নারী যে শুধু সমাজের কাছে বিদ্রূপের পাত্রী হয়ে উঠতেন তাই নয়, বিজ্ঞানচর্চা করা নারী পেতেন ডাইনি আখ্যা। এই অন্ধকার সময়ে অসংখ্য নারীকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়—তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অপরাধ ছিল জ্ঞানের চর্চা।

আর্থার ওয়ালেস কালহন পুরানো একটি প্রবাদ বাক্যকে ১৯১৮ সালে স্মরণ করে লেখেন—

"A woman's name should appear in print but twice—when she marries and when she dies."

''একজন নারীর নাম মাত্র দুইবার লিখিত হয়—যখন সে বিবাহ করে এবং যখন মৃত্যুবরণ করে।''

সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে সামগ্রিকভাবে এই চিত্রটির পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীর বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ কমে আসতে থাকে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে এই সময়েও মহিলাদের চলাফেরা সহজ হয়নি, তাদের বেশিরভাগ শিক্ষা সম্পন্ন হত গৃহের অভ্যন্তরে। বিশেষ করে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার যেমন উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি মেয়েদের অনুরাগ জাগিয়ে তোলে, তেমনি টেলিস্কোপের ব্যবহার তাদের আগ্রহী করে তোলে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি। এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে যেহেতু বাড়িতে বসেই জ্ঞানচর্চা করা যেত, তাই উদ্ভিদবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা ছিল এই সময়ের মহিলা বিজ্ঞানীদের বিশেষ অধীত বিষয়।

এর পরবর্তী সময়ের ইতিহাস অবশ্য বহু বাধা ডিঙ্গিয়ে, প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করে জ্ঞানের সাধনায় মেয়েদের এগিয়ে যাবার ইতিহাস। ধীরে ধীরে যেমন বিজ্ঞানের দুনিয়ার দ্বার মেয়েদের জন্য একটু একটু করে খুলছিল, বহু অসম্মান, বহু অবজ্ঞা এবং তার সঙ্গে যন্ত্রণাকে সহ্য করে নিয়ে মেয়েরা এগিয়ে চলেছিল মুক্তির পথে, সমানাধিকারের পথে। অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে সমস্ত বাধা চূর্ণ করে প্রবল লড়াই এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই নারীদের অবদান শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—তাই নয়, সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, বিশ্বের দুয়ারে নারীর প্রবেশাধিকার ঘটাতে এবং সামাজিক উৎপাদনে নারীর অবদানের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করার কাজেও এঁদের অবদানকে স্মরণ রাখতে হবে। নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চলে আসা সংগ্রামে এই বৈজ্ঞানিক নারীরা তাই পুরোভাগেই থাকবেন।

তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এই সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। বিজ্ঞান আজও প্রধানতঃ পুরুষেরই বিচরণের ক্ষেত্র। উচ্চশিক্ষায় মেয়েরা উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছোলেও বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত নারীর সংখ্যা আজও খুবই কম। যদিও বা কোন নারী বিজ্ঞানকে তাঁর চর্চার ক্ষেত্ররূপে বেছে নেন, তাঁর জন্যও অপেক্ষা করে থাকে বহু বিঘ্ন, বাধা। সম্মান ও পদোন্নতির প্রশ্নে এই পুরুষশাসিত দুনিয়ায় নারীর স্থান যথেষ্ট সংকীর্ণ। তার সঙ্গে থেকে যায় গৃহের ভিতর ও বাইরের দুই পৃথিবীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলার তাগিদ অর্থাৎ balancing act যা শুধুমাত্র মেয়েদেরই জন্য নির্দিষ্ট। যথাযথভাবে মেয়েদের তাই পুরুষের পাশে এগিয়ে আনতে গেলে সামাজিক কর্মগুলির মধ্যে যেমন পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে, তেমনি নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সমাজকে আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

রাজা রামমোহন, সতীদাহ ও আমরা

স্বপন দত্ত

কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গের সূচনা করা যাক—

(১) UNICEF-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঃ "A report from Bombay in 1984 on abortions after frenatal sex determination stated that 7,999 out of 8,000 of the aborted fetnses were females, sex determination has become a lucrative business."

(২) ভারতে ১৯৯০ সালে যেখানে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের সংখ্যার চেয়ে ২.৫ কোটি বেশি ছিল, ২০০১ সালের মধ্যে তা বেড়ে হয়েছে ৩.৫ কোটি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শীঘ্রই এই সংখ্যা বেড়ে ৫.০ কোটিতে পৌঁছে যাবে।

(৩) ১৯৮৬ থেকে ২০০১ সালের ভেতর ভ্রূণ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ৫ কোটি কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে লিখতে বসে এ কথাগুলি কারও কারও কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তাই এবার সরাসরি-ই বিষয়ে আসা যাক। এবারেও কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নিচ্ছি।

(১) ১৯৮৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালা গ্রামের অষ্টাদশী যুবতী রূপ কানোয়ারকে বাধ্য করা হয়েছিল স্বামীর সহমৃতা হতে।

(২) ২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল বিহারের গয়া জেলায় সীতা দেবী সতী হন।

(৩) ২০০৭ সালের ১৬ অগাস্ট রাজস্থানের সিকার জেলায় সরবতী বাঈ স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতী হন।

* * *

এই সতীদাহ প্রথার উদ্ভব ৭০০ বছর আগে। এই নিষ্ঠুর, প্রাণঘাতী প্রথানুযায়ী হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত। এর ফলে নাকি সতী নারী পরলোকে স্বামীর সাহচর্য পেত। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায়—'সতী'-টির স্বামী ও পিতৃকূলের সম্পত্তির ভাগ যাতে তাকে না দিতে হয়, তা পাকা করতেই 'পথের কাঁটা' সরানোর জন্য এ ছিল এক সুবন্দোবস্ত।

এই প্রথার প্রথম বিরোধিতা করেন মোগল সম্রাট আকবর। জাহাঙ্গীর সহমরণের বিরুদ্ধে রাজবিধি চালু করেন। মারাঠা শাসক বাজীরাও-ও তাঁর রাজ্যে এই প্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। কয়েক শতক ধরে মূলত উচ্চবর্ণের মধ্যে 'সতীদাহ প্রথা' প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

ব্রিটিশ শাসকরা প্রথমে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে উদাসীন ছিল। দু-একজন ইংরেজ রাজ-কর্মচারী এই ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। বদ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরী দেখান যে, ১৮০৩ সালে কলকাতার ৩০ মাইল দূরত্বের মধ্যে অন্তত ৪৩৮টা সতীদাহ হয়েছে। এরপর ব্রিটিশ সরকার। নিজাম আদালতের পণ্ডিতদের কাছে মতামত চাইল। তারা বিধান দিল—

(১) এই সতীদাহ প্রথায় কোনও স্ত্রীলোককে জোর করে রাজী করানো যাবে না।

(২) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন—অপ্রাপ্তবয়স্কা, গর্ভবতী, ঋতুমতী স্ত্রীলোককে এর আওতায় আনা যাবে না।

১৮১৩ সালে লর্ড মিন্টো এক সার্কুলারে ঘোষণা করেন যে, কোনও অনিচ্ছুক নারীকে বলপ্রয়োগে সহমরণে বাধ্য করা যাবে না। অথচ যে কোন সাধারণ বুদ্ধিতেই আসে যে এই নির্মম, নিদারুণ নারীহত্যা কখনও স্বেচ্ছামৃত্যু হতে পারে না।

কোম্পানির এই আদেশের ফলে সতীদাহ কমার বদলে বেড়ে চললো। দৃষ্টান্তস্বরূপ—১৮১৫ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে মূলত কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, বেনারস ও বেরিলিতি সতীদাহর সংখ্যা বেড়ে ৩৮৭ থেকে ৮৪০ হয়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' এদেশীয় ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় আঘাত দিয়ে কোনওরকম মানবিক আইন করে তাদের শাসনব্যবস্থায় ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমাজ সংস্কারকের মহান ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ এই মানুষটির জন্ম ১৭৭২ সালের ২২ মে। মহাত্মা রামমোহন স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে কালরাত্রি বিরাজ করিতেছিল। অন্ধকারে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল।' বাস্তবিকই, মৃত্যুতে ছাওয়া ভাগীরথীর দু-পারের বহ্নিমান চিতাশয্যার অগ্নিশিখায় রামমোহন প্রত্যক্ষ করলেন মধ্যযুগীয় বর্বরতার হৃদয়-বিদরেক বিভীষিকা।

এই মুহূর্তে আমার প্রতিবেদনটির ভূমিকার দিকে একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। সেখানে প্রতিটি উদাহরণ নারী হত্যার সাথে সম্পৃক্ত। তার মধ্যে বেশ কিছু হত্যা কন্যাসন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার আগেই। এরপর রয়েছে কন্যাসন্তান হত্যা, পণ আদায়ের জন্য বধূহত্যা বা আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া, শ্লীলতাহানি, বলাৎকার এবং আরও বিভিন্নরকম নারীনির্যাতন। গণমাধ্যমগুলি থেকে এর সামান্য কিছু ঘটনাই আমরা জানতে পারি। এ কথাটিই প্রণিধান যোগ্য, ১৭৭২ সাল থেকে শুরু করে আজ ২৪১ বছর পরেও আমাদের সমাজ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের

মনের হীনতা, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতী ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যেন একই রয়ে গেছে। হয়ত ধর্মীয় সমাজের পটভূমিকা বদলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া পাওয়া সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষকে দেখে সমাজের অগ্রগতি মাপলে ভুল হবে।

পুরুষ-সিংহ রামমোহন দেশব্যাপী কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রধানত চারটি শানিত অস্ত্র ব্যবহার করতেন—(১) কথোপকথন, (২) তর্ক-বিতর্ক, (৩) বিদ্যালয় স্থাপন, (৪) সভা সংস্থাপন। কিন্তু সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে হাতিয়ার তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তা হল জনমত গঠন।

প্রথম পদক্ষেপে তিনি কাউন্টার পিটিশান বা কাউন্টার আরগুমেন্ট করে দেখালেন যে, জ্বলন্ত স্বামীর চিতায় নারীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা কখনও স্বেচ্ছামৃত্যু হতে পারে না। ১৮১৮ সালে এই কাউন্টার পিটিশানের সাথে সাথে রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। প্রথমে এটি বাংলায় প্রকাশিত হলেও, পরে কোম্পানির শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এটিকে ইংরেজিতেও প্রকাশ করেন। বইটিতে তিনি প্রবর্তক ও নিবর্তকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে একটি আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। এখানে নিবর্তক ধর্মীয় যুক্তিতে সতীদাহের সমর্থক প্রবর্তকের মত খণ্ডন করেন। এরপর ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। সেখানেও তিনি প্রবর্তক ও নিবর্তকের মধ্যে একটি কাল্পনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। এখানে নিবর্তক যুক্তি শানালেন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ১৮২০ সালে রামমোহন এই পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং সেটি মারকুইস অব হেস্টিংসের সহধর্মিনীর নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর এই কাজের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের দেশের সকল নারীদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে হেস্টিংসের সহধর্মিনীর সহানুভূতি অর্জন করা। এরপর ১৮২৯ সালে রামমোহন 'সহমরণ বিষয়' নামে আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি দেখালেন যে, শাস্ত্রে 'সতীদাহ প্রথা' বাধ্যতামূলক নয়। এটি সুবিধাবাদীদের গড়ে তোলা। নারীহত্যার ওই ব্যাপারে নারীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয় না।

ইতিমধ্যেই রামমোহনের এইসব প্রচেষ্টায় দেশময় আলোড়ন উঠেছে। ১৮২৭ সালের ১৮ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট জানালেন, ''সতীদাহ নিবারণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার ফলে অনিশ্চিত, বিপ্লবাত্মক এবং বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে আমি বরং ধীরে ধীরে এই কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য কয়েক বছর অপেক্ষা করব।'' এরপর ১৮২৮ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিংক। তিনি রামমোহনের আন্দোলনে উৎসাহী হলেন এবং অবশেষে তাঁরই সহায়তায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর পাশ হোল 'সতীদাহ নিবারণ আইন'। রামমোহনের নাম জড়িয়ে গেল সতীদাহ প্রথা নিবারণের সাথে।

রামমোহন রায়ের যে অক্লান্ত প্রয়াসে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়েছিল, আজও তা এই প্রথা রদ করায় সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। তাই আইন পাশ করলেই হবে না, রামমোহন যে মতাদর্শে সমাজকে গড়তে চেয়েছিলেন—সেই মতাদর্শে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে সামগ্রিক মতাদর্শকে গ্রহণ—এই ছিল তাঁর সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের মূলমন্ত্র। এই আদর্শেই আমরা পারি নতুন সমাজ গড়তে।

অনিন্দিতা সাউ, বয়স : ১৪

শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ

ভূতের সঙ্গে কিছুক্ষণ

মল্লার দাশগুপ্ত

''গল্প শোনাও না হারুদাদু''—সলিল আবেদন জানাল। কসবার মূল রাস্তা থেকে হারান সান্যালের বাড়ি পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। এদিকটায় খুব একটা যানবাহন চলে না। কিছুদূর পরে পরে একটা একটা বাড়ি। এই নির্জনতা, নিস্তব্ধতাই তিনি পছন্দ করেন। তার দেশভ্রমণের খুব শখ। তিনি শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর নানা জায়গায় ভ্রমণ করে এখন অষ্টাশি বছর বয়সে কলকাতায় তার বাড়িতে এসেছেন। প্রকৃতির প্রতি এত টান ছিল বলেই—তিনি বোধহয় বিয়ে করার সময় পাননি। বিশ্বস্ত এক পরিচারক অমলের সঙ্গে তিনি তার দোতলা বাড়িতে থাকেন। তার ঠাকুরদার সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল। একটি বিশাল ঘরে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান হত। সেই ঘরে এখন তিনি তার কিছু অনুগত ভক্তদের গল্প শোনান। এটি তার আরেকটি আশ্চর্য গুণ। তিনি কিছুটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কিছুটা কল্পনা মিশ্রিত করে অতি সুন্দর কাহিনী বলতে পারতেন। রহস্য, ভূতপ্রেত ও ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে গল্পই তিনি বেশি বলতেন। তার শ্রোতা বলতে পাশের বাড়ির সলিল, সুব্রত, নান্টু, অনিমা ও পরিচারক অমলের ছেলে অভিষেক। সেদিন সকলে বায়না ধরল ভৌতিক গল্প শোনার। তাছাড়া সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘন কুণ্ডলী দেখা গিয়েছিল যা পরে বৃষ্টির রূপ ধরে ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে। হারুদাদু বললেন ''এখন আর কাল্পনিক গল্প বলে লাভ নেই, সরাসরি সত্য ঘটনাই বলি।'' তারা সত্য ঘটনা শুনতেই বেশি পছন্দ করে, তাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। হারুদাদু শুরু করলেন ''ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫৮ সালে। দেশে-বিদেশে ঘুরে আমার পরিচয় তখন ক্যানিং এর এক রিক্‌শাচালক''। ''ক্যানিং কী''—মৃদুকণ্ঠে ভেসে এল নান্টুর গলার স্বর। নান্টু হল সকলের থেকে ছোট এবং চালাক-চতুর প্রকৃতির। ''তুই জানিস গল্পের মধ্যে ফোঁড়ন কাটা আমি অপছন্দ করি।'' —হারুদাদু রাগ করে বললেন। নান্টু চুপ করে যেতেই তিনি আবার বলতে লাগলেন, ''সেখানে প্রচেত দত্ত নামক এক বিখ্যাত দার্শনিক থাকতেন। তিনি আবার ভূতপ্রেত, প্ল্যানচেট ইত্যাদি ব্যাপারে গবেষণা করতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এ সবে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ পেতেন। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ভূত-দর্শন তখনও সম্ভব হয়নি।

ওখানে থাকতে থাকতে আমি তার অত্যন্ত পরিচিত হয়ে গেলাম। একদিন তিনি ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, ''দমদমা গ্রামে চলো।'' তার গলার স্বর অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। হাতে একটি খবরের কাগজ। পথে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আজকের খবরের তৃতীয় পৃষ্ঠাটি পড়েছ? ওখানে এক ভূতুড়ে হানাবাড়ির খোঁজ দিয়েছে। ইংরেজদের সময় নাকি সে অট্টালিকা স্থাপন করা হয়েছিল'' আমি এ শুনে একটুও অবাক হলাম না। প্রচেতবাবুর কখন যে কী খেয়াল হয়, তা কেউ বলতে পারে না। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। একদিন তো তিনি মানুষের আত্মা কেমন হয়, তা জানতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যিস তার বাড়ির দারোয়ান দীনদয়াল দেখেছিল! ''বাড়িটির নাম সুন্দরী হাউস'' —বলে চলেছেন তিনি। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম সেখানে। প্রচেতবাবু সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললাম, ''বাবু আমার কিন্তু কেমন একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছে। এ বাড়িতে পদার্পণ করা মানেই যেন মৃত্যুকে বরণ করা।'' ''মৃত্যুকে বরণ করা যায় নাকি''—নান্টুর আবার প্রশ্ন। পরক্ষণেই সে চুপ হয়ে গেল। হারুদাদু তার দিকে একবার তাকিয়েই আবার শুরু করলেন, তিনি তো আমার কথা শুনলেনই না। বললেন ''এতদিন যখন এত হানাবাড়িতে গিয়েও আমার কিছু হয়নি, তবে এখন কেন হবে?'' হঠাৎ দেখলাম এক দারোয়ান মতো লোক হাতে লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি অবশ্য তার কাছে প্রচেতবাবুকে ছেড়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হলাম না। গাড়িটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আকাশের অগণিত তারার দিকে চেয়ে রইলাম। গোল থালার মতো চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে একটা সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো সূর্যের উদয়ের আর বিলম্ব নেই। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্রচেতবাবু কী পারল সে বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে? নাকি! হঠাৎ আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে প্রচেতবাবু আবির্ভূত হলেন। বললাম ''দেখলেন ভূত''? প্রচেতবাবুর কাছে এ প্রশ্নের যে এমন উত্তরও হতে পারে, আমি আশা করিনি। তিনি বললেন, ''দেখবো না আবার! ওই দারোয়ানটাই তো চোদ্দ বছর হতে চলল মরে ভূত! বন্যায় ভেসেছিল এ বাড়ি চুয়াল্লিশ সালে। কী আর করবো বলো, ভাগ্যের ফের! তুমি তো জানোই আমার ব্লাড প্রেশার হাই, চোখের সামনে ভূত দেখে কী আর থাকতে পারি, স্পট ডেড''। আমার দু-চোখ ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে মিলিয়ে গেলেন তিনি।

হৈ নাট্য গোল

অপর্ণা চক্রবর্তী

সামনেই দুর্গা পুজো। আকাশে এখন ভাসার কথা সাদা মেঘের ভেলা। কিন্তু সাদা মেঘ কই আকাশ জুড়ে তো শুধুই বর্ষার কালো মেঘ। জানলার ধারে বসে সাদা মেঘই খুঁজছিল মিমি। হঠাৎ বন্ধুদের চিৎকারে চমকে উঠলো ও, একি! ক্লাস জুড়ে সবাই এরকম তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলো কেন? এমন সময়ে দেখতে পেল মিঠু দৌড়ে আসছে তারই দিকে। মিঠু লাফাতে লাফাতে বললো, মিমি, পঞ্চমীর দিন না ক্লাসেই আমরা নাটক করবো। মা দুর্গাকে নিয়ে, ভালো হবে না?

দুর্দান্ত হবে। অন্যদের মতোই লাফিয়ে উঠল মিমি, আমি কিন্তু মা দুর্গা হবো। আর তুই সরস্বতী। ঠিক আছে? আমরা সবাই কিন্তু শাড়ি পরবো। ও! কি মজা!

ওমা! কি শখ দেখো। মা দুর্গা হবো। আর আমি কি? না সরস্বতী! কি স্বার্থপর রে তুই। আমি মা দুর্গা হবো। আর দাঁড়া তোকে অসুর বানাবো।

অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল মিমি। এই হলো মিমি আর মিঠু। এমনিতে খুব বন্ধুত্ব কিন্তু এই একটাই দোষ। কথায় কথায় ঝগড়া। অন্য সময়ে তো মিঠুকে ছাড়া মিমির চলেই না। ওরা থাকেও এক পাড়ায় আর পড়েও এক স্কুলে একই ক্লাসে। দুজনেই শিশু শিক্ষা মন্দিরের ক্লাস থ্রিতে পড়ে। কিন্তু এই যে বেঁধে গেল ঝগড়া। ভাগ্যিস তিতলি ছিল, না হলে এই ঝগড়া মিটতেই দুদিন লাগতো। তিতলি এসে বলল, আরে, এরকম ভাবে কেউ ঝগড়া করে। আজ টিফিনের সময়েই আমি ঠিক করবো কে দুর্গা আর কে অন্যকিছু।

সবাই প্রায় ঠিক করেই রেখেছিল মিমি আর মিঠুকেই দুর্গা আর শিব বানাবে। না হলে ওরা দুজন যা দস্যি। একবার ওরা যা করেছিল। সেদিন ছিল মিমির জন্মদিন। অন্যদের মতো জন্মদিনের দিন সবাইকে লজেন্স খাওয়ানো ধাতে নেই মিমির। ওর মতে, কারো জন্মদিনের দিন সে কেন অন্যদের খাওয়াবে? বরং অন্যরা তাকে খাওয়াবে। কয়েকদিন পরেই ছিল টিকলির জন্মদিন। সেইদিনই টিকলি একটা বড়ো ভুল করে ফেললো। একটু মজা করেই টিকলি মিমিকে বলেছিল, এই নে তোকে দুটো লজেন্স দিলাম। একটা আমার জন্মদিনের জন্য তোকে আর অন্যটা তোর জন্মদিনের জন্য তোকে। তোর জন্মদিনে তো আমাদের কিছু দিলি না, তাই আমিই তোকে দিলাম। আর আজকে টিফিনে পায়েস এনেছি তোকে দেব। কি কুক্ষণে যে কথাটা বলেছিল টিকলি। সেদিন টিফিনের সময় টিফিন বক্স খুলে টিকলি দেখল পায়েস কেন? সেখানে একবিন্দু দুধও লেগে নেই। পরে জানা গেল সেদিন খেলার ক্লাসে যখন সবাই মাঠে গিয়েছিল তখন মিমি আর মিঠু কুকর্মটা করেছে। তারপর থেকে ওদের আর কেউ রাগায় না। আর সেই কারণেই আজ টিফিনে ঠিক হল মিমি হবে দুর্গা আর মিঠু শিব। এতে যে মিমির কতটা আনন্দ তা তো বলার দরকার নেই আর মিঠুরও মহাউৎসাহ। কথায় কথায় একে ওকে বলছে, বেশি দুষ্টুমি করলেই প্রলয় নাচন নেচে দেব। সবই তো হল কিন্তু অসুর হবে কে? ক্লাসে ডাকাবুকো মেয়ে সুমি। ঠিক হল ওই হবে মহিষাসুর। শুরু হল রিহার্সাল। অনেক গণ্ডোগোলের পর অনেক কষ্টে তিতলি সবাইকে পার্ট মুখস্থ করিয়ে দিল। এ পর্যন্ত সব তো ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু শেষে যে মিমিদের মাথায় এই কুবুদ্ধি আছে তা আর কেই বা জানতো?

কালই পঞ্চমী। কাল থেকে পুজোর ছুটিও পড়ে যাবে মিমিদের স্কুলে। রিহার্সাল মোটামুটি শেষ। সবাই নাটকটাকে উতরে দিতে পারবে বলেই তিতলির আশা। তাই শেষবারের মতো রিহার্সাল করেই ও সবাইকে বলে দিল, শোন, আমাদের রিহার্সাল শেষ। আজ সবাই মাকে গিয়ে বলবি কালকে সরস্বতী পুজোর শাড়ি পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে। আর অসুর একটা কালো জামা আর কালো প্যান্ট পরবি। কাজল দিয়ে গোঁফ করবি। ঠিক আছে?

নাটকের দিন স্কুলে এসে তিতলির মাথায় হাত। কি একটা কারণে দুর্গা অসুরে মানে মিমি আর সুমিতে ঝগড়া হয়ে বসে আছে। দুজনেই দুজনের ওপর আচ্ছা রেগে আছে। টিকলি তা দেখে বলল, ভালোই হয়েছে। দুর্গা-অসুর রেগে থাকলে যুদ্ধটা বেশ রাগের সঙ্গে করতে পারবে। জমবেও ভালো।

এবার শুরু হল নাটক। ক্লাসের মেয়েরা ছাড়াও ওদের ক্লাস টিচার অনিন্দিতা আন্টিও নাটক দেখবে। শুরুটা ঠিকঠাকই হলো। এবারে দুর্গা যখন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল তখনই ঘটল বিপত্তি। হঠাৎই অসুররূপী সুমি দৌড়ে গিয়ে মিমি অর্থাৎ দুর্গাকে দিল এক ধাক্কা। অত ডাকাবুকো মেয়ে সুমির ধাক্কা খেয়েই দুর্গারূপী মিমি মাটিতে চিৎপাত। থার্মোকলের ত্রিশূল ভেঙে দু-টুকরো। তিতলি পেছন দিয়ে হই হই করে উঠল। শেষে কি অসুরের হাতে দুর্গা বধ হয়ে যাবে! কিন্তু মিমিও পিছপা হবার মেয়ে নয়। উঠে পড়ে সামনের বেঞ্চ থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে সুমির দিকে। সুমির খাড়া বনাম মিমির পেন। সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে। মিমি তক্ষুণি ছুটে গিয়ে সুমিকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। সুমিও পড়ে গেছে মাটিতে। পেনটা তুলে নিয়ে নিচু হয়ে বিঁধিয়ে দিয়েছে সুমির গায়ে। শেষে কিনা পেন দিয়ে অসুর বধ! অনিন্দিতা আন্টি হাসছেন হো হো করে। আর তখুনি পড়ে গেল পুজোর ছুটির ঘণ্টা।

পরিশ্রম সার্থক

অন্তিমা পাল

বাবা পিওন। মা করেন আয়ার কাজ। দুজনের যা রোজগার তাতে তাদের ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ে পূর্বিতার পড়াশোনা করানো এবং আরও দুটো ছেলেমেয়েকে মানুষ করা খুবই শক্ত। তাঁরা চান মেয়েকে কোনো একটা কাজে নিযুক্ত করতে বা বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু অসীম সাহসী ও জেদি পূর্বিতা এইরকম অসুবিধা কাটিয়েও পৌঁছেছে সাফল্যের পথে।

সেদিন হঠাৎ ক্লাসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল পূর্বিতা। বাংলা দিদিমণি সুচেতাদি অনেকক্ষণ হল পূর্বিতাকে ডেকে চলেছেন পড়া ধরার জন্য। কিন্তু নির্বিকার পূর্বিতা একমনে জানলার বাইরে দৃষ্টিস্থির করে রেখে দিয়েছে। হঠাৎ পাশের বন্ধু জবার ডাক শুনে উঠে দাঁড়িয়ে পূর্বিতা মুখ নীচু করে রইল। দিদিমণি বললেন—কিরে ভাবছিলি কি এতক্ষণ? বল 'রানার' কবিতাটির বিষয়বস্তু কি? পড়া বলতে থমকালো না নাইনের প্রথম স্থানাধিকারি পূর্বিতা দাস। বসে পড়ে আবার জানলার বাইরে চোখ রাখল সে। পূর্বিতা ভাবছে কাল রাত্রের কথাটা—বাবা পলাশ কাজ থেকে ফিরে এসে মা রমলাকে বলেছিলেন যে, তিনি আর বড়ো মেয়ে পূর্বিতাকে লেখাপড়া করাবেন না। এ-বছরটা কেটে গেলে লাগিয়ে দেবেন এক কাপড়ের দোকানের কাজে। তার মনে হয় যে, মেয়েদের বেশি পড়াশোনা করাটা ভালো নয়। মা কিছুক্ষণ নির্বিকার থেকে বলেছিলেন—'যা ভালো বোঝো করো।' পূর্বিতা তখন সবেমাত্র পড়াশেষ করে হ্যারিকেন নিভিয়ে খেতে যাচ্ছিলো। যাওয়ার পথে ওই কথাগুলো শুনতে পেয়ে দুঃখ, রাগ সব হচ্ছিল বাবার ওপর। বড়ো হয়ে ডাক্তার হতে চাই পূর্বিতা। কিন্তু বাবা চান যে-ও সামান্য একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে কিছু পারিশ্রমিক উপার্জন করুক। দুটোর মধ্যেই রয়েছে বিরাট সাগরের ব্যবধান। এইসব শুনে সে আর খেতে যায়নি। সোজা নিজের ছোট্ট ঘরটায় বোনের পাশে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ স্কুলে হঠাৎ বাংলা ক্লাসে কথাটা মাথায় চলে এসেছিল পূর্বিতার। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতে 'কিছু হয়নি' বলে কাটিয়ে দিল সে। খালি ভাবছে—কি করে সে পড়াশুনাটা চালাবে। আর তো কটামাস তারপরই অ্যানুয়াল পরীক্ষা, পাস করতে পারলে টেন হয়ে যাবে। ব্যস, তারপরেই সব বন্ধ। স্কুলে আসার বদলে গিয়ে ঢুকতে হবে কাপড়ের দোকানে। আর বাবা যা বলেন তার কোনো নড়চড় হয় না। পূর্বিতাও কোনোদিনও বাবার কথা অমান্য করেনি। কাজেই হয়তো এ-বছরটাই তার স্বপ্নের ফিনিশিং পয়েন্ট। তারপর দৌড় শেষ। স্কুল থেকে বেরোবার পথে হঠাৎ দেখা হল বিজ্ঞানের দিদিমণি জয়িতাম্যাম-এর সঙ্গে। দিদি ডেকে বললেন—হ্যাঁরে, পূর্বিতা—সুচেতা বললো তুই নাকি ওর ক্লাসে অন্যমনস্ক ছিলিস? কিছু হয়েছে? কোনো সমস্যা? না—দিদি, তেমন কিছু নয়, ওই বাড়িতে টুকটাক গণ্ডগোল . . . বলে পূর্বিতা। হ্যাঁ, বুঝলাম, তাতে তোর কি? বড়ো কিছু হয়েছে? বললেন দিদি। পূর্বিতা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলো না—কেঁদে ফেলল—দিদি, বাবা চান না আমি মাধ্যমিকটা দিই, পড়াশুনাটা যেন আমি ছেড়ে দিই, কি করব বলুন দিদি? কি করবো আমি, দিদি উত্তেজিত হয়ে বললেন—কি যা-তা বলছিস? পলাশবাবু তোর পড়া বন্ধ করতে চাইছেন? হ্যাঁ দিদি—মুখ নীচু করে উত্তর দেয় পূর্বিতা। কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করলেন দিদি। বাবার বয়স হচ্ছে, মা-ও আর বেশি কাজ করতে পারছেন না এবং বাবার ধারণা যে মেয়েদের বেশি দূর পড়তে নেই। তাই বাবার বক্তব্য যেন আমি একটা কাপড়ের দোকানে কাজ শুরু করে সংসারটা চালাই। হুম, বুঝলাম, আচ্ছা শোন তোর বাবার প্রথম কথাটা ঠিক হলেও দ্বিতীয় ধারণাটা একেবারেই ভুল। এখনকার যুগে মেয়েরা না এগোলে সমাজ পিছিয়ে পড়বে, এমনিই এই গ্রামে এখনও ভালো করে আলো পৌঁছোয়নি। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে সেই আলো অর্থাৎ জ্ঞানের আলো আনতে হবে সকলের চোখে। এই গ্রামে 'সারদা বিদ্যালয় ফর গার্লস' স্কুলটাই মেয়েদের একমাত্র ভরসা। তুই এক কাজ কর—এখানে তো টিউশনির টিচার প্রায় নেই, তো তুই বাড়িতে একখানা সাইনবোর্ড টাঙা যে, তুই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়াবি। তাতে উপার্জনও হবে আবার তোর পড়াটাও চলবে, কেমন? তবে ভেঙে পড়বি না। জানবি যে জীবনে যতই বাধা আসুক, এগিয়ে যেতে হবে। তবে তোর পড়াটা যেন ঠিক থাকে। কেমন? যা বাড়ি গিয়ে সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে ফেলে বাবাকে ভালো করে বোঝা। আমরা সব টিচার তোদের পাশে আছি, যা।

জয়িতাদির কথামতো পূর্বিতা সেদিন গিয়েই সাইনবোর্ড টাঙায় বাড়িতে এবং বাবাকে বোঝায়—বাবা আপত্তি না করলেও সন্তুষ্ট হননি। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই অল্প কিছু মধ্যবিত্ত অর্থাৎ একটু বড়ো ঘরের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের অল্প টাকায় পড়ানোর জন্য নিয়ে এলেন পূর্বিতার কাছে। মেধাবী পূর্বিতার সুন্দর পড়ানোর জন্য পাশের

পাড়া থেকেও কয়েকজন এল। চলতে লাগল পূর্বিতার নিজের পড়াশোনা। টেনে উঠে ফার্স্ট হয়ে বাবার চোখে তাক লাগিয়ে দিল সে। তবে সময় তো আর দাঁড়ায় না তাই দেখতে দেখতে চলেও এল মাধ্যমিক। আর একমাস বাকি। খুব মন দিয়ে পড়ল এই একটা মাস। ভালো রেজাল্টও করল মাধ্যমিকে। তবে জীবন সবসময় এক রকমভাবে চলে না। বাবা অসুস্থ হলেন কিছুদিনের মধ্যেই। হসপিটালে ভর্তি করতেও হল তাকে। লিভার ক্যানসার ধরা পড়ল। তখন বাড়ির নাজেহাল অবস্থা কিন্তু জয়িতাদির কথা মাথায় রেখে ভেঙে পড়েনি পূর্বিতা।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর চার মাস বাদে মারা গেলেন পলাশবাবু। মা খুব ভেঙে পড়লেন। তখন তার একমাত্র ভরসা ছিল মেয়ে পূর্বিতা।

বাবার মারা যাওয়ার আজ প্রায় বছর দশেক হল। এরমধ্যে ভাই তন্ময়কে ও বোন পূজাকে পড়াশোনা করিয়েছে পূর্বিতা। এখন সে বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. পূর্বিতা দাস। এখন সে থাকে কলকাতায় বিরাট ফ্ল্যাটে। মা ভালোই আছেন। তন্ময় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আর পূজা থার্ড ইয়ারে। একবার করে সপ্তাহে নিজের গ্রামে রুগি দেখতে যায় পূর্বিতা। সবাই তাকে ভগবানরূপে জ্ঞান করে। গ্রামের এখন বেশ উন্নতি হয়েছে। জয়িতাদির সঙ্গেও কথা হয় মাঝে মাঝে। পূর্বিতা জানে যে জয়িতাদি না থাকলে আজ সে এখানে এসে পৌঁছোতে পারতো না। সে এখনও সবাইকে বলে—মেয়েরাও পারে, তারাও পড়াশোনা শিখবে। কখনো পিছিয়ে আসবে না, তারাও হবে বড়ো পুলিশ অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, টিচার। না হলে সমাজ এগোবে কি করে? আমাদের সবার উচিত সেইসব মেয়েদের সাহায্য করা যারা এখনো অন্ধকারে আছে। সেই অন্ধকারকে দূর করে তারা হয়ে উঠবে জগতের ভবিষ্যতে, তবেই না পরিশ্রম সার্থক হবে।

দেবাংশী চক্রবর্তী, বয়স : ৩

রিয়া জানা, বয়স : ১৩

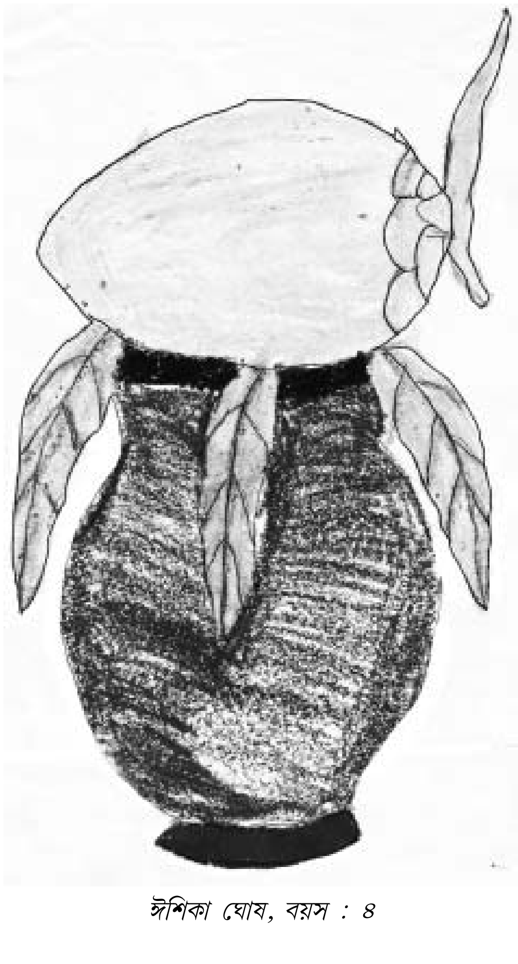

ঈশিকা ঘোষ, বয়স : ৪

ভূ-স্বর্গের কোলে

মুদ্রা

দম বন্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের জীবনে যে ছুটির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। মনকে পুরোপুরি সতেজ ও সজীব করার জন্য ভ্রমণের থেকে বোধহয় বেশি ভালো উপায় আর নেই। এই কথা ও ধারনায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী বলেই হয়তো প্রত্যেক বছর আমরা বেড়াতে যাই। এরকমই ভাবে ২০১২ সালের গরমের ছুটিতেও আমরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম।

প্রথমটাতো সত্যিই বুঝতে পারিনি যে জায়গাটা ভূ-স্বর্গ। প্রথমদিনে যখন কোলকাতা থেকে দিল্লি বিমানে করে যাচ্ছিলাম—তখনই উত্তেজনার তুঙ্গে ছিল আমার মন। দিল্লি পৌঁছে এক রাত বাসে চড়ে পৌঁছেছিলাম কাট্‌রাতে। কাট্‌রা শহরটা চারিদিক ঘিরে রয়েছে পাহাড় এবং একটি পাহাড় চূড়ায় বৈষ্ণ দেবীর মন্দির। যেদিন কাটরা পৌঁছোলাম ওই দিন রাতেই আমরা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। হাঁটা শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সব ঘরবাড়িকে দেখে জলন্ত দেশলাই বলে মনে হল। প্রাকৃতিক দৃশ্য রাত্রে আন্ধকারে দেখার উপায় ছিল না। শীতল হাওয়া আমার মাথায় শরীরে নিজের ছোঁওয়া লাগিয়ে যেন পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। এ চলনের তেমন কোনো ভীতির বা রোমাঞ্চের কোনো কারণ ছিল না। কারণ চারপাশ ছিল দোকান বাজারে ভরা। আর কত যে লোক কত রকমের হাঁটা ঘোড়া, ডুলি—ভোরবেলার দিকে আমরা এই তীর্থস্থানে পৌঁছে পুজো সেরে হেলিকপ্টারের সাহায্যে বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম।

সেইদিন যাত্রা শুরু করলাম পহেল গাঁও এর উদ্দেশে। সেখানে খরস্রোতা লিডার নদীর কথা আমি আগের থেকেই শুনেছিলাম। আমরা যখন পৌঁছুলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে, ঠান্ডা চারিদিকে শান্ত আর শুধু লিডারের কুলুকুলু শব্দ। চারিদিকে অন্ধকার নিস্তব্ধ তবু যেন মনে হচ্ছিল এ গ্রামটি অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছে। নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে চাইছে এই আগন্তুকদের জন্য। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে যে ছবিটি আমাদের কাছে ধরা দিল তা যেন এক স্বপ্ন রাজ্য কি সুন্দর। কি মনোরম নদী বয়ে চলছে তার আপন খেয়ালে আপন বেগে, চারিদিকের পাহাড়ের ঝাউবন যেন পাহারা দিচ্ছে নদীকে পাছে কেউ তার সৌন্দর্যের দিক কুদৃষ্টি নিয়ে তাকায়। সমস্ত প্রকৃতি যেন আরেকটি নতুন দিনকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বুকে টেনে নিচ্ছে।

সেইদিনই আমরা বেরিয়ে পড়লাম স্থানীয় কয়েকটি জায়গা দেখতে। আরুভ্যালির নির্জনতা মনে শূন্যতা বোধ নয়। এক অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি করে। একে একে বেতাব ভ্যালি ও চন্দন ওয়ারি সেই জায়গা লিডার নদীর উৎস। ঘোড়ায় চড়ে বাই সরণে গিয়ে ভূস্বর্গকে আরও একবার বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম। পরদিন ভোরবেলা আমাদের পহেল গাঁওকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সোনমার্গে। আমি নদীটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কখন যে নিজের অজান্তে কাঁদছিলাম বুঝিনি। আসলে এর আগে কখনও বুঝিনি যে মানুষ ও প্রকৃতির জন্য বিচলিত হতে পারে। কিছু হয়তো প্রকৃতিকেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা তো শহরে থাকি তাই বোধহয় প্রকৃতি থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়েছিলাম যে কিছুই বলে উঠতে পারছিলাম না। কয়েক মুহূর্ত কোথায় হারিয়ে গেলাম তারপর আবার গাড়িতে এসে বসলাম।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল সোনামার্গ, যেখানে পৌঁছে বোঝা যায় সোনামার্গ নামের স্বার্থকতা। আকাশ বেশি সুন্দর না পাহাড় বেশি সুন্দর এ বলা এখানে দাঁড়িয়ে ভারি কঠিন। প্রকৃতি সেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে। নিজের উপলব্ধি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে ছিল। সেখান থেকে জোজিলা পাস গিয়েছিলাম এক দুর্গম পাহাড়ি পথ আরোহন করে। বরফের চাদরে পা দিয়ে সকলে প্রবল আনন্দ লাভ করলাম।

ফেরার পথে শ্রীনগরের বিখ্যাত শিকারায় চড়ার অভিজ্ঞতাও স্মরণ করার যোগ্য। সর্বশেষে এই ভূস্বর্গকে বিদায় জানিয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে এলাম। বিধাতা কাশ্মীরকে সৌন্দর্য দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করেছে ওখানকার সৌন্দর্যের মতো আর কোনও রাজ্যে, দেশে-প্রদেশে হয়তো নেই। সৌন্দর্যের অজানা আনন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম ওখানে গিয়ে এই অনুভূতির কারণেই কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Pie in the Sky

Raddur

The days will pass for it is to move
Let me behold, the sky for you —
My imaginations... My dream where you
And only you dwell let the rocks be kissed,
By the gentle waves there shall the sky be painted,
With Blue-dye.

The stripped Tree; Hanging lanterns
Lights spreading... So noble a sermon
The tongues loving each word
Because there you
Only you dwell.

Poverty

Deepanjana Roy

'The unfinished business of the twenty-first century is the eradication of poverty'
—Juan Somania, United Nations World Summit for Social Development, 1995.

Poverty is one of the most horrifying features of economic under-development. Consequently, the issue of poverty line comes in where we state individuals to be poor if they are below a minimum, critical value of income or consumption of goods and services. People thriving in poor conditions suffer from under-nourishment, little or absence of literacy, living in unhealthy environmental conditions.

There are various measures of poverty for instance

(i) the head count ratio which is head count divided by the entire population size

(ii) poverty gap ratio

(iii) Income gap ratio.

Estimates suggest that the number of poor people in the world in 1990 was over a billion. Over 40% of the world's population which is approximately 2.7 billion people live on less than $2 a day.

A high degree of correlation can be observed between household size and poverty. According to an observation based on World Development Report, it was found that 10% of households in Pakistan (1984) had an average of 7.7 members.

Economic poverty has much adverse impact on society.

- It after restricts poor individuals from accessing the various goods and services in the economy which further results in the stagnation of the economy and lowering of the Aggregate Demand. As a result, GDP (Gross Domestic Product) is negatively affected.
- Poverty has an impact on the health of the individuals. Undernourished individuals fail to income a productive member of the society on account of his low income.
- Poverty intervenes in the fulfillment of education and acquirement of skills which can ultimately result in the formation of human capital leading way to acquiring better and desired jobs. Technological change is observed to be skill biased hence there is a necessity for individuals to be skilled.

Various poverty alleviation measures can be implemented to tackle the problem of poverty.

- Changing the Functional Distribution of Income through Policies designed to change Relative factor prices. Due to unsuccessful Government policies and various constraints, the relative price of labour becomes high that would be if the supply and demand were to adjust freely. Efforts should be made to reduce the price of labour relative to capital can cause employees to substitute labour for capital which can raise the overall employment and the incomes of poor can increase.

The correction of labour costs will inevitably lead to increase productivity, efficiency and inequality will decrease. Hence growth will be generated.

- Unequal and intense concentration of wealth and assets in the hands of a particular high income earning proportion of the population is one of the leading factors of poverty. The target should be to lessen the concentrated control over these asset ownerships. Education should be promoted Government should work out different schemes to generate more employment opportunities and Reform is one of the redistribution policy. Land Reforms converts tenant cultivators to small landholders who will then put more effort to increase their income and productivity. Dynamic redistribution policies can also be taken up. In developing countries, 'redistribution from growth' can take place which is proportion of annual savings and investments can trickle clean to the poor.
- Progressive taxation can be applied directly on wealth and income. These taxes depend on personal and corporate incomes. The wealthy individuals are required to pay large percentage of income than the poor.
- Direct money transfers, subsidized food grains, policies to keep price of food grains low, schemes like 100 days of employment (in India) , various public health projects, access to clean water, supplementation programmes are measures to alleviate poverty.

THE SUN:IT'S STORY AND MYSTERY

Abir Sarkar

The three-later word, Sun, is very familiar in our life. Everyday, our day starts by getting enlightened by the generous and gorgeous rays of it. All the lives and lively interactions on this planet are being blessed by this ultimate source of energy all the times. But not only this is the key of life but also offers a very wide and fascinating storehouse for scientifically inquisitive minds. Have you ever wondered how all this energy, which is enough to run even this big planet, is being generated? Have you ever thought what can be the possible architecture of Sun? Have this question ever germinated in your mind how the life of this big creator can direct the story of us? In this short discussion, let's try to look for the answers of these questions.

To understand the basic mechanism of energy production in Sun, let's first give me an introduction about it's structure. To present in a simple way, Sun is an 'Young-aged' star, born around 4.6 billion years ago. In scientific language, this type of stars are called 'Main-Sequence stars'. This type of stars have broadly two parts. The center one is the core and a surrounding atmosphere. You will find a schematic of this structure in Figure-1a The core is the power house of the stars. Our Sun has a core with radius of 0.2 times the Solar

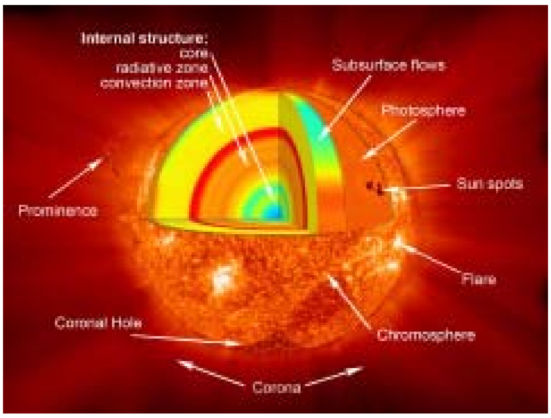

(a)

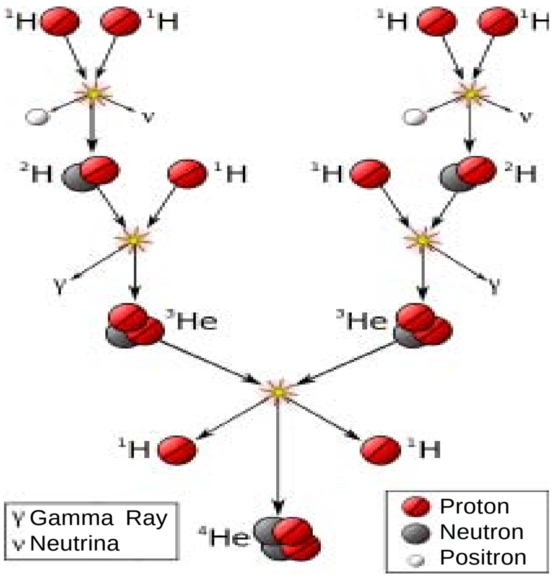

(b)

Figure 1: The Over-all structure of Sun (a) and A cartoon of the pp-chain (b)

radius and it is, tremendously hot with temperature around 15 Million Kelvin! The main source of energy in Sun is the Hydrogen fuel. The energy is produced in a chain of reactions called "p-p chain" . The structure of the Hydrogen atom is the following, it contains a positively charged proton which forms the nucleus and a negatively charged electron which orbits around this nucleus. Now, as the core is so hot , the atoms break up into the electron and nucleus and stays in a super hot state called the plasma state . In the rst step of this chain, as you can see in the Figure-1b below, two Hydrogen nuclei combines with each other to from a 'Deuteron', which is nothing but a nucleus with a proton and a neutral particle called neutron. This process is very slow, it takes around 1010 years. In the next step, within 1 second this deuteron combines with a proton to form a Helium-3 nucleus. Normally, the Helium nucleus

contains 2 protons and two neutrons, but this special type of Helium contains one less neutron. This step contributes some energy in the Sun. Finally, in a timescale of 300 Thousands years, the two Helium-3 nuclei combines to provide one Helium nucleus and two hydrogen nucleus, and a huge amount of energy, as Gamma-ray photons. This chain reaction is believed to take place in the core of the Sun. The energy produced is converted into thermal energy and propagates through the outer parts of the Sun.

Well, so we got our energy. Now, let's focus on how to carry this energy outside the Sun for the sake of the Solar system. As we all know, heat flows in three different ways— 1) Conduction, where the particles of the medium moves and carries the thermal energy, 2) Convection, where heat propagates in the medium without moving the particles of that medium and 3) Radiation, where heat propagates as a form of electromagnetic wave and does not need a medium. In a star, there can be several processes by which the heat is carried from the core to outside. But, in case of Sun the most effective process is radiation. Immediately after the core, the radiation zone starts. The radiation zone covers a big part of Sun, starting from 0.2 times the Solar radius, up to 0.71 times of that. The energy that is formed in the core as a form of Gamma-ray photons, traverses through the radiation zone by interacting with the atoms those are present in that zone. The interaction is a very simple process, you can refer to the Figure-2 below to have a clear understanding. The temperature of this zone is lower than that of the core. That is why, some atoms in this zone can survive from breaking up into electron and nuclei, which does not happen at the core. The Gamma-ray photons interact with these atoms, and the atoms store the energy for a while and leaves them as new radiation. The only catch is that, this interaction between photons and the atoms happen very randomly, not a simple nearest-neighbor chainlike way. This delays the process of energy propagation enormously. It takes around 171 thousands years for the photons to travel form the upper surface of the core to the upper surface of the radiation zone and significant amount of loss of energy and information about the Solar core can take place.

After the photons successfully come out of the radiation zone they finds themselves in a zone with temperature about 2 million Kelvin. So, here the surrounding atoms will be cooler and too stable to re-radiate after interaction with the photon. So, here comes a new type of energy propagation, which is convection. Now, this zone is more interesting from physics point of view than the radiation zone. Imagine yourself in a situation, where you got stuck at the bottom of an ocean and trying to come up using a big bubble of gas which surrounds you inside itself and uses the buoyancy to come up. Now, as you come up, the pressure decreases and the bubble cools down. Now if it gets cooler than the surrounding temperature, you will again sink into the deep and can never come out. But in the Sun, outside the radiation zone, the material at the bottom of the convection zone are lucky enough to get a steeper temperature gradient to stay warm enough to reach the top of this zone very

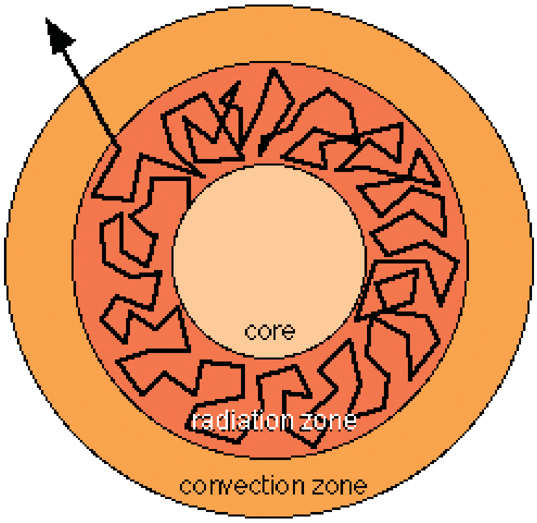

Figure 2: A schematic view of radiation in radiation zone of Sun

quickly, sometimes in a single go. It is approximately an week walk. The process is very similar to boiling water in a metal pot and as you can see from the Figure-3 below very similar structure forms inside this zone also. Now, whether the star can support convection or not has been calculated by Karl Schwarzchild and is well known as 'Schwarzchild Criterion'. Interested readers are encouraged to have a look in the reference.

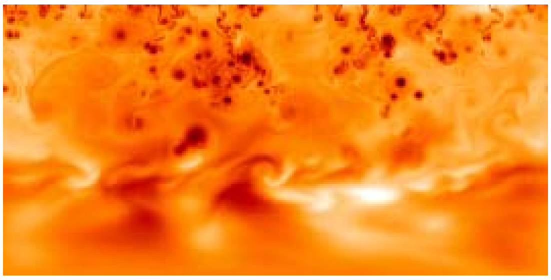

Figure 3: Structures in the Convection zone of Sun

After the convection zone is over the Solar atmosphere starts. The first part of it is photosphere. Until this, the structure of Sun is not visible by telescopes. They can be studied by several indirect techniques. Photosphere is the first part which can be studied directly by telescopes or other radiation detectors. The temperature of solar photosphere is around 4500-6000 Kelvin. Though the temperature is very low, the density of the gas layer is very less, so that the atoms can re-radiate the energy obtained after interaction with photon. So, the energy is once again propagated via radiation and actually most of the energy that we get from the Sun is from this re-radiation. The convection zone, below the photosphere forms granular structure, each approximately 500km radius, of hot and cold material in the photosphere, very similar to granular structures formed in boiling water (Refer to the Figure-4a below). Typical granules group to from Super-granule of radius around 15000km and lasts for around a day. The photosphere contains one more interesting feature, called the 'Sun-spots'. They are colder areas on the photosphere and seen as dark spots. Typical temperature of them is around 3500-4000 Kelvin. Most of them have two structures, one is a dark interior called 'Umbra', surrounded by less dark area called 'Penumbra' (Figure-

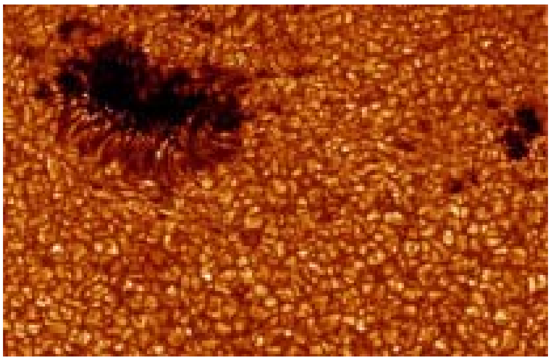

(a)

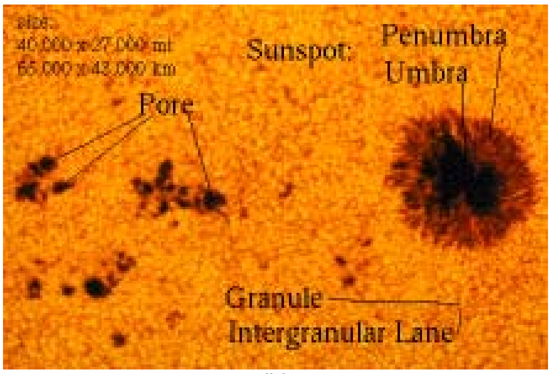

(b)

Figure 4: Granular Structure in Photosphere (a) and Sunspot (b)

4b). These sunspots are currently an active field of research in Solar physics and can reveal a lot of important informations about the structure and evolution of Sun. The process of formation of Sun-spots is very complicated and beyond the scope of this discussion.

The next upper layer is the most beautiful part of Sun, the chromospheres (Figure-5a). It's around 2000 km deep and the gas density is too low (1/10000 th times that of photosphere) to be seen without the total solar eclipse. The energy is radiated through this medium and most of the energy is emitted in red light. Detailed study of this chromosphere show more super-granules and jagged-spiky structures called spicules. They seem to be in a dancing pattern, originating from the base of chromosphere and shooting up to several

thousand kilometers and again coming back to the surface.(Figure-5b) Above this corona there is a very thin zone of around 100km , known as the transition zone, where the temperature reaches abruptly to 2 Million Kelvin. The physics of this process is still a mystery. You are most welcome to make a considerable amount of contribution to the Solar physics by solving it.

Have you seen the beautiful colorful lights on the sky of polar regions known as Aurora Borealis in the Northern hemisphere? The outermost part of Sun, the Corona is responsible for this pleasant scenario. As mentioned above, the temperature of corona is very high but simultaneously the density is very low. So, like chromosphere, the only time to see the Corona is during the solar eclipse or with a specially dedicated tool called \Coronagraph”. But once you got it, you are exposed to a whole goldmine of beautiful interesting structures. The Sun has a very

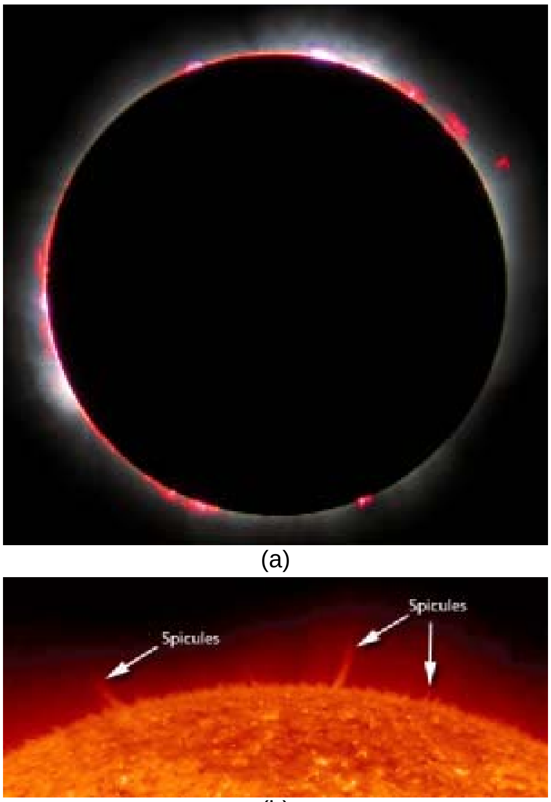

(a)

(b)

Figure 5: Chromosphere (a) and Spicules in the chromosphere (b)

strong magnetic field and the magnetic field, in an environment of this kind follows certain lines of track, called field-lines. The electrons in the corona, follows these field lines and shows different structures. Some of them are

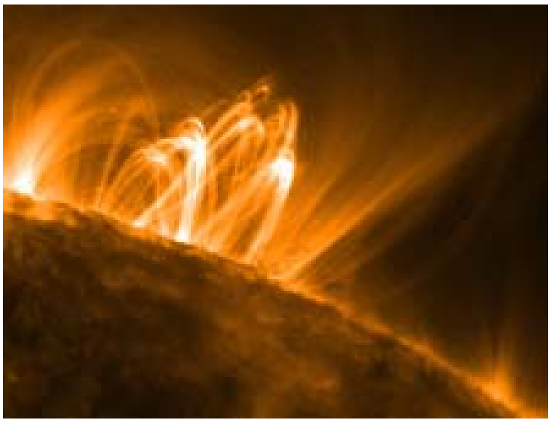

Figure 6: Structures in the Corona of Sun

shown below in Figure-6. Sometimes, these charged particles are thrown out of the Sun as solar wind at a very high velocity. When these particles interact with the atoms present in the atmosphere of the earth it emits energy as a form of colorful lights, showing Aurora Borealis.

So here the story of Sun ends, well, to an approximation. Now, what is the future of the Sun, and more importantly, ours? Generally, the Main-sequence stars, like Sun , expands in it’s course of life to radius up to 1000 times of it’s present radius, entering the Red-Giant phase. Possibly we are not lucky enough to survive to see this Super-Sun. The increase of radius of Sun will make the luminosity to increase, which in turn, evaporate all the waters of out mother earth and leave it into a non-livable place, unless we make it before that. So, we are here for mostly 250 Million years, the clock is ticking.

References:-

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_criterion

2) http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

3) http://solar.physics.montana.edu/ypop/Spotlight/SunInfo/Structure.html

4) Journey from the Center of the Sun — by Jack B. Zirker

5) The Role of the Sun in Climate Change — by Douglas V. Hoyt

কলম নিয়ে কথা

অনির্বাণ রায়

লেখা হত কত কিছুর ওপর। কিন্তু লেখা হত কী দিয়ে। কী ছিল লেখনী বা কলম। লেখনী ছিল দু-ধরনের। একটায় অক্ষর উৎকীর্ণ বা খোদাই করা হত। তার নাম শলাকা বা স্টাইলাস। দ্বিতীয়টার নাম কলম বা পেন। 'কলম' কথাটা আরবি। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> 'কলম'—শালিধান্য (অ.কো) [অমরকোষ]; লেখনী (শব্দরত্নাকর, মেদিনী, বৈজয়ন্তী, বিশ্বপ্রকাশ, ত্রিকাণ্ডশেষ, অভিধানচিন্তামণি ইত্যাদি); আ কলম্—শর, নল (reed), আরবী শব্দের মূল 'কলম্ব'; অমরকোষধৃত 'কলম্ব'—শাকনালিকা (ডাঁটা'; বোধ হয়, আরবী শব্দের মূল 'কলম্ব'; মুসলমানশাসনকালে প্রথমে আদালতে, পরে কথ্যভাষায় 'কলম' শব্দ প্রচলিত ও পরে পরবর্ত্তী সংস্কৃতকোষে ধৃত হইয়াছে ... পূর্ব্বকালে লেখার নিমিত্ত ব্যবহৃত 'শর' 'খাক', 'কঞ্চির কলম' সবই নালিকাবিশেষ। গ্রিক 'kalamos' এবং ল্যাটিন 'calamus' শব্দেরও মৌলিক অর্থ 'নল', 'বেত্র' (reed, cane) এবং গৌণার্থে 'নলের কলম' (reed-pen)।

জ্যোতিভূষণ চাকী লিখেছেন তাঁর 'বই তো পড়ো, টই পড়ো কি?'-তে:

> মিশরে প্যাপিরাসের উপর লেখার জন্যে ছিল নল-কলম। নলখাগড়া থেকে প্রয়োজনমতো একটি অংশ কেটে নিয়ে একদিক ছুঁচলো করে নিয়ে কলম হিসেবে ব্যবহার করা হত। . . . প্রয়োজনে এই কলমের মুখটা একটু চিরে নেওয়া হত। মিশরে লেখবার উপকরণগুলো খাঁজকাটা বিশেষ একটি ফলকে সাজানো থাকত। কলম রাখার খাঁজ আলাদা, কালির কাঠি বা বড়ি রাখার খাঁজ আলাদা। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এই নল-কলমের প্রচলন ছিল। প্রথমদিকে কলমগুলি লম্বায় হত ২৬.৫ সেন্টিমিটারের মতো, পরে কাটতে কাটতে তা যখন অনেক ছোট হয়ে যেত তখন তা অন্য কাঠের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে ব্যবহার করা হত। নল-কলমের ব্যাস হত ১ ইঞ্চি মতো। এই মুখ-চেরা নল কলমের অনুকরণেই পরে স্টিল-পেন তৈরি হয়েছিল। পারস্যে এবং ভারতে দীর্ঘদিন এই নল-কলম দিয়ে লেখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় আছে এই নলকলম বা খাগড়া কলমের উল্লেখ:

> তেমনি আবার পালাগানটা লেখনো হয়েছ এমনসব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মকশো করেনি।

নলকলমের পরের যুগের কলম এসেছে পাখির পালক থেকে। রবীন্দ্রনাথের ওই 'ছেলেবেলা' থেকে তুলে দিই একটুখানি:

> মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে পালকের কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে . . .

জ্যোতিভূষণ চাকী ওই আগের বইতে লিখেছেন:

> ইংরেজি Pen এসেছে লাতিন Penna থেকে। Penna মানে পাখির পালক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কলমের প্রতিশব্দ যা তার প্রধান অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই পালক। পৃথিবীর সব জায়গাতেই পাখির পালক ছুঁচলো করে বেড়ে নিয়ে কলম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। চামড়া বা পার্চমেন্টে প্রধানত এই পালক-কলম দিয়েই লেখা হত। মিশরে চিত্রলিপি বদলে গিয়ে যখন আরও সহজরূপ নিল তখন তাড়াতাড়ি লেখার জন্যে পালক-কলমও ব্যবহার করা হয়েছে।

পালক-কলমের কথায় আবারও মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কথা। নাতনি নন্দিনীকে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, তার পালিত হাঁসেদের কথা যারা কবি-দাদামশায়কে 'যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে' থাকত। তবে নিজেদের চিঠি লেখার অক্ষমতা নিবেদন করতে ভুলত না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেদন:

> আমি যেখানে বসে লিখচি তার জানলার সামনে রোজ তারা চরতে আসে, গুণে দেখিনি, কিন্তু দলের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় তার সুস্থ শরীরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে—ডানায় তাদের অতগুলো কুইল্ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তারা চিঠি লিখতে পারে না এই দুঃখ জানিয়ে তারা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচায়—তাই তাদের হয়ে আমাকেই লিখতে হয়।

কিছু-না-হোক হাজর বছর ধরে মানুষ পালকের কলম ব্যবহার করেছে। গ্রেট ব্রিটেন এক সময় তিন কোটি পালক আমদানি করত। সারা ইউরোপকে ভালো জাতের পাখির পালক জোগান দিত রাশিয়া আর হল্যান্ড। পাখিদের ভেতর

যাদের পালক শক্ত যেমন রাজহাঁস, পাতিহাঁস, টার্কি তাদেরই পালক বেশি ব্যবহার করা হত এই জাতীয় কলম তৈরিতে। ইংল্যান্ডের রাজা ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষর করেছিলেন এই পালকের কলমে। সে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের কথা।

কালক্রমে সাক্ষরতার হার বাড়তে পালকের কলমের পরিবর্তে টেঁকসই ধাতব কলম তৈরির চেষ্টাও সমানে চলছিল। শিং বা কচ্ছপের খোলা দিয়ে কিছু কিছু কলম তৈরি হয়েছিল। ধাতুর কলম কে প্রথম তৈরি করেছিলেন নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। দাবিদার অনেক। নথিপত্র বলে ইংল্যান্ডের হ্যারিসন নামে একজন ইস্পাতের কলম তৈরি করেন ১৭৮০-তে। তাঁর পথানুসরণ করেন ওয়াইজ, নিবাস লন্ডন। তাঁর তৈরি পাঁচ শিলিং দামের কলমগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮২০-তে জোসেফ মিলেট তৈরি করলেন পাতলা নমনীয় ইস্পাতের নিব। জন মিশেল মেশিনে তৈরি কলম বাজারে ছাড়লেন। একই সময়ে এই কাজে মাথা ঘামাচ্ছিলেন জেমস পেরি। ১৮২৮-এ যোসিয়া মেশন চেষ্টা করলেন কীভাবে এই কলমকে উন্নত আর তার উৎপাদন ব্যয় কমানো যায়। এই একই বছরে তিনি পেরির জন্য ব্যারেল কলম, পরের পছর চেরা-নিবের কলম তৈরি করলেন। ১৮৩০-এ পেরি তাঁর কলমের পেটেন্ট নিলেন। বলা বাহুল্য এইসব কলমেই লিখতে হত কালিতে নিব ডুবিয়ে। প্রথম ব্যবহারযোগ্য ঝরনাকলম বা ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত করলেন লুইস এডসন ওয়াটারম্যান (১৮৩৭-১৯০১)। বছরটা ছিল ১৮৮৩।

ওয়াটারম্যানের জন্ম নিউ ইয়র্কের ডেকাটুরে। লেখাপড়া বেশি দূর করেননি। ষোল বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে চলে এসেছিলেন ইলিনয়তে। অল্প বয়সে অনেকরকম কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে: সূত্রধর, বিদ্যালয় শিক্ষক, প্রকাশক-প্রতিনিধি, শর্টহ্যান্ড শিক্ষক। শেষপর্যন্ত পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বিমা-দালালি। এই দালালিই তাঁকে কলম-আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দেয়।

১৮৮০-র গোড়ার দিকের কথা। ওয়াটারম্যান গিয়েছেন তাঁর এক ওজনদার মক্কেলরে কাছে বিমার কিছু কাগজপত্র সই করাতে। অনেক টাকার ব্যাপার। তখনকার দিনে এইসব সইসাবুদ করতে হত কালিতে। ওয়াটারম্যান সই করিয়ে নিয়েছেন। এমন সময় বিপত্তি ঘটল। কলমের কালি উপচে পড়ে বিমার কাগজপত্র সব মাটি করে দিল। তড়িঘড়ি আরেক দফা কাগজে সই করিয়ে নিলেন ঠিকই কিন্তু এই একটুখানি দুর্ঘটনার জন্য অমন মহামক্কেল হাত ছাড়া হয়ে গেল ওয়াটারম্যানের। ওই কালির কলমটাই যত নষ্টের গোড়া। তাঁর ছিল জেদ আর উদ্ভাবনী প্রতিভা। ওয়াটারম্যান ভাবতে লাগলেন এমন কোনো কলম কি তৈরি করা যায় না যা কালি উপচে মানুষকে অপদস্থ করবে না। যে-কলম কালি উগরে দেয় না। পেটেন্টের জন্য আবেদন করে দিলেন ওয়াটারম্যান। পেটেন্ট মঞ্জুর হল ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪। কলমের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হয়ে থাকল সোনার অক্ষরে। এই কলম আবিষ্কার করার পর ওয়াটারম্যান বিমা-দালালি ছেড়ে দিলেন। খুললেন এক কোম্পানি। নাম দিলেন এল. ই. ওয়াটারম্যান কোম্পানি। এক চুরুটের দোকানের পেছনে ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে তিনি শুরু করে দিলেন কলম তৈরি। নিউ ইয়র্কে ফুলটন স্ট্রিটে দোকানের সাইনবোর্ড লাগালেন: 'ওয়াটারম্যান আইডিয়াল ফাউন্টেন পেন—পাঁচ বছরের গ্যারান্টি'। প্রথম বছর তিনি তৈরি করলেন দুশো কলম। প্রত্যেক ক্রেতাকে দিলেন লিখিত গ্যারান্টি। দ্বিতীয় বছরে কলম উৎপাদনের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচশো। খুব বড়ো ব্যবসা ফাঁদতে চাননি ওয়াটারম্যান। ক্রেতাদের তিনি ভাবতেন বন্ধু হিসেবে; প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা তিনি লিখে রাখতেন। তৃতীয় বছরে একজন বিজ্ঞাপন-প্রতিনিধি ই. টি. হাওয়ার্ড পরামর্শ দিলেন ওয়াটারম্যানকে, তিন লক্ষ প্রচার আছে এমন কোনো পত্রিকায় একটা এক-চতুর্থাংশ পাতা বিজ্ঞাপন দিতে। বিজ্ঞাপনের সাড়ে বাষট্টি ডলার সেই ভদ্রলোককে পকেট থেকে দিয়ে দেবেন তিনি। বিজ্ঞাপনে কাজ না হলে—জানালেন তিনি—কোনো অর্থ ওয়াটারম্যানকে দিতে হবে না।

রাজি হয়ে গেলেন ওয়াটারম্যান। বলা বাহুল্য, এই একটি বিজ্ঞাপন তাঁকে এমন সাফল্য এনে দিল যে আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর প্রয়াণবর্ষে কলম বিক্রির হার ছিল দিনে এক হাজার।

কলম বিষয়ক টুকরো কথা

কলম সম্পর্কেও যোগিনী তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে। যার অর্থ বাঁশের কলম অশুভ, তামার কলম দারিদ্র্য, সোনার কলম লক্ষ্মীলাভ, কাগের কলম মতিবৃদ্ধি, রূপোর কলম বিপুল ধনলাভ, কাঁসার কলম মৃত্যু সূচিত করে। কলম ৮ বা ১০ আঙুল লম্বা হওয়া উচিত। ৪ আঙুল কলমে পুস্তকে লিখলে আয়ুক্ষয় হবে ইত্যাদি।

বংশ-সূচ্যা সিখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্র-সূচ্যা তু বিভবো ভবেন্ন তৎ ক্ষয়ো ভবেৎ।।

বংশজাত লেখনী দ্বারা বর্ণবিন্যাস কালে অমঙ্গল হবেই। কিন্তু তামার তৈরি লেখনীতে লিখলে এমন ধনবৃদ্ধি হবে যার ক্ষয় নেই।

লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা
যদি বা পুনরায়তি (?) ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দিতা।।

লেখনী পুস্তিকা ও পত্নী পরের হাতে গেলে তারা একেবারেই গেল, যদি ফিরেও আসে তবে তারা হবে ভ্রষ্টা, নষ্ট ও মর্দিতা।

টুকরো খবরে কলম

প্রেমের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড। তাঁর কালো ওয়াটারম্যান কলম সদবির নিলামে বিক্রি হয়ে যায় এগারো হাজার একশো কুড়ি ডলারে। কেনেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের আলোকচিত্রী জন সোয়ানেল।

সূত্র : আজকাল। ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯

লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে টার্মিনাল ২-এ 'পেনশপ' নামে একটা কলমের দোকান খোলা হয়। সেখানকার সবচেয়ে মূল্যবান কলমটার দাম বিরাশি হাজার মার্কিন ডলার বা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। কলমটা মঁ ব্লাঁ কোম্পানির। সোনার তৈরি কলমটায় ৪৮১০টি খুব ছোট ছোটো হিরে।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০

বিজ্ঞাপনে চোখ ঢেকে যায় না বটে, ধাঁধায় পড়ি তবু। এই ধাঁধা সত্যিই নজর কাড়ে, দেখি ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর ডিপার্টমেন্ট স্টোর 'কা-ডে-ভে'র ছয়তলার গ্যালারিতে। গত শতকের ৩৯টি মডেলের পেলিক্যান কলম সাজানো। হরেক রকম ডিজাইন। মোটা, সরু এমনকি বল পয়েন্ট (পেলিক্যান)-ও। এক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী। অক্টোবর ১৯৯৯। কেবল কলম নয়, সেইসঙ্গে পেলিক্যান কলমের বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন দেশের কাগজে, বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বিজ্ঞাপন। এহ বাহ্য। আছে সাইন বোর্ডও। . . .

. . .

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে পেলিক্যান পেন তৈরি, কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই কলকাতার বাজারে হাজির। কলকাতায় তখন দেশী-বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্যের রমরমা। বিশ্বের বাণিজ্যে অন্যতম পীঠস্থান। জার্মানি, প্যারিস, ইংল্যান্ড, সাংহাই, টোকিওর পরেই কলকাতার বাজারে পেলিক্যান পেন। বিশ্বের অন্য কোন দেশে তখন পৌঁছয়নি।

কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পেলিক্যান কলমের ৩ ফুট বাই ৫ ফুটের রঙিন (হাতে আঁকা) পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয় (দেয়ালে)। পোস্টারের সংখ্যা ছিল ১০৪টি। এসব জানা গেল ওই প্রদর্শনীর ক্যালডে। জানা গেল এও, একদিনে পেলিক্যান কলম বিক্রি হয়েছিল বাহান্নটি। সেটা নাকি রেকর্ড বিক্রি। ক্রেতাদের মধ্যে তিনজন বাঙালি। একজনের নাম কে পি বসু। একজনের নাম নিত্যানন্দ শ (সাহা)। তৃতীয় বাঙালির পুরো নাম উদ্ধার করতে পারিনি, পদবী মুখার্জি। বাকি ক্রেতা ইংরেজ। দুইজন মহিলার নামও পাওয়া যাচ্ছে—মার্গারেট, ভিক্টোরিয়া।

পেলিক্যান কলমের দোকান ছিল ৭ পোলক স্ট্রিটে। স্থাপিত হয় ২/৮/১৯৩১-এ। দোকানের মালিক জেমস মায়ার। তিনি বৃটিশ। জেমস মায়ারের নাতনি, হিলারি রবিনসন, বয়স ছাপ্পান্ন, কলকাতার ৭ পোলক স্ট্রিটের পেলিক্যান দোকানের পোস্টার সংগ্রহে রেখেছিলেন। পেলিক্যান কোম্পানিকে বিক্রি করেছেন (জুন ১৯৯৯) এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার মার্কে।

দাউদ হায়দার

কলেজ স্ট্রিটের ধর ব্রাদার্স প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো দোকান। এখান থেকে কলম কিনতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পছন্দের কলম ছিল এভারশার্প। তেরোটি পয়েন্ট দিয়ে তেরো রকমের লেখা বেরত।

ধর বাদার্স-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন *বনফুল*। তাঁর প্রিয় কলম মঁ ব্লাঁ মাস্টারপিস। কলমটা তৈরি হত কচ্ছপের খোল দিয়ে। দেড়শো-দুশো বছরের বয়স্ক কচ্ছপ মারা গেলে বা তাকে মেরে তার খোলের মাঝখানের মোটা অংশ দিয়ে তৈরি হত মঁ ব্লাঁর দেহ। একটা খোল থেকে সব মিলিয়ে চারটে কলম তৈরি করা যেত। বনফুল তাঁর পছন্দের শেষ মঁ ব্লাঁ কলমটি কিনেছিলেন [ধর ব্রাদার্স থেকে?] ১৯৭৭-৭৮ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায়।

ফাউন্টেন পেন কথাটার বাংলা নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: ঝরনা কলম।

৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রাজা চেয়েছিলেন এমন একটা কলম যাতে কালি উপচায় না। তাঁকে নাকি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল একটা কলম যাতে কালি অন্য পাত্র থেকে সরাসরি নিবের ডগায় এসে যায়।

কলম ঃ প্রবাদে-বচনে

A goose quill is more dangerous than a lion's paw.

A sword less hurt does than a pen.

Pen and ink is wit's plough.

The pen is mightier than the sword.

You don't need a golden pen to write upon dirt.

The pen scratches; the paper is silent. *(Russian)*

The pen is the tongue of the mind. *(Spanish)*

There are only two powers in the world, the sword and the pen; and in the end the farmer is always conquered by the latter.

—Napoleon

The strokes of the pen need deliberation, as much as those of the sword need swiftness. —*Julia Ward Howe*

Scholars are men of peace; they bear no arms, but their tongues are sharper than the sword; their pens carry further and give a louder report than thunder. I had rather stand in the shock of a basilisk than in the fury of a merciless pen. —*Sir Thomas Browne*

Oh, nature's noblest gift,—my gray-goose-quill. —*Byron*

Take away the sword; states can be saved without it; bring the pen! —*Bulwer*

A pen in need is pen indeed,
So here's to the one that takes the lead.

The only pen that is instantly ready
To write so gentle, and smooth and steady.
Whose every stroke affords delight,
Induces thought and desire to write.
Its use extends from share to shore,
and it is famed the whole world o'er.
May it always continue to serve all men,
Waterman's Ideal Fountain Pen.

—The Pen Prophet, December 1913

Of possessions, I've never had a care.
All I can call mine,
In each story and line
In a pen from Montblanc it's there.

—Joachim Ringelnatz
German Novelist and Poet

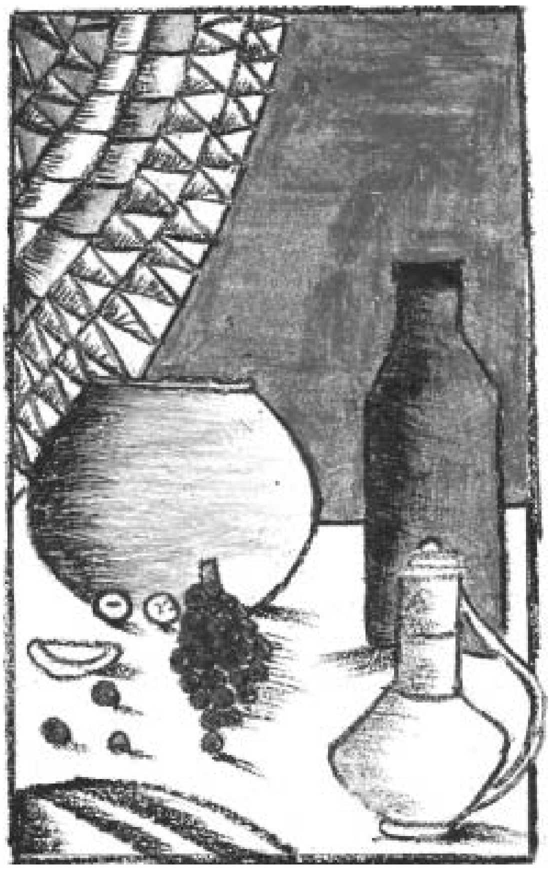

শিবাঙ্গী চ্যাটার্জী, বয়স : ১৪

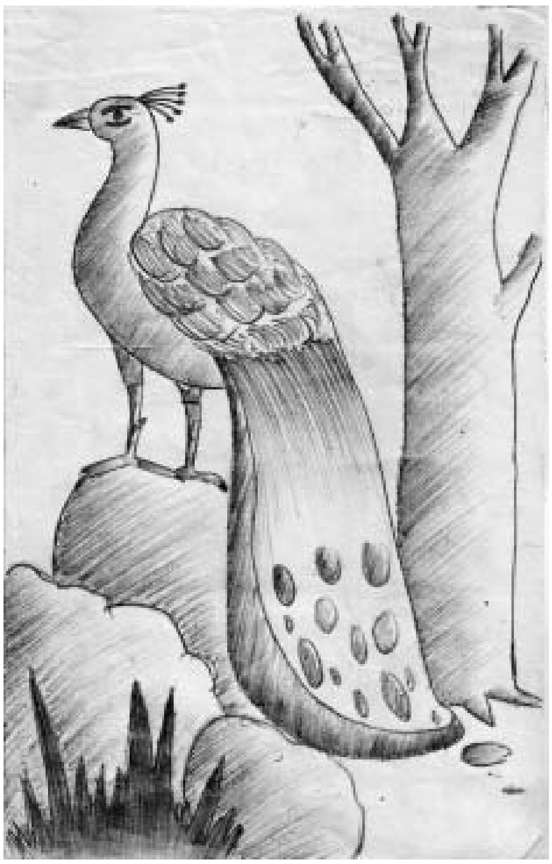

মৌমিতা বসু, বয়স : ১৬

প্রথাগত শিক্ষা : সীমানার জরিপ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কথায় বলে, কচ্ছপ দিয়ে চাষ হয় না। লাঙল টানতে আরও বড়ো, শক্তসমর্থ প্রাণী লাগে। প্রথাগত শিক্ষা হচ্ছে সেই কচ্ছপ। তাকে দিয়েই মানুষের সব রকমের মঙ্গল ও উন্নতি হবে, সমাজ-সংসার বদলানো যাবে—এমন ভাবাটাই ভুল।

অথচ এই ব্যাপারটাতেই মানুষের মোহ সবচেয়ে বেশি। ডিগ্রি-র মোহ-র কথা বলছি না। অনেকেই ভাবেন : প্রথাগত লেখাপড়া শিখলেই লোকে 'মানুষের মতো মানুষ' হয়ে ওঠে, সভ্য-ভদ্র হয়ে, কুসংস্কার-অন্ধতা কেটে যায়, স্বার্থসর্বস্ব হয় না, পরের ভালো করার চেষ্টা করে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এই মোহকে লালন করে সংসার-সমাজ-রাষ্ট্র। কিন্তু মোহটা মোহই।

এত কড়া কথা কেন বলা হচ্ছে? সেটা বুঝতে চাইলে আগে জানতে হবে: প্রথাগত শিক্ষা জিনিসটা কী।

প্রথাগত শিক্ষা বলতে একই সঙ্গে গোটাকয়েক ব্যাপার বোঝায়। যেমন,

1. ইশ্‌কুল, কলেজ ইত্যাদি মারফত ধাপে ধাপে কয়েকটি বিষয়—ভাষা, অঙ্ক, জীববিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি—আরও ছড়িয়ে ও গভীরভাবে শেখা।

2. নিয়মিত পরীক্ষা ও তার ফলের ভিত্তিতে এক ধাপ পেরিয়ে পরের ধাপে যাওয়া। পরীক্ষা মানেই প্রতিযোগিতা—ভালো করে পাশ, কোনোরকমে পাশ, ফেল। অর্থাৎ, পুরস্কার ও শাস্তি—দু-এরই ব্যবস্থা।

3. প্রত্যেক স্তরেই সফল হওয়ার স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে এক চিল্‌তে কাগজ (= সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা)। চাকরি-বাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও সে-কাগজ না থাকলেই নয়। বিয়ে-সাদি ও সমাজে খাতির পেতেও এর কদর খুব। দক্ষ কিন্তু ডিগ্রিহীন শ্রমিকের চেয়ে বি এ পাশ নিকম্মার (বেকারের কথা বলছি না) ইজ্জত বেশি।

এরই জন্যে সব স্তরে একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রম আছে। পরীক্ষা হয় তারই ভিত্তিতে। প্রশ্নপত্রেরও একটা বাঁধাগৎ থাকে। অবশ্য মাঝে-মধ্যে তার হেরফের হয়। কিন্তু সে হলো এক গতের জায়গায় অন্য গৎ। এছাড়া প্রথাগত শিক্ষা চলে না।

বাচ্চা বয়েসেই যাঁদের অনুভূতি খুব চড়া, তাঁরা কিছুতেই এই বাঁধাগতে স্বস্তি পান না। আবার অনেক ছেলেমেয়েই লেখাপড়া শেখাকে অত্যাচার বলে ভাবে। মনটা পড়ে থাকে বাইরে—খেলাধুলো, নাচগান বা অম্‌নি কোনো জগতে। খানিকটা চাপাচাপি করেই তাদের অক্ষরপরিচয় করাতে হয়। পরে যখন নতুন নতুন বিষয় আসতে থাকে—ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি—তখন কারও কারও ভালো-লাগার জগৎ তৈরি হয়। কোনো মাস্টারমশাই বা দিদির প্রভাবে আরও বেশি জানার ঝোঁক চাপে।

এইভাবে চলে মাধ্যমিক ছাড়িয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক। তারপর আসে বিশেষ জ্ঞানের চর্চা—ডাক্তারি, ইন্‌জিনিয়ারিং বা কোনো বিশেষ বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়া। উচ্চ-মাধ্যমিকের বেড়ায় আটকে গেলে সব আশা শেষ। কায়ক্লেশে টপকালে পাশ কোর্সে স্নাতক হওয়া। . . . উচ্চতর শিক্ষা চলতেই থাকে : স্নাতকোত্তর, ডক্টরেট, পোস্ট-ডক।

এই হলো মোটের ওপর আমাদের দেশের প্রথাগত শিক্ষার মূল ধারা। এর বাইরে—কিন্তু খুব দূরে নয়—আছে বৃত্তিশিক্ষার জগৎ : মাধ্যমিকের পরেই কোনো পলিটেকনিক শিক্ষালয়ে ঢুকে পড়া।

আসলে সব উচ্চশিক্ষাই কিন্তু এক অর্থে বৃত্তিশিক্ষা। পাশ করে ভালো চাকরি জোটানোই তার শেষ লক্ষ্য। শেখাটা কোনো স্বয়ম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়, তার উপায় মাত্র। পলিটেকনিক বা কৃষি বা পশুচিকিৎসা নিয়ে পড়লে সেটা আরও আগের ধাপ থেকেই শুরু হয়ে যায়—এই যা।

সব ধারার সব স্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আরও কিছু জিনিস। সহজাত মেধাই যথেষ্ট নয়, চাই আরও কিছু সুযোগ, আর্থিক সঙ্গতি, সঠিক পথনির্দেশ (= কার কোন্ বিষয় সইবে ঠিক সময়ে সেটি ধরিয়ে দেওয়া)। আমাদের মতো দেশে টাকার অভাবেই বহু ছেলে-মেয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় না। আর সামর্থ্য থাকলেও, উপযুক্ত সুবিধের অভাবেও সকলের মনের ইচ্ছে মেটে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, উচ্চ-মাধ্যমিক সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অনেক বিষয় পড়ানোর নিয়ম আছে—ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ভাষা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু আঙুলে গোনা ইস্কুল-কলেজ ছাড়া আর কোথাওই সেসব পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে না।

শুধু মেধাটুকু সম্বল করে এখন আর বেশি দূর পৌঁছোনোও যায় না। একজন মেঘনাদ সাহা তাঁর অদম্য মনোবল নিয়ে যা পেরেছিলেন, সমান মেধা থাকলেও তাঁর মতো অবস্থায় অন্য কোনো ছেলে বা মেয়ে তা না-ও পারতে পারে। দমবন্ধ প্রতিযোগিতার চাপ সকলের সয়ও না।

এমন অনেক ব্যাপারেই প্রথাগত শিক্ষা খুবই অসহায়। তার প্রত্যেক স্তরেই একটা মান ঠিক করতে হয়। জীবন-জীবিকার প্রয়োজন অনুযায়ী তা বাড়ে-কমে। পঞ্চাশ বছর আগে ক্লাশ এইট-এর ছাত্রছাত্রীদের যতটুকু শিখতে হতো, এখন তার চেয়ে

অনেক বেশি শিখতে হয় (একমাত্র ইংরেজি ছাড়া)। জানাই আছে, সবাই সে-মানে পৌঁছোতে পারবে না। কেউ কেউ আবার অনায়াসে তাকে ছাড়িয়ে যাবে—মেধার জোরে বা বাড়তি সুবিধের সুবাদে (= বাড়িতে ভালো করে পড়ানোর সুযোগ, দেখিয়ে দেওয়ার মতো লোক থাকা, ইত্যাদি)।

প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা যেটুকু দিতে পারে তাও অবশ্য সব জায়গায় পুরোপুরি পাওয়া যায় না। যথেষ্ট ইশ্‌কুল-কলেজ নেই, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই (কারণ মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই সরকারের)—এসব সমস্যা তো আছেই। এ ছাড়াও আছে আর এক সমস্যা। যতটা কড়াক্কড়ির মধ্যে রাখলে কিছু শেখাও যায়, পরীক্ষাতেও ভালো ফল করা যায় ততটা কড়াক্কড়ি বেশির ভাগ জায়গাতেই থাকে না। সবই কেমন আল্‌গা-আল্‌গা। ফলে পরীক্ষায় ভালো করতে গেলে যেসব ফন্দি-ফিকির জানা দরকার, তাও শেখানো হয় না। গ্রাম ও শহরের ফারাক এ বাবদে দুস্তর।

এ সবই খুব দুঃখের ব্যাপার। সরকার মাঝে-মধ্যেই এ নিয়ে উদ্বেগ জানায়, কমিশন-টমিশন বসায়। বিধানসভা-লোকসভায় শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বিস্তর গলাবাজি হয়। বিরোধী পক্ষের বিধায়ক-সাংসদরা আরও খরচা করার দাবি জানান (যদিও নিজেরা শাসকদল হয়ে সেসব বেমালুম ভুলে যান!) ক্লান্তিকর, করুণ এই প্রহসন স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে।

রাজা আসে যায়　　　রাজা বদলায়
নীল জামা গায়　　　লাল জামা গায়
এই রাজা আসে　　　ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের　　　রং বদলায় . . .
　　　　　　　　　দিন বদলায় না!
. . .　　　　　　　. . .　. . .
রাজা আসে যায়　　　আসে আর যায়
শুধু পোশাকের　　　রং বদলায়
শুধু মুখোশের　　　ঢং বদলায় . . .

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ''রাজা আসে যায়'', *নির্বাচিত কবিতা*)

আসলে কী শাসক দল, কী বিরোধী পক্ষ, কী উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী, আর কী ছাপোষা অভিভাবক—প্রায় সকলেই দেখি একটা কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন : প্রথাগত শিক্ষা যদি ঠিকমতো চলে, আর বেশি টাকা ঢালা যায় (ইশ্‌কুল-কলেজ ও/বা প্রাইভেট টিউটর বাবদ), তাহলে ফি-বছর লাখে লাখে আদর্শবান, দায়িত্বশীল, পরহিতৈষী—আরও যেন কত ভালো ভালো কথা আছে?—ছেলে-মেয়ে তৈরি হবে। প্রথাগত শিক্ষার মধ্যেই কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে বলে সেইটে এখন হচ্ছে না। দেশের অবস্থা একটু ভালো হোক, নিয়মমতো পড়ালেখা চলুক—সব ঠিক হয়ে যাবে।

টাকা ঢাললেই যদি যা চাই তা পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা ছিল না। *দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা* ইত্যাদি কাগজে প্রতি মাসে গোটাকয়েক *কপালকুণ্ডলা, গোরা, পদ্মানদীর মাঝি* বেরত। তেমনি প্রথাগত শিক্ষায় আরও টাকা খাটালেই মানুষ তৈরি হবে—এও এক মায়াময় ধারণা। দেশ-বিদেশের কোথাও এমন হতে দেখা যায়নি। ইউরোপ-আমেরিকায় সকলে সাধারণ শিক্ষা পান। তার পরে তো সেসব জায়গা মহামানবে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সমাজসচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক, সংস্কারমুক্ত লোকের সঙ্গে পথে-ঘাটে ধাক্কা লাগত। তেমন খবর তো পাই না। বরং চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতার কথাই শুনি। সমাজবিরোধী কাজকর্মের কথা না-হয় ছেড়েই দিলুম।

প্রাক্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সত্যিকারের গর্বের জিনিস। ঘোর কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও তা দেখে মুগ্ধ হতেন। 1956-র পর থেকে সে দেশের অনেক কিছু বদলেছে, কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় কোনো ছেদ পড়েনি। অঙ্কে, বিজ্ঞানের নানা শাখায়, কারিগরিবিদ্যায় তার সাফল্য ছিল চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু সমাজজীবনে তার সুফল কতটুকু ফলল? রঙিন ভোগবাদের হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার জন্যেই যেন মুখিয়ে ছিল সেখানকার নতুন যুবসমাজ।

এইসব ঘটনা থেকে দেখা যায় : 'শিক্ষা' ব্যাপারটাকেই ভুল বোঝা হচ্ছে আগাপাশতলা। প্রথাগত শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। তা হলো : বিশেষ কোনো বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো। তার দৌলতেই কেউ হবে ডাক্তার, কেউ প্রশাসক, কেউ শিক্ষক, কেউ বা কেরানি। এই ধরণের পেশার বাইরেও সমাজে আরও অনেক পেশা ছিল ও আছে। একেবারে নিরক্ষর হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সেই পেশাতেও অন্য ধরণের শিক্ষা লাগে—কলমের শিক্ষা নয়, হাতের শিক্ষা। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের তুচ্ছ করার কোনো বাস্তব কারণ নেই। সেখানেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত-র ভেদ আছে! আনাড়ি আর দক্ষ-র তফাত কামার-কুমোর-ছুতোর থেকে লেদ মেশিন-এর কর্মীর মধ্যেও থাকে।

আসলে মানুষকে শিক্ষা দেয় গোটা সমাজ-সংসার, শুধু ইশ্‌কুল-কলেজ নয়। সহবৎ, ভদ্র আচার-আচরণ—ছেলেমেয়েরা এগুলো শেখে পরিবারের ভেতরেই। তেমনি, ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিতের বোধও আসে প্রত্যেকের অণুপরিবেশ থেকে। তারও ওপরে আছে সমাজ ও রাষ্ট্র, দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ধাঁচ। এই সবকিছুই মানুষকে কিছু-না কিছু শিখিয়ে চলেছে: কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, আপনি বাঁচলে বাপের নাম-এর 'দর্শন'। এইসব কুশিক্ষার মিলিত শক্তি প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে বহু-বহু গুণ বেশি। এইখানেই প্রথাগত শিক্ষার সবচেয়ে বড় অসহায়তা।

বই-এ সবাই পড়ে : জাতিভেদ খুব খারাপ। কিন্তু চারধারে

সবাই দেখে : জাতিবিচার চলছে। বেশির ভাগ লোকেই তাই দু-রকমের সত্যে বিশ্বাস করতে শেখে : একটা বই-এ পড়া, পরীক্ষা পাশের সত্য; অন্যটা ব্যবহারিক জীবনে মেনে চলার সত্য। দুটো মেলে না, কারণ মেলানো যায় না। তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগের ক্ষমতা বেশি, তাই দ্বিতীয় ধরণের সত্যটাই বহাল তবিয়তে বজায় থাকে।

খুব ভালো সার্জেন, তবু যন্ত্র ধরার আগে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন; বিরাট পদার্থবিদ্, তবু পুজো না-করে জল খান না —এসব ঘটে এই কারণেই। আমাদের মতো যুক্তিবাদীদের কাছে ব্যাপারগুলো স্ববিরোধী ঠেকে। কিন্তু ওঁরা তো দু-ধরণের সত্যে বিশ্বাসী। সমাজ-সংসারও তাতে খুশি হয়। দু-জগতেই—শিক্ষিত মহলে ও সামাজিক জীবনে—আলাদা করে সম্মান পাওয়া যায়। সাপও মরে *না*, লাঠিও ভাঙে না!

সবকিছু থেকে আলাদা করে দেখলেও, প্রথাগত শিক্ষা শেষ অবধি কী দিতে পারে? বিশেষ কোনো বিষয় ভালো করে শেখানোই তার কাজ। তার সঙ্গে সে পারে কিছু বাধ্য, বশংবদ ভোটার তৈরি করতে। সেই শিক্ষা পেয়েও কেউ যদি ঠগ, জোচ্চোর, ধান্দাবাজ না হন—সেটা পরিবেশ-পরিজনের গুণে, একেবারেই ব্যক্তিগত চেষ্টায়। প্রথাগত শিক্ষার তরফে তার সব কৃতিত্ব দাবি করা যাবে না। অন্যদিকে, কামচোট্টা কেরানি, ঘুষখোর ইন্‌জিনিয়ার, চশমখোর ডাক্তার বা কোচিংবাজ অধ্যাপক—এদের দেখে সরল লোকজন ভারি অবাক হন। বলেন : 'শিক্ষিত লোকের এ কী ব্যাভার (= ব্যবহার)!' এর জন্যেও প্রথাগত শিক্ষাকে দুষে লাভ নেই। তা কখনোই কাউকে দুর্নীতি করতে বলেনি। এটাও হয় পরিজন-পরিবেশের গুণে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নিশ্চয়ই সে-পরিবেশের অংশ। কিন্তু বাকি সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠার ক্ষমতা তার নেই।

প্রথাগত শিক্ষাকে বাতিল করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সব সমাজেই তা ছিল, আছে, থাকবে। সকলকেই তার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তার থেকে যা শেখার তা-ও শিখতে হবে। রুটি-রুজির ব্যবস্থাও হবে তা-ই ভাঙিয়ে। কিন্তু এই সীমিত উদ্দেশ্যের বেশি কিছুই তাকে দিয়ে করানো যাবে না। এই সহজ সত্যটা ভুলে যাওয়া হয় প্রায়ই। তারই ফলে লোকের মনে একটা উদ্ভট সমীকরণ—বা বলা ভালো, অভেদ—শেকড় গেড়েছে : শিক্ষা মানেই প্রথাগত শিক্ষা। বাবা-মা মনে করেন : ছেলে-মেয়েকে ইশ্‌কুলে ভর্তি করালেই সব দায়িত্ব শেষ। চাল-চলন, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই সেখান থেকে রপ্ত হয়ে যাবে। সেগুলোই একমাত্র কাজে দেবে। ওপরে ভগবান আর নিচে হেডমাস্টার বা মিস্ট্রেস—এঁরা দুজনে মিলে সবাইকে আদর্শ মানুষ করে ছেড়ে দেবেন।

এর থেকে আসে দুনিয়ার নাকউঁচু-ভাব : নিরক্ষর বা অল্প লেখাপড়া-জানা লোক মানেই যেন অশিক্ষিত, যাঁর কোনো ছাপ (=ডিগ্রি) নেই তিনি মুর্খ টাকাই শিক্ষার চিচিং ফাঁক, আর প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন সুবিধে করতে না-পারলে, সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার একমাত্র বিকল্প : বড়লোক হওয়া!

এইসব ধারণা কাটানোর জন্যেই চাই প্রথাবিরোধী শিক্ষা। বারান্তরে তার কথা বলা যাবে।

শেষের শুরু

গার্গী সরকার

রাতের সীমা পেরিয়ে যখন
ঘুম ধরেছে অলস চোখে,
হামলাকারি ঠিক তখনই
অস্ত্র শানায় মুখোশ এঁটে,
পড়ছে মার খাচ্ছে লাথি
শিক্ষার্থী আছে যত
বুদ্ধিমান বেবাক আজ
বুদ্ধিহীনে পরিণত?
রাগের আগুন জ্বলুক তবে
পুড়ুক শহর রাস্তা মাঠ
রাগের কথা হয়তো সোজা
বুলেট হওয়া সহজ নয় . . .

নান্দনিকতা অনেক হলো,
পলক ভিজে ছলো ছলো
রাষ্ট্র যত শক্তি ফলায়
রক্ত বয় দ্বিগুণ জোরে
ভয় তখন তোমার বুকেই
নিভৃতিতে থানা গাড়ে
আসল কথা ভয় পেয়েছ
মারছ তাই ছোট্ট কথায়
হিসেব থাকুক তোলা সবই
অস্থি পাঁজর রক্ত ভরে
সময়নেই ওদের পাশে
মানুষ আছে ওদের সাথে।

সন্ধি হোক বয়ঃসন্ধিতে

ডাঃ বাণী দেব

সেদিন অয়ন এসেছিল। শুনে খুশি হ'লাম ও ডাক্তারিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছে আর উচ্চ-মাধ্যমিকেও ভাল ফল করেছে। অথচ এই অয়ন দু-বছর আগে মাধ্যমিকে আশানুরূপ ফল করতে না পারায় বাবা-মার তিরস্কার ও আত্মীয়-স্বজনের সমালোচনায় মনমরা হয়ে থাকত। একদিন বাবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। সময় মতোন চিকিৎসা করে ও বেঁচে ওঠে।

অয়নকে আমি ওর জন্ম থেকে চিনি। ওর শরীর খারাপ হ'লেই ওর বাবা-মা আমার কাছে ছুটে আসত, চোখের সামনে ছোট্ট অয়ন থেকে বড়ো হয়ে ওঠা অয়নের এই পরিণতি খুবই দুঃখজনক। অয়ন একা না, এরকম অনেক অয়নই দিশেহারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে। তাদের দেহের ও মনের পরিবর্তনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক চাহিদাটা তাদের অজানা। তাদের শিশুসুলভ আচরণে লোকে বলে 'ন্যাকা' আর প্রাপ্তঃবয়স্ক আচরণে বলে 'পাকা'। এদের সামনে থাকে পড়ার চাপ, উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা গড়ার প্রস্তুতি। এই সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে আশা দেওয়া ও সঠিক পথ দেখানো প্রত্যেক বাবা-মার কর্তব্য।

এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যাগুলো নিয়ে একটু ভাবা যাক্। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই সময়ের মৃত্যুর প্রধান কারণ পথ দুর্ঘটনা। নিয়ম ভেঙ্গে জোরে সাইকেল বা মোটরবাইক চালানো আর তার সঙ্গে আছে কানে ফোন। বিপদ ডেকে আনাই এই বয়সের ধর্ম।

দ্বিতীয় মৃত্যুর কারণ ঃ আত্মহত্যা। এই সময় সবাই একটু আবেগপ্রবন হয়। পরীক্ষার ব্যর্থতা, বাড়িতে অশান্তি (হয়ত একটু বেশি শাসন), প্রেমে হতাশা এইসব আত্মহত্যার কারণ, একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, এরা মৃত্যুর কথা বলে বা আত্মহত্যার ভয় দেখাচ্ছে। এই মনোভাব লঘুভাবে না নিয়ে ঠিক সময়ে ঠিক পদক্ষেপ নিলে বহু প্রাণ অকালে ঝরে যায় না।

সবসময় মনমরা হয়ে থাকা, সবেতেই অনাগ্রহ, পড়াশুনায় মনঃসংযোগের অভাব, ক্ষিধে কম, ঘুম কম, অল্পে ক্লান্তি, হীনমন্যতা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। এগুলো 'ডিপ্রেসনের' লক্ষণ। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

যদি দেখেন আপনার শান্ত-বাধ্য সন্তানটি রাগি, অবাধ্য হয়ে উঠছে এবং ক্রমশঃ হিংস্র হয়ে উঠছে, অবশ্যই ডাক্তার দেখান। অনেক সময় বাড়িতে হিংস্র পরিবেশ বা পাড়ার হিংসাত্মক ঘটনা এদের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়া TV বা রাজনৈতিক হিংস্রতার প্রভাব তো আছেই।

খাওয়া নিয়ে সমস্যার কথায় আসি এবার। সবাই জানেন, শরীরের বৃদ্ধির জন্য এ সময় একটু বেশি পরিমানে ও পুষ্টিকর খাওয়া দরকার। অনেকে বিশেষ করে মেয়েরা মোটা হয়ে যাবার ভয়ে খুবই সল্প খায় বা খেয়ে গলায় হাত দিয়ে বমি করে। এ রোগের নাম Anorexia Nervosa বা Bulimia। ক্রমশঃ এরা রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যবস্থা না নিলে এরা মারাও যেতে পারে।

এছাড়া আছে বিভিন্ন নেশা। সিগারেট-মদ খেয়ে এরা ভাবে বেশ বড় হয়ে গেছে। কত যে ক্ষতি হয় শরীরের তার পরিমান এরা জেনেও বোঝে না। শুধু ওদেরই দোষ দিই না। বাবা-ছেলে এক সাথে বসে মদ-সিগারেট যাচ্ছে এ তো আধুনিকতার পরিচয়! বন্ধুদের বদসঙ্গে নানান্ ঔষধ খাওয়ার নেশাও জমে ওঠে। যত শীঘ্র এদের বিভিন্ন De-addiction Centre-এ ভর্তি করে চিকিৎসা করা যায় ততই মঙ্গল। আমার পরিচিত বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে আছে যারা নিজেরা সুস্থ হওয়ার পর অন্য বিপথগামী ছেলেমেয়েদের নেশা ত্যাগ করিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফেরাতে পেরেছে।

আলাদা করে মেয়েদের কিছু সমস্যা আছে। আজও অনেক বাড়িতে ছেলে-মেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে বড়ো হয়। ছোট থেকেই ছোট্ট মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে—শিক্ষার আলো দেখে না। বিশেষ করে গ্রামে 'বাল্যবিবাহ' আজও চলছে। কমবয়সী মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের মনের সংযোগ থাকলে, সন্তান বিপথে যায় না। যথেষ্ট সময় দিয়ে ওদের বুঝতে হবে। এই বয়সে বন্ধুদের প্রভাব খুব বেশি। কিন্তু সন্তান যেন অনুভব করে বাবা-মা তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

প্রায়ই শুনি — "Generation Gap"। আমার মতে এটা একটা মনগড়া কথা। তাই যদি হবে তাহ'লে দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে নাতি-নাতনির মধুর সম্পর্ক হয় কি করে? আজকাল যৌথ পরিবার নেই বললেই চলে। বাবা-মা দুজনেই চাকুরিজীবি, সন্তানের একাকীত্ব আটকায় কে? বন্ধুরাই সহায়। আপনিও বাড়ীতে একটা বন্ধুত্বের আবহাওয়া করতে পারেন। TV বন্ধ রেখে, রাতে সবাই মিলে সারাদিনের গল্প-গুজব করে একসঙ্গে বসে খেলে ভালোই সময় কাটে। ছুটির দিনে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কাটান। ওদের বন্ধুদের সঙ্গেও মিশবেন। মিশলে বুঝবেন ওরা কোন পথে চলছে, সাবধানতার দরকার আছে কিনা। কোনও ছুটির দিনে বাড়ির

সবাই মিলে গানের অনুষ্ঠান বা সিনেমা-থিয়েটার দেখুন। বছরে একবার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে এলে মনটা সজীব হয়ে উঠবে।

বাড়ির ছোটোখাটো ব্যাপারে এমনকি বড়ো সমস্যাতেও সন্তানের মত নিন। অনেক সময় দেখবেন, ওদের নিজস্ব মতামত যথেষ্ট পরিণত। ওদের স্বাধীনভাবে ভাবতে দিন। পড়া ছাড়াও অনেক কিছু নিয়ে আমাদের জীবন।

ভালো কাজে ওদের উৎসাহ দিন ও প্রশংসা করুন। অন্যায় করলে শাসন করুন। তবে শাসনটা একটু আলাদা করে একলা ঘরে করলেই বেশি গুরুত্ব পায়। ওদের আত্মসম্মানবোধ একটু বেশি। অযথা সমালোচনা থেকে দূরে থাকুন। শাসনের মধ্যে যেন যুক্তি থাকে। তবেই ওরা মানবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পাঠ্য পুস্তকের বাইরে 'মানুষ' হয়ে ওঠার শিক্ষা প্রয়োজন। বাড়ির প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর সঙ্গে সহযোগিতা, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, স্বাস্থ্যসচেনতা, পরিবেশ-সচেনতা, শিশুপালনের টুকিটাকি এবং Sex-education শেখার এটাই সময়।

অয়নের কথা বলতে গিয়ে কোথায় চলে এলাম। অয়নের দুঃসময়ে ওর বাবা-মা পাশে এসেছেন। চাকুরিজীবি বাবা-মা সময় বার করে নিয়মিত ওর সঙ্গে ওরই বিষয়গুলো পড়েছে। আলোচনা করেছে, প্রশ্ন-উত্তর লিখিয়েছে। তাইতো অয়ন তার হতাশা কাটিয়ে আজ ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে।

সন্তানকে 'মানুষ' করতেই হবে। অযথা প্রশ্রয় না দিয়ে হয়ে উঠুন নিশ্চিত আশ্রয়। আগামী জীবনের বন্ধুর পথে বন্ধু হয়ে পাশে থাকুন — আলো দেখান।

অলংকৃতা দত্ত, বয়স : ১৬

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র

কেশব ভট্টাচার্য

সাতাশ বছর কেটে গেল অধ্যাপক হিসাবে। সময়টা খুব কম নয়—এই সাতাশ বছরে দেশের এবং রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুবিধ পরিবর্তন হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই সময়কালে কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে। প্রায়ই মনে হতো সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যদি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাই শ্যামল নন্দী (বোলারদা) যখন তাঁদের ম্যাগাজিন 'সাঁকো'-য় কিছু লেখার কথা বললেন, দ্বিতীয়বার ভাবিনি। আরেকটি কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার—যদি এই লেখা পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে তার জন্য অগ্রিম দুঃখপ্রকাশ করছি। বিষয়টা এমন-ই যে, লেখাটা যথেষ্ট বড়ো হতে পারতো, কিন্তু সময়াভাব, শারীরিক সমস্যা ও কাজের চাপে নিরুপায়।

শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোঠারি কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল—"to strengthen social unity and to provide equality of opportunity to the less advanced sections of the society, the unhealthy social segregation that now takes place between the schools for rich and those for the poor should be ended and the primary schools should be made the common schools of the nation by making it obligatory on all children, irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition or social status, to attend the primary schools in their neighbourhood. This sharing of life among the children of all social strata strengthen the sense of being one nation, which is an essential ingredient of good education."

অথচ বাস্তবে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ মেনে কমন স্কুল চালু হওয়ার পরিবর্তে যতদিন গেছে Montessori, Kindergarten, Play House প্রভৃতি নামে বিভিন্ন ধরনের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথা সংবিধানে উল্লেখিত হলেও তা বাস্তবায়িত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি দীর্ঘদিন। অবশেষে ২০০২ সালে ৮৬ তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ২১-ক ধারা সংযোজিত হলেও Right of the Children to free and compulsory education act, গৃহীত হয়েছে ২০০৯ সালে। ওই আইনে ৬-১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশু কিশোরের অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, অথচ খুবই অল্পসংখ্যক শিশু, কিশোর এখন পর্যন্ত এই আইনের সুফল পেয়েছে। দুঃখের বিষয় এই আইন যথাযথ লাগু করার উদ্যোগ কেন্দ্র বা রাজ্য কোন স্তরেই গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ শুরু থেকেই দেশের এক বৃহৎ অংশের মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং যে কিয়দংশ, এই সুযোগ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই সমস্যাটি সম্পর্কে উদাসীন।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৬৭ বছর অতিক্রান্ত — এতদসত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই নানা ধরনের দীর্ঘসূত্রিতা, সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ আমাদের দেশ স্বাক্ষরতার হার (৬৩%), ভর্তির হার (Gross enrollment ratio বা GER) ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো একটি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি পুরোপুরি লাগু না করে অন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। এরকমই একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ২০০৫ সালে। এই শিক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন শ্যাম পিত্রোদা এবং কমিশনটি পরিচিত ছিল জাতীয় জ্ঞান পরিষদ বা National Knowledge Commission নামে। এই কমিশনের সবচেয়ে বিতর্কিত সুপারিশ হলো—উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানের তেরোটি নিয়ামক সংস্থাকে তুলে দিয়ে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বশক্তিমান জাতীয় সংস্থা—National Commission for Higher Education and Research (NCHER) গঠন করা। বলা হয়েছিল এই সংস্থাটি হবে স্বশাসিত চরিত্রের এবং দেশের উচ্চশিক্ষার সমগ্র বিষয়টি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। একটি মাত্র কমিটির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে দেশের উচ্চশিক্ষার হাল কি হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

উপরের সুপারিশটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও জাতীয় জ্ঞান পরিষদ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল। সেই দুটি সুপারিশ হলো ঃ

(১) শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ স্বশাসন প্রদান।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

আমাদের রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে সত্তরের দশক অত্যন্ত কলঙ্কজনক এক অধ্যায়। গণটোকাটুকির ওই রাজত্বে,

ক্যাম্পাসে উপাচার্য খুন, স্কুল-কলেজে ক্লাশ না হওয়া, সময়মত পরীক্ষা না হওয়া, পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশে বিলম্ব, প্রকাশিত ফলাফল বহুক্ষেত্রে ভুল—এসবই ঘটেছে। চূড়ান্ত হতাশাজনক এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর। শিক্ষাক্ষেত্রে পঠন-পাঠন-গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা বামফ্রন্ট সরকারের একটি উজ্জ্বল অবদান। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাও রাজ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বামফ্রন্ট সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 'অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক পরিচালন' ব্যবস্থা চালু করা। স্কুল পরিচালন সমিতি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অর্থাৎ জাতীয় জ্ঞান পরিষদ ২০০৫ সালে যে সুপারিশ করেছিল উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে, আমাদের রাজ্যে তা চালু হয়েছিল অনেক আগে আশির দশকের গোড়ায়।

পরিতাপের বিষয় হলো এই যে ২০১১ সালে এই রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকার এসে প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার আইনগুলির পরিবর্তন। পরিবর্তন এমনভাবেই করা হলো যাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের, বেশ কিছু অংশীদারের (কর্মচারী, ছাত্র) যুক্ত থাকার সুযোগ রইল না। আজ পর্যন্ত এমনকি শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতি চলছে কোন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়াই। এরফলে রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত। নেই পঠন-পাঠন-গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ। সহবিদ্যালয়গুলির অবস্থাও অনুরূপ।

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থান বোঝা যাবে।

(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপককে তাঁর বসার ঘরে শারীরিক ভাবে হেনস্তা করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগামী কিছু ছাত্র। আক্রান্ত ওই অধ্যাপককে এমনকি লাথিও মারা হয়।

(২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার নামে মিথ্যা মামলা করা হয়।

(৩) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হন এক শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক পরীক্ষার তদারকি করার সময় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতার হাতে প্রহৃত হন।

(৪) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা প্রহৃত হয়েছেন এক আধিকারিক এবং কিছু শিক্ষাকর্মী।

(৫) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সমিতি ভেঙ্গে দিয়েছেন উপাচার্য।

(৬) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের নির্দেশে পুলিশ ছাত্রদের পিটিয়েছে।

(৭) ভাঙ্গড় কলেজে অধ্যাপিকাকে জগ ছুঁড়ে মেরেছেন 'তাজা নেতা' এবং Governing Body-র সভাপতি (!) আরাবুল ইসলাম।

(৮) রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে 'ছোটো ছোটো ছেলেদের' হাতে নিগৃহীত হয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ।

এই ধরনের ঘটনার আরো অজস্র উদাহরণ আছে। স্বল্প পরিসরে সেগুলি উল্লেখ করা গেল না। কিন্তু উপরের উদাহরণগুলি থেকে সম্যকভাবে বোঝা যায় গত ৪৪ মাসে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ কোথায় দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনাগুলি আমাদের সকলের জানা আছে। আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং লেখার শেষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এই আবেদন রাখব যে, যার পক্ষে যেটুকু সম্ভব সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রের এই অস্বাস্থ্যকর, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী পরিবেশ পরিবর্তনে উদ্যোগী হোন। অন্যথায় এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর জন্য আমাদের ক্ষমা করবে না।

মেঘা পাত্র, বয়স : ১১

রাজদ্বীপ ঘোষ, বয়স : ১২

ভ্রমণ ও সমাজ বিজ্ঞান

অন্নপূর্ণার অঙ্গনে

গৌতমাদিত্য ভট্টাচার্য্য

আমাদের যাত্রা হল শুরু

২৪শে অক্টোবর, কলকাতা ২০০৯

সন্ধ্যা ৮-১০ মিঃ শিয়ালদহ ষ্টেশনের ৯নং প্লাটফর্ম। নেতাজীনগর কলকাতার তড়িৎ মেমোরিয়াল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং এ্যাসোসিয়েশন ব্যানারের নীচে আমাদের পদযাত্রী সমাবেশ। যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি নড়ে উঠল যাত্রার উদ্দেশ্যে। আমার স্থান স্থির হয় কামরার ডান পাশের সারির আসনের উপরের থাকে। ঘুম হল না যাত্রার উত্তেজনায় কিছুটা, কিছুটা সংকীর্ণ স্থানের মাহাত্ম্যে।

নদীর সঙ্গে দেখা

২৫শে অক্টোবর, ২০০৯

সকাল ৮-১৫মিঃ নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে হাত মুখ ধুয়ে স্টেশনের বাইরে আসি। পরবর্তী যাত্রার জন্য বাস দাঁড়িয়ে। সামনের এক দোকানে টিফিন সেরে বাসের মধ্যে। বাস ছাড়লো প্রায় বেলা ১০ টায়। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে বাস ছুটে চলে সকালের ভীড়াক্রান্ত পথ মাঁড়িয়ে সামনে দূরে দৃশ্যমান হালকা কুয়াশায় জড়ানো গিরিকান্তারের পথে। খড়িবাড়ী, হাতি ঘিষা হয়ে একসময় আসে নকশালবাড়ী। ৬০/৭০ দশকের বিপ্লবের উৎস। আমার এই প্রথম আগ্রহ নিয়ে দেখি, বেশ বড়ো গঞ্জের মতো জায়গা। তারই এক প্রান্তে ভারত-নেপাল সীমান্তে ভারতের শেষ সীমানা পানি টাঙ্কী। সেখানে বাস টার্মিনালে আমাদের নামিয়ে দেয় বাস। কাছের সুলভ শৌচালয়ে স্নান সেরে মধ্যাহ্ন ভোজন কাছের হোটেলে। খাবার আগেই অবশ্য দেখা হয়ে গেছে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য নেপালের পোখরাগামী রিজার্ভ বাস। বাসের আকার বেশ ছোট, অনেকটা কলকাতার পরিচিত মিনি বাসের মতন। সংকীর্ণ আসন। যাত্রা বেশ সাবলীল হবে মনে হল না। বাস ছাড়ল ২-৪৫ মিঃ নাগাদ। একটু গিয়ে মেচি নদীর ওপর দিয়ে সেতু পেরিয়ে নেপালের গ্রাম-শহর কাঁকর ভিটা। সহস্র গাড়ি রিক্সা যাতায়াত করছে ঠিক আমাদের দেশের যেকোন গঞ্জের মতো। তাদের মধ্যে নেপাল স্থাপত্যের প্রতীক নেপালে প্রবেশ পথের তোরণ দ্বার এবং আশে পাশে কয়েকটা প্যাগোডার মতো চেহারার বাড়ি। আমাদের সঙ্গে থাকা ক্যামেরার বিস্তৃত বিবরণ সহ এক তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এর মধ্যে। তাতে ভারতীয় সীমা শুল্ক (customs) দপ্তরের মোহর লাগিয়ে আমরা ভারতের এলাকা পেরিয়ে নেপালে ঢুকলাম। সেখানে আবার একদফা তল্লাশ। কাছের একটি ছোট মাঠে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করে বাস এর জন্য সরকারী অনুমতি পত্র তৈরি করে বাস ছাড়লো বেলা ৩-৪৫মিঃ নাগাদ। এর মধ্যে স্থানীয় পর্যটন দফতরের এক কার্যালয় থেকে নেপালের পর্যটন সংক্রান্ত কিছু খবর নেওয়া গেল। এক ভ্রমণ সংস্থার কাছ থেকে যোগাড় হল মানস সরোবর যাত্রার কিছু তথ্য।

সারা বিকেল-সন্ধ্যা দফায় দফায় রাস্তায় বিপুল ট্রাফিক জ্যামের মধ্য দিয়ে বাস চললো। রাত দশটায় কাছাকাছি সময়ে এল কোশি নদীর উপর তৈরি চিতওয়ান বাঁধ। প্রায় রাত বারোটায় পথের পাশে এক বন্ধ বাজারের মধ্যে কোন মতে স্থান করে নিয়ে খোলা হল রাতের খাবারের প্যাকেট।

এলেম নতুন দেশে

২৬শে অক্টোবর, ২০০৯

সারারাত ঘুম আর ঝিমানোর মধ্যে মাখামাখি হয়ে, বারবার বাসের জানালার কাঁচে ধাক্কা খেতে খেতে একসময় দুঃখের 'তিমির রাত্রি' শেষ হলে সকাল। ৭টায় এক তে-মাথায় গাড়ি দাঁড়ালো যাত্রীদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে। সেখান থেকে নেপালের প্রখ্যাত দেবস্থান মনকামনা যাবার পথ গেছে বেঁকে। মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে কেবল কারের রাস্তা। সকালের আকাশ সজল কাল মেঘে ঢাকা।

প্রায় বেলা ১০-১৫ নাগাদ ১০ ঘণ্টার পথ ১৬ ঘণ্টায় পেরিয়ে বাস ঢুকলো পোখরায়। ভারতের যে কোন পাহাড়ী শহরের মতই খোলামেলা আলো বাতাসে পূর্ণ পরিবেশ। আসার পথে বারবার পথের বাঁকে চোখে পড়েছে দূরে কুয়াশা ঘেরা মচ্ছপুছারে পর্বতের শৃঙ্গ। পাশেই যেন অন্নপূর্ণার বিস্তৃত অঙ্গন। বারবার চেষ্টা করেও দেখি সঙ্গের সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরায় ধরা দিচ্ছে না তার মুখ।

শহরের নয়া বাজার এলাকার কৈলাশ হোটেলে ঘর নেওয়া হল। কাছের এক মাড়োয়ারী ভোজনালয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে ট্যুরিস্ট বিভাগের অনুমতি পত্র জোগাড় হল মাথাপিছু ২০০ টাকার বিনিময়ে। স্থানীয় দর্শনীয় স্থানের মধ্যে একমাত্র ''ফেওয়ালেক'' দেখা হল ট্যুরিষ্ট অফিসের কাছে বলেই হয়তো। কাজ সারতে প্রায় বেলা ৩টে। এর মধ্যে টাকা পয়সা জমা দেবার জন্য হোটেলে ফিরতে হবে। কাল পদযাত্রার শুরুর স্থান 'নয়াপুলে' যাবার বাসের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি। তাই ফেরা হোটেলে। কাজ সারতে সারতে সন্ধ্যা। তাই আজ আর কোথাও যাওয়া নয়।

পথে এবার নামো সাথী

২৭শে অক্টোবর, ২০০৯

সকালে টিফিন সেরে হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে রাস্তায় নামা। দুধারে পুরোনো চোখটানা স্থাপত্যের কিছু বাড়ি। ছবি নেওয়া হয় তারপর আবার পথচলা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর পোখরার একপ্রান্তে দেখা দিল বাসস্ট্যাণ্ড সেখান থেকে বেণীরুটের বাস ধরে নয়াপুল পৌঁছাতে বেলা ১১-৩০মিঃ প্রায়। সেখানে পথের পাশের দোকানে চা-কেক দিয়ে জলযোগ সেরে দোকানের পিছনের রাস্তা ধরে প্রায় ৫০০ ফুট নীচের নদী পর্যন্ত নেমে আসা। নদী পেরিয়ে রাস্তা উঠে গেছে। এক পা-দু-পা অন্তর রেস্টুরেন্ট, দোকান পাট, ডান দিকে পাহাড়ের ঢালে ঘর বাড়ি এবং জোড়ায় জোড়ায় গ্রামের মানুষের কৌতূহল চোখ প্রায় ২০/২৫ জন পদযাত্রীদের দেখতে। এক স্কুলের সামনে উদ্যোক্তা তড়িৎ মেমোরিয়ালের পক্ষ থেকে সামান্য ভাসনের পর যাত্রা শুরু হল। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ৪৫ মিনিট হাঁটার পর এল ধীরে থান্টি গ্রাম, সেখান থেকে ডান দিকের মোচি নদী ধরে রাস্তা উঠে গেছে। রোদের প্রবল জোর। প্রথম দিনের হাঁটা সব সময়েই কষ্টকর। তাই ধীরে পথ চলা। মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্ত হাল্কা আবার চলা। এখানে প্রায় ১৫/২০ মিনিট অন্তর রেষ্টুরেন্ট। পথে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদেশী শ্বেতাঙ্গ পদযাত্রীর দল হয় পিছন থেকে উঠে আসছে নয়তো সামনে থেকে নেমে আসছে। প্রত্যেকের সঙ্গেই স্থানীয় গাইড অত্যাধুনিক সাজ সরঞ্জাম, দু-হাতে ধাতু নির্মিত লাঠি ধরে তারা তরতর করে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ মূলত— ইউরোপ, আমেরিকার লোকই বেশি তবে সেই সঙ্গে জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্যটকের সংখ্যাও একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।

‘‘সেওলি বাজার’’ এল প্রায় ১২টায়। এরপর এক ছোট রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে, টবে সাজানো গাঁদা, গোলাপ ও কত নাম না জানা ফুলে ভরা খাদের পাশ দিয়ে খাড়া উঠে গেছে স্লেট পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি সিঁড়ি। দমফাটা চড়াই। পাশ দিয়ে দেখি এক পথ নেমে গেছে নদীর দিকে। সেপথে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ পরিবার নেমে গেল। এরপর সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে দেখি নীচে নদীর ধারে ধারে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। এক স্থানীয় মানুষের কাছে জানা গেল নদীর ধার ধরে ‘ঝিনু’ হয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা গেছে নীচে। আরো জানা যায় এই প্রাণান্তকর চড়াই পথ আমাদের পরের গন্তব্য সানডুক্ পর্যন্ত গেছে। আস্তে আস্তে উঠি। ‘ক্লিন’ আসে আরো পরে। সেখান থেকে পাহাড়ের উপরে অনেক উঁচুতে এক টিনের ছাদ দেখিয়ে দলপতি বলে ওই পর্যন্ত আমাদের আজকের গন্তব্য। আজ ঘ্রান্ডুপ যাওয়া হবে না।

সেই গন্তব্য পৌঁছতে বেলা ৩টে গড়িয়ে যায়। জামা, নীচের গেঞ্জি ঘামে ভিজে শপ্‌শপে। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমেল বাতাস দিগন্ত কাঁপিয়ে ছুটে এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাড়াতাড়ি জামা, গেঞ্জি পরিবর্তন করি। অন্ধকার দ্রুত নেমে আসছে। এদিকে শোনা গেল পিছনে থাকা দলের পাঁচ জন সদস্য এখনো এসে পৌঁছায়নি। সেই দলের একজনের হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় বাকি চারজনও আটকে পড়েছে। আমাদের উপস্থিত পদযাত্রীদের কয়েকজন নেমে যায় তাদের উদ্ধার করতে। সবাই ফিরতে ফিরতে সাড়ে ৬টা। তারপরে চিঁড়ে ভাজা, চানাচুর ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ সেরে দলের সবাই জমা হয় এক ঘরে। তারপর নিজেদের পরিচয় দেবার পালা যেহেতু দলের সবাই উদ্যোক্তা সংস্থার সদস্য নয়। সব সেরে রাত ৮-৩০ নাগাদ খাওয়া। এরপর শোওয়া ছোটো ঘরে ঠাসাঠাসি করে। তবে শরীর ক্লান্ত থাকার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা

২৮শে অক্টোবর, ২০০৯

আজকের গন্তব্য ‘ছোমরং’ এখান থেকে প্রায় ৬-৭ ঘণ্টার রাস্তা। বেরোতে বেরোতে সকাল ৮টা। প্রথমে আসে ‘‘ঘ্রাণ্ডুক’’। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। দারুন দারুন হোটেল, গরম জলের শাওয়ার, I.S.D.-র সুবিধে। সেখান থেকে বেরিয়ে খানিক নেমে আবার কোমরং ডান্ডার আঘাত অর্থাৎ চড়াইয়ের মাথায় আসতে বেলা ১-১০ প্রায়। এরপর পিছনের পদযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করতে বেশ খানিকটা দেরি। বেরোতে বেরোতে সেই বেলা ৪টা। ঠিক হল আজ ছোমরং না গিয়ে ‘‘কিম্‌রং খোলা’’ নদীর ধারের ওই নামেরই গ্রামে রাত্রি স্থাপন। নামতে প্রায় ১ ঘণ্টা। মাঝে এক ছোটো চায়ের দোকানে বসে ছাতু খেয়ে আবার নামা, নেমে নদীর ধারে অপেক্ষা ঘর ঠিক করার। ৫/৭ জন সে কাজে গেল আরো প্রায় ফুট ২০০ উঠে। প্রায় আধঘণ্টা পর জানা গেল ঘর পাওয়া গেছে অর্থাৎ এখানে যাত্রা বিরতি হচ্ছেই।

কত অজানারে জানাইলে তুমি

২৯শে অক্টোবর, ২০০৯

কাল রাতে ভালো ঘুম হল। হোটেলের মালিকের সঙ্গে কথা বলে ল্যাট্রিনে জল এবং একখানি লেপ জোগাড় করা গেল, রাতের খাবারের পরিবেশ ছিল রাজকীয়। উঠোনের চারদিকে বসত বাড়ি। মাঝখানে কাচে মোড়া ডিনার রুম। ছুরি কাঁটা চামচ। Self Service, জানলায় রেশমী পর্দা পায়ের নীচে কার্পেট সব মিলিয়ে এলাহী ব্যপার, খাবারের স্বাদ ভাল লাগলো। এ পথের এই একটা বৈশিষ্ট্য দেখছি। মাঝে মাঝেই

রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা যেখানে জল, দুধ, খাবার, ঘুমোবার লেপ সব পাওয়া যায়। সেজন্যই হয়তো আমাদের দেশে প্রবাদ শুনেছি একজোড়া হাওয়াই চটি এবং একটা দাঁত মাজার ব্রাশ ও টুথপেস্ট নিয়েই নেপাল যাওয়া যায়। তবে খরচের বহরটাও কম নয়।

যাত্রা শুরু হল সকাল ৭-৩০ নাগাদ। সামনেই প্রবল চড়াই। সরু পথ বনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসছে মালবাহী খচ্চর ও বিদেশী পর্যটকের স্রোত, প্রথম চড়াইয়ের মাথায় কিমরং খোলা গ্রামের শেষ হোটেল। তারপর আর জনবসতি নেই। পথ চলেছে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। প্রথম চড়াই ভাঙতে প্রায় ঘণ্টা খানেক তারপর আরো আধঘণ্টার পর প্রায় সকাল ৯টা নাগাদ পৌঁছলাম। এখানে চা, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি খেয়ে দশটার সময় ফের নামা। নামতে নামতে কিছু সমতল আর কিছু চড়াই পেরিয়ে শেষে এক বিশাল চড়াই ভেঙে ছোমরং। এখানে ছাতু খাওয়া। এখান থেকে যাব 'বাম্বু' সঠিক অর্থাৎ ছোমরং এর খুব সম্ভব উচ্চতম বিন্দু থেকে নামা শুরু। শুরু হতে হতে ১১.৩০ মিনিট। খানিকটা উঠে গ্রামের ভিতর দিয়ে কিছুটা সমতল তারপর চারদিকে বড়ো বড়ো হোটেল। বিদেশী পর্যটকে ভর্তি। গরম শাওয়ার এর সুবিধে 'উপলব্ধ' থাকার ঘোষণা করা হয়েছে। চারপাশের বিজ্ঞাপন থেকে এদিকে সিঁড়ি নেমে চলেছে তো নেমেই চলেছে। যতবারই খেয়াল করি, দেখি এক জায়গায় শেষ হচ্ছে। পরক্ষণে ওখানেই আবার সিঁড়ি। এক সময় দেখি হাঁটু থরথর করে কাঁপছে ক্লান্তিতে। ঠিক এক ঘণ্টা নামার পর রাস্তা শেষ হল। এক নদীর ধারে। খরস্রোতা নদীর উপর ঝোলানো পন্টুন ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে গেছে, সিঁড়ির মুখেই। কিছুটা যাবার পর কোন রকমে পা টেনে টেনে একপাক উঠেই একটা ছোট রেস্টুরেন্ট, সেখানে মিনিট ১৫ বসার পরেই আবার চড়াই শুরু। রাস্তা উঠেই চলেছে। মাঝে মাঝে কয়েক পা সমতল তো তারপর এক লম্বা চড়াই। এক সময় পথের বাঁকে দেখি এক রেস্টুরেন্ট। তখন বেলা ২-৩০ মিনিট সেখানে নেমে সিনুয়া ট্যুরিস্ট লজ। শোনা গেল এখান থেকেই সিনুয়ার শুরু। দেখে মনে একটু ভরসা এল। তবে আমরা যাব আরো উপরে। আবার চলতে শুরু করি। এক সময় পথের বাঁকে অনেকটা উপরে খাদের দিকে ঝুঁকে পড়া এক বাড়ি দেখা যায়। নিশ্চিতই হোটেল, শুনি ওটাই আমাদের আজকের গন্তব্য সিনুয়া। এরপর পথের চড়াই যেন আরো দীর্ঘ আরো ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। একসময় তা-ও ফুরোয়। বেলা প্রায় ৪টা তখন। এপথের বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর মনে হয় তার কারণ পথের এক পাশে খাদ অন্যপাশে পাহাড়ের গায়ের ঘন জঙ্গল, তুষার মন্ডিত শিখর যা পর্যটককে উৎসাহ যোগায় নিরন্তর, আরো পরে দেখা গিয়েছে।

যাই হোক, আমরা উঠে আসি সিনুয়ার হিল-টপ-লজ হোটেলে। টিনের সাইন বোর্ড থেকে জানা যায় সিনুয়া ২৩৫০ ফুট উঁচু। মাথা পিছু হোটেল খরচ নেপালী মুদ্রায় ৩৫০ টাকা। I.S.D.-র খরচ ১০০ নেপাল কারেন্সি (N.C.)।

চলো যাই চলো যাই চলো যাই

৩০শে অক্টোবর, ২০০৯

কাল বিকেলে যথারীতি পিছনের দল আসতে আসতে বেলা ৫-৩০ মি.। ততক্ষণে চারদিকে ঘন কুয়াশায় পথঘাট সব ঢাকা। আমাদের দুজন মালবাহক ও কয়েকজন সদস্য গেল উদ্ধার কাজে। টর্চ হাতে অবশেষে এক এক করে সবই ঢুকতে শুরু করল। ৮-০০টা নাগাদ রাতের খাওয়া। এরপর স্লিপিং ব্যাগের আকর্ষণ এড়ানো কি সম্ভব?

সকালে প্রাতরাশ সেরে পথে নামতে প্রায় ৭-৫০মি. পথ প্রথমে কিছুটা সমতল হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই চড়াই শুরু। আবার পরক্ষণেই নামা। পথেও সাপের মত সিঁড়ির প্রাচুর্য নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর, গাছের শিকড় বাকড় দিয়ে চিহ্নিত একটা পথ বেরা বোঝা যায়। উল্টো দিক থেকে যথারীতি বিদেশী পর্যাটকের স্রোত। পথ একসময় নদীতে নামলো। পেরিয়ে আবার ওঠানামা অবিরল। বোঝা গেল এ পথ শালগ্রাম শিলার মত যার ওঠাবসা সবই সমান।

এভাবে দমফাটা চড়াই ভাঙতে ভাঙতে একজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা। জঙ্গলে হয়তো কাজ করছিল। বেরিয়ে এল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে জানালো জায়গাটার নাম 'বাম্বু' এবং তা দশ মিনিটের দূরত্বে। সত্যিই একটু ঘুরতেই 'বাম্বু'র হোটেলের পরিচিত নীল রং চোখে পড়ে যায়। ঘড়িতে সময় দেখছে ১০-৩০মি.। চারদিকে পাহাড় ঘেরা কুয়োর মত জায়গা। দু-তিনটি পাশাপাশি হোটেল। দলের কর্তারা হোটেল মালিকের সঙ্গে কথা বলে এসে যা জানালো তা মোটেই আমাদের হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে খাপ খায় না। জানা গেল এখানকার তিব্বতী মালিকরা বাঙালি বা ভারতীয়দেরও পছন্দ করে না। তাই তাড়াতাড়ি চা-বিস্কুট খেয়ে আবার পথে। এবারের গন্তব্য 'দোভান' (Dovan)। সময় স্থানীয় হিসেব মতো ১-৩০ ঘণ্টা। পথ আরো একটু বৈচিত্র্য পূর্ণ। চড়াই উৎরাই আছে তবে আগেকার মতো অত দীর্ঘ নয়। এক জায়গায় নদী পেরোতে গিয়ে দেখি চওড়া পাথরের চাতালে বিদেশী যুবক যুবতীর অনর্গল রৌদ্র স্নান। স্থানের (বাম্বু) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার জঙ্গলে বাঁশের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো। নদী পেরোতে হল কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে। দোভান পৌঁছলাম বেলা ১২-১৫মিঃ নাগাদ। এখানেও তিব্বতী মালিক তাই আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে আবার পথে। কারণ মালকিন স্পষ্ট ভাষায় জানাল কিছু না খেলে বসে জিরোবার উপায় নেই।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ‘হিমালয়’। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগার কথা, হিমালয় যে আমাদের পরিচিত অর্থের ব্যাপ্তি ছেড়ে সংকীর্ণ পার্বত্য আশ্রয় স্থল রূপে চিহ্নিত হতে পারে তা ভেবে অবাকই হই।

এবার কিন্তু চড়াই আরো বড়ো বড়ো। বিদেশী পর্যটকের সংখ্যাও অনেক বেশি। সরু রাস্তায় মাঝে মাঝে পিছন থেকেও তারা আসছে। এখানেও এক ঝর্ণার নদী পেরোতে হল। এক জায়গায় নদীর উপরে দেখি সহস্রধারায় জল নামছে। কিন্তু সামনে গাছের জটলা থাকায় ছবি তোলা মুস্কিল। আরো কিছু এগিয়ে একটা চড়াইয়ের মাথায় একটা পুরানো কাঠের ঘর দেখে ভাবি ‘হিমালয়’ বোধ হয় এসে গেল। ওখানে গিয়ে দেখি ফুলমালা দিয়ে জায়গাটি সাজানো। দেবী অন্নপূর্ণার প্রতীক হয়তো। সেখান থেকে ঝর্ণার ছবি তুললাম। আরো একটু উঠে পথের বাঁকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরত্বে চোখে পড়ল হোটেলের পরিচিত দৃশ্য নীল করোগেটেড-টিনের চালা ৫ সাদা দেওয়াল। পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা ২-১৫ মিঃ। জায়গাটার চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঢাকা বলা যায়। একেবারে যেন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফিলছে। কোন তুষার শৃঙ্গ দেখা যায় না এককথায় কুয়োর মতো সংকীর্ণ। হোটেলের উঠোন ঘিরে ঘরের সারি। অনেক বিদেশী পর্যটক বসে। চেহারা দেখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ বলে মনে হয়। আমাদের কালকের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হল কিছুক্ষণ। স্থির হলো কাল বিকেলে আমরা M.B.C. অর্থাৎ মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্প যাব। প্রায় দু-ঘণ্টার রাস্তা, তাই সকাল ছ'টায় উঠতে হবে। পরদিন মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্প থেকে খুব সকালে বেরিয়ে ABC দেখে সোজা নীচের পথ ধরে ডোভানে রাত্রি যাপন।

বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও বাঁশরি

৩১শে অক্টোবর, ২০০৯

বেলা ৭-৪০ মিঃ এ হিমালয় ছাড়লাম। ঠিক হয়েছিল সকাল ৬টায় যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডায় সকাল ৬-টার আগে কাউকে বাইরেই দেখা গেল না। আজকের পথ আরো উঁচুতে উঠেছে ২৯০০ থেকে ৩৭০০ মিটার। অবশ্য পথও প্রায় ১৩ কিমি দীর্ঘ অর্থাৎ চড়াই উঠেছে হাল্কা হয়ে। এখানকার খবর মতো হিমালয় থেকে দেওরালী ২ ঘণ্টা এবং সেখান থেকে মচ্ছপুছারে বেস ক্যাম্প ২ ঘণ্টার পথ অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক মতে ৩ ঘণ্টা করে মোট ৬ ঘণ্টার পথ।

পথ প্রথমেই উঠেছে চড়চড় করে। ম্যাপে দেখাচ্ছে পথে হিমু কেভ নামে একটা গুহা পড়বে। গিয়ে দেখি বিরাট এক পাথর পথের উপর ঝুঁকে আছে। ভিতরে কম করে ১০০ জন মানুষ অনায়াসে এঁটে যায়। তবে পুরো গুহাটাই পরিত্যক্ত অবস্থায়। জায়গায় জায়গায় ভুষো কালির দাগ। মনে হয় কোন সময় কেউ রান্না করেছে। একটু পরে বেলা প্রায় ৯-১৫ মি: নাগাদ এল দেওরালি। ১.৩০ ঘণ্টা লাগলো। সেখানে একটু চা বিস্কুট খেয়ে ৯-৪৫ মিঃ নাগাদ আবার পথে। পথ উঠছে ক্রমাগত। বোল্ডারে ঢাকা মাঝে মাঝে সামান্য সমতল বা উৎরাই। একটা ঝর্ণা থেকে তৈরি নদী পেরোলাম। তারপর এক বিরাট উপত্যকা। এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়। প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর চড়াই এল। এর মুখে বাঁ-দিকে বিরাট এলাকা জুড়ে বরফের এক স্তূপ। চড়াই পেরিয়ে হঠাৎ ডান দিকে উঁচুতে উকি দিচ্ছে হোটেলের চালা। উঠে এলাম প্রায় বেলা ১-৩০টা নাগাদ। দু-তিনটে টিলার ওপর কয়েকটা হোটেল। বেশ কিছু রঙীন তাঁবুও চোখে পড়ে। এখানে প্রায় ৭০/৮০ জন শ্বেতাঙ্গ পর্যটকের জমায়েত। এখানে ঢোকার মুখে হোটেলের সামনের এক বোর্ডের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে এখান থেকে গ্লেসিয়ার ডোম ও গঙ্গাপূর্ণা শৃঙ্গ দেখা যায়। সত্যিই বাক্য হারা হয়ে যাবার মতো অবস্থা। প্রায় ঘাড়ের ওপর এত দূর থেকে অনুসরণ করে আসা মচ্ছপুছারে যা মাঝখানে দীর্ঘ সময় অদৃশ্য ছিল। উল্টো দিকে অন্নপূর্ণা সাউথ, হিউন চুলি, গঙ্গাপূর্ণা, গ্লেসিয়ার ডোম পাশাপাশি। হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। জায়গাটার চারপাশ মোষের পিঠের মতো কালো পাথরে ঢাকা থাকায় বেলা দুটোর পরেই রোদের তেজ চলে গিয়ে চারদিক আরো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমাদের অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা কখন সন্ধ্যা হবে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় লক্ষ্য করি সে উঠে এসেছে কখন চুপিসাড়ে, পূর্ণিমার চাঁদ। তার অলৌকিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর আর চন্দনের টিপের মতো সে ফুটে উঠেছে আকাশের কপালে। তাড়াতাড়ি ছবি তুলে খাওয়া দাওয়া সেরে স্লিপিং ব্যাগে আশ্রয় নেই। কাল ভোরে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প হয়ে ফেরা।

শুভ্র আসনে বিরাজো

১লা নভেম্বর, ২০০৯

তখনো রাত্রি আঁধার। চারদিকে অসীম নিস্তব্ধতা। কালের চক্র যেন থেমে গেছে। বাইরে প্রবল শীত। গরম স্লিপিং ব্যাগের মায়া ত্যাগ করে একে একে সবাই উঠে প্রস্তুত হতে থাকি। বাইরে, আমাদের ব্যারাকের মতো টানা আটচালার নীচের ছোট্ট সমতল মাঠে শ্বেতাঙ্গ পর্যটকদের মধ্যেও চাপা কথা শোনা যায়। বেরিয়ে এসে দেখা যায় নিকষ কালো অন্ধকারকে বিদ্ধ করে কখন যেন জ্বলে উঠেছে বেশ কয়েকটি আলোক বিন্দুর চলাচল—পাশে ছায়ামূর্তির সারি। আমরাও যোগ দিই ওই আলোর মিছিলে। পথ খুব অসমান। কোথাও যেন গড়িয়ে পড়ছে আবার কোথাও দূরে সরে যেতে চাইছে মিছিল থেকে। টলমল করতে করতে সবাই উঠতে থাকি। হাতের টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে পাশের শস্য খেতের মতো জমি দেখা

যায়—ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় লম্বা লম্বা ঘাসের বন। গড্ডলিকা প্রবাহের মতো আগের মানুষটির প্রায় পায়ের দাগ ধরে এগোতে থাকি। ক্রমে মাথার ওপরের আকাশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে চারপাশের পৃথিবী। ''আমরা পুনরায় পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত" হই। কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'র প্রথম কয়েক লাইন মনে পড়ে যায়—''আলো ক্রমে আসিতেছে, এ আকাশ মুক্তাফলের ন্যায় হিম, নীলাভ" ইত্যাদি। অবশেষে নিজেদের আবিষ্কার করি উঁচু-নীচু এক বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে। কিছুটা এগিয়ে যে-প্রান্তর আচমকা এক উঁচু জমির চেহারা নিয়েছে তারপরই ঘটতে শুরু করেছে এক আলৌকিক কাণ্ড। সামনের বিস্তীর্ণ আকাশ পটে ফুটে উঠেছে অন্নপূর্ণার ভূবনজোড়া রাজ্যপাট। একেবারে সামনে অন্নপূর্ণা-৩, বাঁপাশে পরপর মচ্ছপুছারে, হিউন চুলী, অন্নপূর্ণা-১, অন্নপূর্ণা-সাউথ। ডানদিকে অন্নপূর্ণা-৩ এর পাশে গঙ্গাপূর্ণ, গ্লেসিয়ার ডোম, অন্নপূর্ণা-৪, অন্নপূর্ণা-২ ইত্যাদি আরও নাম না জানা শৃঙ্গের সারি। চারদিকে ছবি তোলার অবিরাম শব্দ। আমরা সেই উঁচু জমি থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি এর পরের পথ কোথায় গেছে, বেশি দূর যাওয়া যায় না, একটু পরেই দেখি কালো গুঁড়ো পাথরের বিশাল বিশাল মোরেনের সারি গিরিশিরার মত নেমে গেছে সামনের এই গা-ছমছমে প্রকাণ্ড গ্লেসিয়ারের বুকে। ততক্ষণে নতুন সূর্যের আলো লেগেছে অন্নপূর্ণা ও তার অন্যান্য সঙ্গীর গায়ে। সঙ্গিনীর মাথায় যে সোনার মুকুট পরানো হয়েছিল তা বেলা বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে রজতকান্তি রূপে বিরাজমান। হাওয়া শুরু হয়েছে। ঘরে ফেরার হাওয়া। হাতের জলের বোতলের মধ্য থেকে চড় চড় করে আওয়াজ আসে। তাকিয়ে দেখি রাস্তায় খাওয়ার জন্য আনা প্লাসটিক বোতলের জল জমে ঘন হয়ে গেছে। মনের দিকে তাকিয়ে দেখি বহু দিনের অতৃপ্ত বাসনা পূরণের তৃপ্তিতে তা আজ পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

পথ চলার ঠিকানা

পথের আশ্রয়

পাহাড়তলীর দেশে

বেস ক্যাম্প থেকে অন্নপূর্ণা Annapurna from A-B.C.

A Mythical Letter from Roopkund

Manas Hira

After staying with her parents for the puja days, Parbati (Devi Durga, Nandadevi) was on her return journey to Kailash, accompanied by Lord Shiva. Just before they are to reach Kailash, Parbati wanted to check how She was looking (Parbati does not carry a mirror). She was thirsty too! Lord Shiva, the loving husband, then hit the ground with his trishul and thus Roopkund was formed amidst the snow-covered peaks of the Himalayas! Parbati drank water from the Kund and checked her “roop” (beauty) before entering her inlaw’s place. Today Roopkunda is a big green lake surrounded by high snow-covered mountains. There are hundreds of age-old frozen human bodies around the lake under the snow. But that is a seperater story!

When you boarded the bus at Rishikesh to travel almost 300 km to reach Lohajang, you were a bit relieved. The only bus from Rishikesh to Lohajang leaves at 5:30 am at dawn. Even at the bus depot at Rishikesh wherefrom the bus leaves, very few people knew about the bus and none could ascertain whether there existed any such bus service at all. The bus journey was special in the sense that along your road you could see the tributaries of the Ganges that you have read in your secondary school geography. The Alakananda, the Mandakini, the Pindar and where they have met one another—the Devprayag, the Rudraprayag, the Karnprayag. In the evening when you reach Lohajang, you meet your guide for the first time. For next seven days he would be your custodian.

From Lohajang, on the first day you trek to Didina vilalge-a village at the slop of a mountain. The village is strange! People do not stay there during winter. There is a twin village whose name is Kulin which is connected by car-orad. Every family of Didina village also has a piece of land at Kulin and before winter falls the family shift there. On the second day you start from Didina Village and for Baidini Bugiyal via Ali Bugiyal. The name Baidini comes from the Vedas. It is told that Baidini Bugiyal is the source of the Vedas!

You know that after a particular height in the mountains you do not find any trees. That is called the tree line! Above that tree line is a stretch of green medow! Ali bugiyal and Baidini bugiyal are such medows! Please note that during winter even Didina village gets buried under snow and so are all these bugiyals and all these mountains. From Didina village you go to the top of the mountain to reach Ali Bugial. Ali Bugial is the largest bugial in Asia. You will see that after the winter is over, it has become totally green and covered with flowers. Man (woman too) cannot grow such a garden. You start thinking for whom your God has created this! You have to cross a long long long stretch of Ali Bugiyal to reach Baidini Bugial. Since this is a bit off-the-normal trekking season (rain has started in mountains too) you get a forest hut to stay and avoid staying in the tents. You should wish to see the great peaks of religious importance, the Neelkantha, the Bandar Punchh, the Choukhamba, the Kedar Dom, the Trishul, the Nanda Ghunti, etc.

You may even love to spend a couple of days in the Forest Department hut at Baidini without going anywhere. Now and then you will come out of the hut to sit at the medow and watch the snow-covered peaks of the Himalayas! May be at a height of 12000ft from the sea level and the light air (low oxygen level) you may start believing the mythology of those places and peaks!

This vast area of the Himalayas belongs to Lord Shiva, the Debadideb, the god of all gods, apparently who looks like a beggar. All the places, rivers, peaks, in some way or other, relate to Him. Sitting outside the Forest Department hut you should get a clear view of the Neelkantha peak.

In the pursuit of the “Amrita” (the nectre of immortality), during the process of “Samudra Manthan” (churning the ocean) by the Gods and the Demons there came a series of most-

aspired assets, Amrita being the last one of them. But, most naturally, by this time, they became too greedy to stop the churning (might be they were always that greedy). And then, out of the sea being churned, came the Halahal, the most powerful poison one could ever imagine. (May be, it is always the rule that after Amrita, Halahal has to be there, the Devatas and the Asuras were just a few small cogs of the system implementing the rule). Anyway, owing to the Halahal, the existence of the whole creation was at stake. In the rescue came Mahadeva, who, otherwise does not pay much attention to these "worldly" things. He swallowed the poison and as an effect of the poison his throat became blue. Debadideb became Neelkantha.

At the feet of the Neelkantha mountain you have the holy place of Badrinath wherefrom the river of Alokananda originates. On a clear day, to the left of the Neelkantha peak you will see the Kedar Dome peak, at the bottom of the mountain at a height of 1400ft you have Kedarnath (where in June, 2013, the business of religion received a great shock and tens of thousands of people died). From the Kedar dome flows the river Mandakini (the river who was instrumental in devastating Kedarnath last year). You identify how all these names take obscure shapes in your mind as if which do not belong to this world.

To the right of you, much closer compared to Kedar Dom and all, you will see white and bright peaks of the Trishul and the Nandaghunti! Nandadevi is another name of Parbati (Durga). You force your eyes down to your level and you will see a small talao (lake) which is Baidini kund! Again Baidini is noone else but Parbati! You will see two small temples of not more than your height near the kund! You indeed do not expect that here temples will be big structures of architectural referende! People just stack stones of required sizes to give it a shape of their fancy!

Night comes pretty late at Baidini bugial! Even at 8 pm you may find that it is not yet dark! You have your dinner and your guide, your cook and even your ghorewala will tell you stories. Every 4 years in the Garwal region a goat is born with 4 horns to accompany Nanda Devi in a huge procession that starts near Karna Prayag (where the Pindar meets the Alakananda) More than a lakh of people join the procession to carry Nanda Devi in a choturdola to hemkunda! (Hemkunda is at a two day walk from Roopkund!) The goat goes side by side with the Devi. After it reaches Hemkunda, the goat leaves and nobody knows where it goes! It is believed that it goes to Kailash!

From Baidini, when you start walking higher, you wont find trees or meadows. There starts the land of rocks and stones. At times the view is softened where snow has covered the stones. Huge collections of scattered rocks through which you have to pass is what remains of the landslides that took place at the surrounding mountains hundreds or thousands of years back. Possibly the mountains too have toned down through those years because now if you look higher up at them, they look smooth - not much trace of such stones there. You cannot be blamed, if a sudden faith occupies you, after all these are the rocks which rained from the sky to punish king Jasdhawal who disgraced the sanctity of this Debbhumi. By these couple of days the name "Uttarakhand" by which this region has been identified in the political map of India has been eroded by the name it is refered to by everyone - the Debbhumi, the land of the Gods!

You will find that the story of Debbhumi is actually an epic depicting interrelated stories of Gods and the mythological characters. You will find Aryan Gods and Godesses mixing up with the Dravidian and the local ones. And sharing the stage with them in the same time and space are the characters from the Ramayan and the Mahabharata too! History has seamlessly been integrated with mythoogies and holy scripts!

Before you reach Patar Nachunia, the least you expected was the presence of a small tea-shop there! Since you had started walking a couple of days back this is the first time you find a roadside shop. Patar Nachunia is at the middle of the 8 km walk from Baidini Bugiyal to Bagua Basa. This is the place where the hills swalloed alive the courtesans accompanying king Jasdhawal in his pilgrimage to Hemkund.

The king had been very happy; he was going to be a proud father in a few days. In a procession of thousands he was taking the carrying queen to Hemkund to celebrate the event. It was to be a great celebration. The courtesans of the royal court were also being taken for that. When the procession reaches celebration. The courtesans of the royal court were also being taken for that. When the procession reaches celebration. The courtesans of the royal court were also being taken for that. When the procession reaches Baidini, the local pujari people requested him not to take the courtesans (patar nachuni, public dancer) in the procession to Hemkund since that is not in the tune of these places. As expected, the king did not listen to them!

At Patar Nachunia (what was the name of this place then?) the courtesans danced for the whole night and just before dawn, all on a sudden, they sank deep into the hills. People looked into the fresh holes in which they vanished, but nothing could be seen. Those holes are still visible at Patar Nachunia. To test how deep the holes are, people used to drop pebles in those holes, but they did not hear them hitting the ground, as if there is no end to those holes!

After a 4 km uphill walk to Patar Nachunia the lemon tea offered in the teashop of not more than Rs. 2000/- capital is the best you had till date. You are now in a shape to think why such a shop is there at such an odd place. Didina, the last village in your trail toward Roopkund is 16 km from here. Same is with other villages in other trails. After the winter is over snow starts melting in the bugiyals and fast they gets covered by thick (nameless) weeds. People starts coming back from their winter refuge to their original villages to start farming. And their bakris, bherro, bhayes and ghorre become restless to go to the bugiyals for their yearly rendezvous. Their owners need not keep constant vigil on them. They are left on their own in the bugiyals and their owners remain busy in the vilages. But the carrying animals are the exceptions. They too do not stay back in the villages but come to the Bugiyals like the rest, and their owners too stay with them! The newborn cannot survive the low temperature at the Bugiyal and after the delivery it is taken to the warmth of the village. While the newborn is being carried by the owner, the new mother, sacrificing the call of Bugial, also pursues them in her intense affection for the child!

Coming back to the small tea-shop at Patar Nachuhia, the question that who are its prospective customers is still unanswered! The myth of innumerable herbs of debatma Himalaya having magical power have attracted the attention of the ever-uncontented civilized people for curing their unhappiness! One such herb is the “kira-jori” whose price is quite a few lacs of rupees per kilogram in the international market! Since farming in the villages is less attractive, after the winter is over, hundreds of people spread to the corners of this region in search of “kira-jori”.

Under the traditional freindliness among the garwali people, these days, there is possibly a fierce competition with respect to this “kira jori”. You will find single individuals in gumboot and raincoat carrying a long umbrella appearing from nowhere. They are the “kira jori” people. Finding “kira jori” is quite painful. It is very small, difficult to identify by naked eye. One has to lie down on the ground, grope the herbs by both the hands, take it close to your eyes for identification. In general, everyone in this region while making a move, has grown the habit of deviating from the common trail whenever possible, and search for the “kira jori”. It is a new “gold rush” in Debbhumi.

In the plains, these days, it hardly makes any difference whether the distance you are covering is 1 km or 1.5 k. When you come to walk on a trail like this, even a metre becomes important for you-as if a matter of life and death! Each step becomes increasingly difficult for you. But once you accept this in your heart (you should accept, after all this has been by your own choice) you get intrigued by too many independent lines of experience.

“Bagua Basa” is another 4 km from “Patar Nachunia”. Out of that 2 km is uphill. As you know the king Jasdhawal did not stop his procession even after his courtesans were swallowed alive by the hills! Ignoring the

appeals from the local people he continued his procession and the queen gave birth to a son at “Rani Surela”, 3 km from “Patar Nachunia”. That night giant rocks were showered upon them from the sky and the queen and the new born baby with many others were killed. Today when you see those raw rocks scattered over a huge area upon both sides of the trail, you get dumbfounded by the signs of a massive landslide that took place perhaps hundreds of years ago and still survives in the form of myths among the local people.

“Bagua Basa” is not very far from “Rani Surela” and since you have already covered the uphill part of today’s walk, you may afford to indulge in fancy!

These days the Trekking companies have made things streamlined for thousands of trekkers bumping upon one another in this regions during the high seasons. At other times you will be left to your self (not yourself) to drag your fatigued feet along the rocky trail. The stories of the local mythology will start appearing quite plausible to you! In the mist you will feel that somewhere near in Kailash Lord Shiva is smiling with his pleasant eyes fixed upon you! Sitting at his side Parbati too is affectionately monitoring how we engage ourselves in the great design. At a slightest indication from Parbati her Bagua (lion) will jump out of his hiding somewhere in these rocks and rush towards her to give her a ride. At Baguabasa, it is only rocks and snow! If you try hard, at a few difficult angles, you may get glimpses of the Bugiyals that you have already crossed through! At the core of your heart you will notice, at least for the time being, that the call of the mountains ahead is stronger than the beautiful Bugiyals at your back! Is it that, ages ago, the Panchapandab along with Draupadi followed such a trail (the Mahaprosthaner Path) to reach their destiny!

Even during April, May you wont be able to stop at Baguabasa for a night-halt. The whole region will be under a 20 ft thick layer of snow! You would have stopped at Patar-Nachunia for the night and start for Roopkund on the next day early in the morning! It would have been as early as 3 am in the morning, much before the sun rises in the mountains. Since snow would have levelled the trail and the mountain, it would have looked like a sea of snow! At the begining of July things are magically different! At 5 am when you start you no more need to carry a torch or ropes to bind yourself with your amanda (partner in Garwali) and guide. Immediately after you have started from Baguabasa, the Nandaghunti will steal your attention with its bright snow-coverd grandeur!

For last couple of days you have been hearing that all these places with their rivers, fountains, forest, meadows and mountain peaks are guarded by the holy blessings of Lord Shiva and Devi Parbati. Now, while climbing up the trial with the Nandaghunti blocking your front view, you cannot be blamed if it comes to your mind that actually you have been summoned by Devi Parvati waiting somewhere there and her affectionate eyes are watching you to ensure your safety. A sudden perception of wisdom may overhelm you! For thousands of years millions of pilgrims and sages had walked along such difficult routes without any “civilized protections” against extreme weathers and diseases, most likely they were not as helpless as it appears to us! The happiness in being able to respond to a divine call might be a greater insurance for them! Your guide must have repeatedly warned you today that in this route it is the confidence that matters! You might have hidden your smile and gave him patient hearing with a serious face! It has been years when you have learnt that he or she who does not have any stake is the strongest in terms of confidence! Many a times you have jokingly quoted from Asterix that “the sky never falls!” However, body may not always keep it up with the aspirations of the soul. Ahead of you is the last 2 km snow-covered trail. You know that you will reach Roopkund in at most two more hourou will stay there for half an hour or so before coming down. You also know that what you will see there is nothing new to you. In the websites you have already seen the photographs Still you have to go there. Otherwise your guide will doubt your integrity. You have to maintain that till the end. Carry on!

সংস্কৃতির রাজনীতি, রাজনীতির সংস্কৃতি

কিন্নর রায়

রাজনীতি ও সংস্কৃতি—এই দুটি শব্দই অতি প্রাচীন মধুজালিক অথবা হলাহল ভাণ্ড যেমন, তেমনই। অনেকেই অনায়াসে বলে থাকেন, ওসব রাজনীতি টাজনীতি ঠিক বুঝি না। আমাদের ছোটো মাথায় ও সব ঢোকে না। কিংবা পাশাপাশি একইভাবে প্রায় একই সুরে বাঁধা গতে এঁদেরই কেউ কেউ হয়ত বা বলে থাকেন, ওসব তো হাই থটের ব্যাপার আমরা অত বুঝিটুঝি না। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই হাইথট শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

এখন কথা হল সত্যিই কি সাধারণজন—আমজনতা, অতিমূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যাঁরা আমাদের এই দেশে—কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংবিধান সম্মত উপায়ে সরকার পরিবর্তন করেন অথবা অনেক সময় ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য বুথেই পৌঁছতে পারেন না ক্ষমতাসীন শাসকদলের ক্যাডারকুলের সমান্ত্র হুমকি ও চোখ রাঙানির জন্য, নয়তো ভোটকেন্দ্রে—বুথে কোনো রকমে পৌঁছেও দেখেন তাঁর অতি মূল্যবান ভোটটি ইভিএম টিপে হয়ে গেছে, তিনি—সেই অসহায় আম পাবলিকও তাঁর মতো করে রাজনীতি ও সংস্কৃতি বোঝেন।

অর্থাৎ যিনি হাতে ভাত মেখে গরাস তুলে মুখে দেন, ভাত খাওয়া শেষ করে আঁচান, সন্তানের মতো অথবা পিতা হন, খোলা আকাশের নীচে, নয়ত কোনো ঘেরাটোপের আড়ালে প্রাত্যহিক কৃত্য সারেন, তিনিই রাজনীতি বোঝেন, বুঝে থাকেন সংস্কৃতিও অবশ্যই তাঁর মতো করে।

আমরা অনেকেই কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত অথবা চাণক্যকে জানি। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র লেখা হয়েছে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে, এমনই মত পোষণ করছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডি আর ভান্ডারকার, কেপি জয়সোয়াল, রোমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র-অমাত্য, সৈন্য, সেনাপতি, দণ্ডনায়ক, কুটিনী, গণিকা, রাজপুরুষ সমন্বিত ইতিহাসের কালচক্র বেষ্টিত সেই সময়ে চাণক্য অথবা কৌটিল্য, যিনি ধনপদ্মনন্দের মন্ত্রী, পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নন্দবংশ ধ্বংসের পর নবনৃপতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই কূটনীতি-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখছেন, রাজর্ষি অর্থাৎ আদর্শ রাজা কাকে বলা হবে। যাঁর আত্মসংযম রয়েছে তিনিই রাজর্ষি। চাণক্য লিখেছেন—রাজর্ষি হতে গেলে প্রাজ্ঞ ও প্রবীণদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ রাজর্ষির অবশ্যকর্তব্য। জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে অর্জন করতে হবে জ্ঞান। পরার্থে নানা কল্যাণমূলক কাজ তাঁকে করতে হবে। আর অবশ্যই সমস্ত বিষয়টি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে সর্বদাই চোখ কান খোলা রাখা প্রয়োজন।

রাজর্ষি—একজন সত্যিকারের রাজা হয়ে উঠতে গেলে পরস্ত্রী, অন্যের সহধর্মিনী থেকে সর্বদাই কু-নজর সরিয়ে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, মিথ্যা না বলা অথবা অলীক কল্পনা না করা—এই দুটি ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অসৎ সঙ্গ বর্জন করা—এই আদর্শটিকেও সামনে রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সাম্প্রতিক কালে সমস্ত রাজ্য জুড়ে শাসক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রিত বাহুবলীদের সগর্জন রৌরব উপস্থিত—আমি বলছি নির্দল প্রার্থীদের ঘর জ্বালিয়ে দিন, পুলিশকে বোমা মারুন, অথবা আমি তিনজনকে পায়ে দলে হত্যা করেছি, বাপী দত্ত তোমার মুণ্ডুটাও আয়দা (আলাদা) করতে ইত্যাদি প্রভৃতি অথবা সাংসদ অভিনেতা চন্দননগরের 'মাল'—এসব শব্দ সেই সাংসদ অভিনেতার সুবচন প্রতিভা থেকেই ধার করা হল, তিনি যখন বলেন, আমি ঘরে ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করিয়ে দেব . . . আবার একটু থেমে বলে ওঠেন, যা-তা করিয়ে দেব . . . অথবা রিভলভার থেকে গুলি করে খুন করে দেব, এসবই 'এক অনন্য রাজনৈতিক রচনাবলী' হিসাবে উপস্থিত হয় পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার অসহায় মানুষের সামনে। আর তাঁদের—সেই সব আম পাবলিকের শিরদাঁড়ার ভেতর ভয়ের স্রোত অনায়াসে ঢুকে পড়ে শিহরিত করতে থাকে তাঁদের সমস্ত সত্তাকে, মনেই হয় যেন বা কশেরুকা দিয়ে খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে কোনো সর্পিল-সর্পময় প্রবাহ।

এক কবি বহুদিন আগে তাঁর কাব্য গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন, 'কশেরু ছুঁয়েছে পাইপগান'। আমাদের কপাল, মাথা, কশেরুকা সর্বত্র স্পর্শ করে আছে আতঙ্কের হিমনল। আর এক গদ্যশিলনী (সত্তর দশকে)। লিখেছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হা-হা. . .'। তো এরাজ্যের দুষ্টু দামাল ছেলেদের দাপটে পশ্চিমবঙ্গ যথার্থ অর্থেই এক নরকাগ্নি বাহিত প্রমোদ পোত। যেখানে অবিরাম ধর্ষণ, হত্যা, রক্তপাত, বিরোধী দল—সমস্ত রকম বিরোধী শক্তির কণ্ঠরোধ, এমন নিজেদের দলীয় রাজনীতির মধ্যেও ক্রমাগত খুন জখম, অগ্নিসংযোগ এ-রাজ্যে জলভাতের থেকেও অতি সহজতর।

রেহাই নেই কারও। দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতের মুষলপর্ব যেন সদা জাগরুক আমাদের চোখের সামনে। ফলে ভয়, ভয় আরও ভয়াল পরিস্থিতি। এ থেকে মুক্তি কীভাবে হবে এই রাজ্যের তথা দেশের আমরা জানি না।

অবশ্য এই যে অস্বস্তিবচন, ভয় দেখান শব্দ হুংকার, তা এই রাজ্যে কোনো নতুন ঘটনা নয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে সিঙ্গুরে টাটার মোটর কারখানা বিরোধী, কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের সহজে বাছা বাছা কু-শব্দ না হলেও আন্দোলনকারীদের এককথায় 'বহিরাগত' বলা ও নন্দীগ্রামে 'ডাও কেমিকেল'-এর কারখানা করার বিরুদ্ধে আসা মহিলাদের পশ্চাদদেশ দেখাবেন কারখানাপন্থী, জমি অধিগ্রহণ পন্থী মহিলারা, এমন কথাও উচ্চারিত হয়েছে সগর্বে। 'লাইফ হেল' করে দেওয়ার ভয়ও দেখান হয়েছে। তার কিছু পরে একজন তৎকালীন সাংসদ তখনকার বিরোধী দলনেত্রীর চুলের মুঠি ধরার কথা বলেছেন।

দুটো ঘটনা পরম্পরাকে এক করে দেখানর কোনো কারণ নেই। তার অন্যতম কথাসূত্র হল তখনকার শাসকদল কিন্তু এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ, স্বৈরাচারী উচ্চারণকে ক্ষমা করেনি। মাননীয় সাংসদ, সাংসদ হিসাবে প্রাক্তন হয়েছেন। দলবিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন। 'দুষ্টু ছেলে', 'দামাল ছেলে', 'ছোটো ছোটো ছেলে', 'সামান্য ব্যাপার' এইসব বলে বিষয়টিকে লঘু করণের চেষ্টা হয়নি। পার্থক্যটা এখানেই।

ভাষা, সংস্কৃতি, ভাষার প্রয়োগ তার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক—এসব কিছুকে এক সূত্র বাঁধতে গিয়ে এইসব প্রশ্ন সামনে এল। কারণ ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম বাহন, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম।

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর পরবর্তী সময়ে ধরা পড়েছে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্রের নীল নকশা। একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্র হয়েছে, তৈরি হয়েছে এক বিচিত্র নীতিহীন, রামধনু জোট—যেখানে তখনকার শাসকশক্তির বিরুদ্ধবাদী সমস্ত দল ও মত যোগ দিয়েছে, হাতে হাত মিলিয়েছে নির্বিচারে। চরম দক্ষিণপন্থী ধর্মান্ধ তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী শক্তি, ইসলামি মৌলবাদীদের একাংশ, যাবতীয় দক্ষিণপন্থী দল ও মত। সেই সঙ্গে তথাকথিত জঙ্গল ও বন্দুকের রাজনীতিতে বিশ্বাসী 'অতিবাম শক্তি' তার থেকে আর একটু ফিকে অতিবাম কিছু গ্রুপ ও দল, সেই সঙ্গে এন জি ও-দের একটা বড়ো অংশ, তাদের বিপুল টাকা, গাড়ি, প্রচারের আপাত নিরীহ অরাজনৈতিক মুখ, তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী অথবা স্বঘোষিত সাচ্চা মার্কসবাদী অথবা গান্ধিবাদী একক ব্যক্তি মানুষ; এরই পাশাপাশি তথাকথিত 'সুশীল সমাজ' ও 'বিদ্বজ্জন'—কথাটা ২০০৮-২০০৯-২০১০-২০১১-তে প্রায় মুড়ি-মুড়কির থেকেও সহজলভ্য হয়েছিল, অনেকেই 'সুশীল' অনেকেই 'বিদ্বজ্জন'—তাঁদের সকলেরই ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম—অবস্থার 'পরিবর্তন', সেজন্যই যেভাবে হোক 'দড়ি ধরে মারো টান'-এর ব্যবস্থা।

পরবর্তী সময়ে তথাকথিত 'পরিবর্তন' অর্থাৎ রাজনৈতিক 'পট পরিবর্তন'—এর পর ২০১১-র ১৩ মে-র পরবর্তী কালখণ্ডে এই সব সুশীলদের অনেকেই গাল ভরা সন্দেশ-রসগোল্লা, মাংস-পোলাও, টাকার থলি, বিভিন্ন পদে আসীন হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে ছড়ি ঘোরানোর বিপুল সুযোগ পেয়ে নিজেদের ধন্যি মনে করলেন। ফলে তাঁদের অনেকেরই 'সুশীলত্ব' 'বিদ্বজনত্ব' একটা জায়গায় এসে আটকে গেল। ফলে পার্ক স্ট্রিট, আটোয়া, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, দাঁইহাট, আউশগ্রাম, গেদে, লাভপুর—সবই সেই সুশীলত্বর ফুটোস্কোপের বাইরে থেকে গেল। ক্ষমতার মাংসের টুকরো, লুচির খণ্ড এমনই প্রতাপময় বস্তু।

একটু আগে 'বহিরাগত' শব্দটির কথা উঠে এসেছিল। আন্দোলন সংগ্রামে বহিরাগতরাও অংশ নেন বহু সময়ে। বলিভিয়া, কুবা অথবা কঙ্গোতে স্বয়ং চেগেভারাই তো ছিলেন বহিরাগত। কলকাতা থেকে দক্ষিণবঙ্গে—কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াইয়ে মদত দিতে যাওয়া মধ্য শ্রেণীর শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা কি 'বহিরাগত' ছিলেন না। যদিও নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরে যে ধরনের শক্তি সমবেত হয়েছিল বাইরে থেকে এসে, তাঁদের সঙ্গে কোনোভাবেই এক আসনে বসান যায় না চেগেভারা বা তেভাগার সংগ্রামে অংশ নিতে যাওয়া বহু শহুরে বামপন্থীদের।

২০০২ সালে সবরমতী এক্সপ্রেস কাণ্ড ও গুজরাট দাঙ্গার পর—দাঙ্গা না বলে তাকে এক তরফা ভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী নিধন বলাই ভালো, সেই কলঙ্কজনক হত্যা পরিবেশে আমরা 'রাজধর্ম' শব্দটিকে নতুন ভাবে শুনতে পাই। তখনকার প্রধান মন্ত্রী তাঁরই দলের শাসন কর্তৃত্বে থাকা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে, যিনি এখন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী—এই কথাটি বলেছিলেন। সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী এখনকার প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আপনি রাজধর্ম ঠিকভাবে পালন করছেন না।'

রাজনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সংস্কৃতিতে রাজধর্ম একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চাণক্য—কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে রাজর্ষি প্রসঙ্গে যে কথা বলে গেছেন, তাতো আগেই বলেছি। রাজর্ষি তো আর সবাই হতেন না বা হতে পারতেনও না। মিথিলা রাজজনক ছিলেন রাজর্ষি।

কৌটিল্য রাজধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন, রাজাকে দেখতে হবে হিংসা করা কখন কাম্য বা কর্তব্য। গুপ্তচর, গুপ্তঘাতক, বিষকন্যা নিয়োগের পদ্ধতি ও উপযোগিতা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে রাজাকে।

এই রাজধর্ম বিষয়ে মহাভারত এর শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ ভীষ্ম রাজধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরেছি। ঋণ স্বীকার অবশ্যই রাজশেখর বসুর কাছে। এখানে রাজধর্ম অর্থে শাসকের সংস্কৃতি।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ ধর্মজ্ঞরা বলেন যে নৃপতির পক্ষে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রশ্মি যেমন অশ্বকে, অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেই রূপ রাজধর্ম সকল লোককে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।

ভীষ্ম বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি সর্বদা উদ্‌যোগী হয়ে কর্ম করবে, পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না। তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্রগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ এবং মন্ত্রগোপন বিষয়ে সরল হবে না। . . .শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গ উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সূর্যের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ হবেন। গর্ভিনী যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে গর্বের হিতসাধন করে, রাজাও সেই রূপ নিজের হিতচিন্তা না করে প্রজারই হিতসাধন করবেন।

যুধিষ্ঠির, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে—অমাত্য সুহৃৎকোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচারণ করবে গুরু বা মিত্র হলেও তাকে বধ করবে। রাজা কাকেও অত্যন্ত অবিশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধুলোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যাঁরা রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ।

যুধিষ্ঠির, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হয় সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান।

মহর্ষি কশ্যপ পুরুরবাকে বলেছলেন, পাপী লোক যখন স্ত্রী হত্যা ও ব্রাহ্মণ হত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভয় উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে রুদ্রদেব উৎপন্ন হন, তিনি সাধু অসাধু সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইনি নিজের ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন।

তস্কর যদি প্রজার ধন হরণ করেন এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, তবে সেই রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি পূরণ করেন।

রাজা অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড করবে এবং নির্ধনকে কারা দণ্ড দেবে। দুর্বৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করবে এবং সজ্জনকে মিষ্ট বাক্য এবং উপহার দিয়ে পালন করবে।

যে রাজা ধর্মনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টিতে মাতা পিতা ভ্রাতা ভার্যা পুরোহিত কেউ দণ্ডের বহির্ভূত নয়।

এরকম আরও বহু উপদেশ কথা সারাৎসার আছে রাজধর্ম বিষয়ে। সেখানে প্রশ্নকর্তা যুধিষ্ঠির উত্তরদাতা কুরু পিতামহ ভীষ্ম।

রাজনীতির সংস্কৃতি, সংস্কৃতির রাজনীতি প্রসঙ্গে মনে পড়ল বুদ্ধদেবকে কর্ষণজীবীরা বর্ষাকালে ধর্ম প্রচার, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের চলাফেরা বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। তথাগত এর কারণ জানতে চাইলে কৃষকরা উত্তর দিয়েছিলেন, বর্ষাকালে চাষ হয়। বীজ থেকে বেরয় নতুন চারা। সেই চারা বড়ো হয়। এই সময় আলপথ ধরে যাওয়ার সময়ও কখনও কখনও বীজতলা রোয়ামাঠে নেমে আসেন শ্রমণ-শ্রমণারা। তাদের পদভারে পিষ্ট হয় শস্য সম্ভাবনা। ক্ষতি হয় শস্যের।

বুদ্ধদেব চাষীদের সেই কথা মেনে নিয়ে বর্ষার তিন মাস বর্ষাবাসের ব্যবস্থা করলেন বিহার, সংঘারামে। তৈরি হল বর্ষাবাসের অনুশাসক। এই বর্ষণ ঋতুর কাল খণ্ডে বৌদ্ধ ভক্তেরা, শ্রমণ-শ্রমণারা নিজেদের মনের গভীরে জমে থাকা ক্লেদ মুক্তি ঘটাতে থাকেন আত্মউন্মোচন, আত্মমোক্ষণের মধ্য দিয়ে। জানি না আরও অনেক অনেক বছর পরে খ্রিস্ট ধর্মে চার্চের নিবিড় ছায়াময়তায় যে 'কনফেশন'-এর আয়োজন, সেই পাপ বিষয়ে কনফেস এই বর্ষাবাসের ধারাবাহিক ক্রম পরিণতি কিনা।

এখানে একটা কথা বলা বোধহয় প্রয়োজন আমাদের কেন জানি না বারে বারে মনে হতে থাকে যেদিন থেকে কৃষক, কর্মকার, সূত্রধর, তক্ষণ শিল্পী, গণিকা, ভিক্ষুকদের ধম্ম শ্রেষ্ঠীর ধম্ম, রাজ ধর্ম হয়ে উঠল, সেদিন থেকেই ক্ষয় শুরু হল বৌদ্ধ ধর্মের। অবশ্য বুদ্ধদেব জীবিত থাকতেই ঘটেছে এই ঘটনা।

যে বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রায় নিরীশ্বর, নিরাকারবাদী, মূর্তিপূজা বিরোধী ছিলেন, কালক্রমে তাঁর মূর্তিই পূজিত হতে লাগল বিগ্রহ রূপে। গান্ধার শৈলী, নাকি মথুরা শিল্পধারা কোন শিল্প-আঙ্গিকে নির্মিত হল প্রথম তথাগত বিশ্ব, তা অবশ্যই তর্কের বিষয়, কিন্তু এটা তো ঠিক হীনযান পন্থীদের মূর্তি হীনতা, আরাধনায় শুধুমাত্র কিছু প্রতীক পূজা পরবর্তী সময়ে মহাযানীদের বুদ্ধবিম্ব আরাধনায় প্রায় বিলীন হয়ে গেল। আরও পরবর্তীকালে বজ্রযান ও সহজযানের তীব্র সংক্ষোভে আন্দোলনে হীনযানীরা তো বটেই কোণঠাসা হলেন মহাযানীরা। দেহবাদী সহজিয়া তন্ত্রসাধনায় বজ্রযানীরা নিয়ে এলেন নানান দেবদেবী। আদি বুদ্ধ তো রইলেনই, সেই সঙ্গে সঙ্গে এলেন বজ্রতারা, জাঙ্গুলী, মঞ্জুশ্রী, পর্ণশবরী, হেরুর,

জম্ভল সহ নানা বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবদেবী। অনেক সময়ই এঁদের কেউ কেউ মূর্তি ভঙ্গিমায় হিন্দু দেবী-দেবতাদের মাথায় পা রাখলেন।

আদি শংকরাচার্যের আবির্ভাব বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মকে।

মণ্ডল মিশ্র, উভয়ভারতীর কথা আমরা সকলেই জানি। আমি সেই সব কাহিনি উপকাহিনির মধ্যে একেবারেই যাচ্ছি না। শুধু হিন্দুদের যে একান্নটি পীঠস্থানের কথা বলা হয় পুরাণ কথায়, যেখানে পুরাণ কাহিনি অনুযায়ী শিবজায়া সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে টুকরো টুকরো করেন বিষ্ণু মহাপ্রলয় আটকাতে। দক্ষের যজ্ঞ সভায় পতি শিবের নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করলেন সতী। এবার শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শুরু করলেন প্রলয় নৃত্য। শৈব ধর্মের কাঁধে শক্তি ধর্ম—ব্যাপারটা যদি আমি একটু ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে হয়ত এমনটাই দেখব, তারপর বৈষ্ণব—বিষ্ণু কাল্টের উদ্যোগে সেই সতীদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অখণ্ড ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। সিংহল—শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান—সর্বত্রই এই শক্তি পীঠকেন্দ্রের বীজ প্রোথিত হল।

মন্দির, শক্তিপীঠস্থান—সবই ক্ষমতার কেন্দ্র। যদি আমরা ধর্ম ও ক্ষমতার ইতিহাস অনুসরণ করি তাহলে দেখব প্রতিটি শক্তি পীঠের পাশেই গড়ে উঠল শিব মন্দির। কোথাও কোথাও বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মন্দিরও। আদি শংকরাচার্য তাঁর অতি স্বল্প জীবনকালে হিন্দু ধর্মের প্রধান পাঁচটি ধারা—শক্তি, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যের মধ্যে তিনটি মূল ধারাকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে চাইলেন। যদিও শাক্ত, শৈব, শৈব বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-শাক্ত সংঘাত, রক্তক্ষয়ী হানাহানি সুবিদিত। বলতে গেলে একধরনের কর্তৃত্ববাদী কেন্দ্র তৈরি করলেন আদি শংকরাচার্য। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের আপাত সহ-আবস্থান নির্মাণের চেষ্টা হল একান্ন শক্তি পীঠের উপাখ্যান নির্মাণে। বহু বৌদ্ধ ও জৈন উপাসনালয়, আদিবাসী-মূলবাসী মানুষদের উপাস্য বৃক্ষ ও শিলা দেবতা অথবা দেবী পরিণত হল শাক্ত পীঠে। কুণ্ড-জলাশয় ঘিরে তৈরি করা হল নতুন নতুন মিথ।

নির্বিচার বৌদ্ধ হনন, বৌদ্ধ থেকে—বিশেষ করে বজ্রযানী বৌদ্ধ থেকে আবারও নতুন করে নব্য হিন্দুত্বে ফেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ থেকে ইসলাম কবুল, সবই চলতে লাগল পাশাপাশি নব্য হিন্দুরা বৌদ্ধদের পক্ষে ত্রাসের কারণ হলেন। তখন বৌদ্ধরা বিশেষ করে বজ্রযানীরা হয় আশ্রয় নিলেন গুপ্ত-গুহ্য লোকায়ত সাধনায়, নয়ত ইসলাম কবুল করলেন। পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক রাজনীতি গভীরভাবে অনুসরণ করলে হয়ত এই বিষয়টিই স্পষ্ট হয় আমাদের সামনে। শাসকদলের মধ্যেই আদি, নব্য ও অতি নব্যদের লড়াই তীব্রতর।

'বদলা নয় বদল চাই', 'দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র' এইসব বুজরুকি বার্তা সামনে নিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁরা সিংহাসনে আসীন হওয়ামাত্রই সব ভুলে গিয়ে নিজেদের বাছা বাছা লোকজন বসিয়ে দিলেন সর্বক্ষেত্রে। শুরু হল চূড়ান্ত দলবাজি। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি-র জগৎ স্বাভাবিক ভাবেই এর বাইরে রইল না। নাট্য দল—গ্রুপ থিয়েটার লিটল ম্যাগাজিনে—প্রতিবাদের সমস্ত কেন্দ্রকেই প্রবল ভাবে কিনে নেওয়ার চেষ্টা হল। হয় উৎকোচে বশীভূত হও, নয়ত পেশীশক্তিকে ভয় পাও হয় তুমি আমার লোক, নয়ত 'হার্মাদ'। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলালে তুমি অমুক রত্ন, তমুক ভূষণ। প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে ধর্ষণ, খুন, জমি-বাড়ি দখলের প্রতিবাদ করলেই সি পি আই(এম), নয়ত মাওবাদী।

এই ধারাবাহিকতা তো একদিনের নয়। ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগে ম্যাকার্থি, ডালেসদের ডাইনি সন্ধান করার কায়দাতেই কমিউনিস্ট খুঁজে বেড়ান, হয় তুমি আমার দিকে, না হলে তুমি প্রোসোভিয়েত অথবা কমিউনিস্ট, এইতো ছিল ডালেস, ম্যাকার্থি, লিন্ডন বি জনসন, কেনেডি জমানার আমেরিকা। এখনও এই এককেন্দ্রিক বিশ্বে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নেরই কোনো অস্তিত্ব নেই, 'সমাজতান্ত্রিক চীন' ব্যস্ত মার্কেট ইকনমিতে, সেখানে ইসলাম—তথাকথিত 'আগ্রাসী ও জঙ্গী ইসলাম এবং মোল্লাতন্ত্র' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গলার কাঁটা। ফলে পাকিস্তানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা দ্বারা পরিচালিত ড্রোন হামলা। যত বড় যুদ্ধ-অপরাধীই হোক না কেন ওসামা বিন লাদেন, পাকিস্তানে ড্রোন পাঠিয়ে সপরিবারে তাকে হত্যা করা ও মরদেহটিকে সমুদ্রগভীরে গুঁজে দেওয়া, লিবিয়ায় গদাফিকে গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে শাস্তি দেওয়া, তারও অনেক অনেক বছর আগে ইরাকের তথাকথিত গোপন রাসায়নিক অস্ত্রভাণ্ডার খুঁজতে বিমান হামলা, সসৈন্যে আক্রমণ, সমস্ত ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সমস্ত নিদর্শন লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া—সবই তো এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ করেছে। এটাই তার রাজনৈতিক সংস্কৃতি। বাবা বুশ, ছেলে বুশ এ ব্যাপারে একদম একইপথের পথিক। বিল ক্লিনটন মণিকা লিউনস্কির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে বেড়ে ওঠা কেচ্ছা সামলাতে ইরাক আক্রমণ করিয়েছিলেন, এমনও বলেন অনেকে। আবার কেউ কেউ বলেন, সোশাল মিডিয়া—ফেসবুক, ট্যুইটার, ব্লগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক আনুকূল্যে মিশরে অবসান হয়েছে একনায়কতন্ত্রের। হয়েছে পিঙ্ক রেভেলিউশান। প্রতিবেশী বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী শাহবাগের আন্দোলনের ব্যাপ্তি, তাও নাকি সম্পূর্ণত সোশ্যাল মিডিয়ার দান। মিশরে গণতন্ত্রের বিকাশ কতটা কি হয়েছে আমরা সংবাদ মাধ্যমেই

দেখতে পাচ্ছি। শাহবাগের আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়েছে। মিশরের গোলাপী বিপ্লবের পেছনে কি আমেরিকা ও সি আই এ ছিল? ক্ষমতা দখল, ক্ষমতায়নের রাজনীতি কি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই বাধ্য করল পুরনো শাসক বদলে দিয়ে নতুন শাসকের মুখ নিয়ে আমার উদ্যোগ নিতে! জানি না। শাহবাগের ঐতিহাসিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল ক্রমে। তাহলে কি শুধু মাত্র সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতা নয়, আসলে হাঁটতেও হয় যোজন যোজন পথ। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয় সংগঠককে, 'নো পাসারনে' বলে।

পশ্চিমবাংলার গ্রুপ থিয়েটার, নট ও নাট্যকর্মীদের প্রসঙ্গে আবার ফিরি। সামান্যতম প্রতিবাদী হলেই সেই নাট্যদলের কোনো অনুদান পাওয়ার তো কোনো প্রশ্ন ওঠেই না, বরং তারা শো করতে চাইলে চাহিদা অনুযায়ী হলও মেলে না। এ অভিযোগ এ রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, নাট্য কর্মীদের। আর এঁরা যে সকলেই প্রবল বামফ্রন্টী বা সি পি আই (এম), তাও তো নন। বরং তাঁরা অনেকেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তনপন্থী ছিলেন। আবার রাজ্যে ২০১১-র ১৩ মে রাজ্যে পালাবদলের পর তাঁরা কোনোভাবেই শাসকদলের ক্ষমতা বৃত্তের মধ্যে থাকেননি। সামান্যতম প্রতিবাদী হলেই বিপদ। হয় মিথ্যা মামলা, নয় ভয় দেখান, কিংবা নাটক বন্ধ করে দেওয়া, জোর করে—চলতেই থাকবে।

এই প্রসঙ্গে তুলনা টেনে কেউ কেউ ২০০৯ বা ২০০৮-এ 'উইঙ্কিল টুইঙ্কিল' বা 'পশুখামার' বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেন। সেই কর্মকাণ্ডেও তো নিশ্চিভাবেই অন্যায় নামের কবন্ধ রাক্ষসটির বড়ো বড়ো নখযুক্ত রোমশ কালো হাত ছিল। কিন্তু অবশ্যই প্রত্যক্ষ সরকারি মদত অনুশাসন বা নির্দেশ ছিল না।

এখন তো মনে হয় দরকার কি ছিল সোভিয়েত সরকারের বরিস পাস্তেরনাকের 'ডকটর জিভাগো' বা 'ডকটর জিভাগো'-কে নিষিদ্ধ করা! কারণ অ্যাত অ্যাত নিষেধ বেড়া সত্ত্বেও তো পাস্তেরনাকের এই পৃথুল নভেল ইতালিয় ভাষায় প্রকাশিত হল। সিনেমা হল। অস্কার পেল। অসাধারণ অভিনয় করলেন ওমর শেরিফ। সেই সঙ্গে চ্যাপলিন কন্যা জেরাল্ডিন চ্যাপলিন আর জুলি কির্স্টি।

বরিস পাস্তেরনাক অবশ্য নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৫৮-তে। তারপর একরকম বাধ্য হলেন সেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতে। ১৯৫৮-র ৫ নভেম্বর দীর্ঘ চিঠি দিলেন 'প্রাভদা' পত্রিকায়। আর সেখানে সোভিয়েত নাগরিকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে লেখেন, 'আই বিলিভ দ্যাট আই শ্যাল বি এবল টু রিগেন মাই ওল্ড ফেম।'

মাঝে ভোলগা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এর বহু বছর পর সত্তর দশকের গড়িয়ে আসা বেলায় আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন তাঁর 'গুলাগ আর্কিপেলিগো'—'গুলাস দীপপুঞ্জ'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান সাহিত্যে। 'ক্যানসার ওয়াড'-এর লেখক গুলাসজনক নির্বাসিত হন সোভিয়েত ভূমি থেকে। এর আগেও বহু লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করে। উল্টো শিবির থেকে এই ধরনের ঘটনা যে দেখা যায়নি এমন নয়। তবে সোভিয়েত লেখক, শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা তুলনায় বেশ অনেকটাই বেশি। পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমের তীব্রতাও যে এর পেছনে যথেষ্ট তা বলাই বাহুল্য। কারণ নিকোলাই গোগল, ইভানতুর্গেনিভ, লেভ তলস্তয়, ম্যাক্সিম গর্কি, মায়কোভস্কি, আন্তেন চেকভ, ফিওদর দস্তয়েভস্কি যে ভাষায় লিখেছেন, সেই ভাষার লেখক হিসাবে বরিস পাস্তেরনাক বা আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন কোনো তুলনাতেই আসেন না। পশ্চিমী প্রেস এই দুজন সহ অনেক সোভিয়েত ত্যাগী লেখককে 'মহান', 'মানবতাবাদী', 'বিদ্রোহী'—এইসব বিশেষণে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তবে কিছু দাঁড়ায়নি। পাস্তেরনাক, সোলঝেনিৎসিন তেমন যুগান্তকারী কোনো কথাকার হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেননি, টিকে যাননি সময়ের ধোপে। যদিও সোলঝেনিৎসিন এবং তাঁর গুলাগ নিয়ে অনেক শব্দ ও নিউজ প্রিন্ট খরচ করেছে পশ্চিমবাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকটি।

রাজনীতি, সংস্কৃতি—এভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যেমন ধর্মও অবধারিত ভাবে যুক্ত হয়ে আছে রাজনীতির সঙ্গে। রাজনীতির সংস্কৃতি বা সংস্কৃতির রাজনীতি এভাবেই গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে একে অন্যের সঙ্গে। তাকে আলাদা করে দেখা, তুলে নিয়ে কোনো বিচ্ছিন্ন গজদন্ত মিনারে বসান অসম্ভব।

পণ্ডিতেরা বলেন, তথাকথিত ঠান্ডা যুদ্ধের নাকি অবসান হয়েছে সোভিয়েত পতনের পর। সোভিয়েত নেই। হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া কিছুই নেই। নেই আলেবেনিয়ার সমাজতন্ত্র। আলবেনিয়া পরিণত হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্রে। হোনেকার গোমুলকা, চাওসেস্কু বাসে সেক্কুর নামে শোনা গেছে অনেক অনেক কুমন্তব্য। নতুন নতুন দেশ, সীমানা, কাঁটাতার, ভিসা-পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে। বসনিয়া, ম্যাসেডনিয়া, হারভেজ-গোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া। চেচেন বিদ্রোহীরা গোলা দাগছে, দখল নিচ্ছে মস্কোর থিয়েটার আর বেসলানে ছোটদের স্কুল। ক্রিমিয়া নিয়ে বাড়ছে সংকট। চেচেন গেরিলাদের তাড়াতে, ধরতে বিষগ্যাস ব্যবহার করছে পুতিনের রুশ ফৌজ। পুতিন প্রাক্তন কে জিবি কর্তা। রুশ মিসাইল 'বিউক'-এ ভেঙে পড়ল। মালয়েশিয়ার যাত্রীবাহী বিমান ইউক্রেনে। যে ইউক্রেন ছিল অখণ্ড সোভিয়েতের শস্যভাণ্ডার। যেমন বাকু ছিল শ্রেষ্ঠ খনিজ তেল উৎপাদন

কেন্দ্র। এদিকে গাজায়ে 'হামাস'-কে উৎখাতের নামে প্যালেস্তিনীয় শিশু-নারী বৃদ্ধ নির্বিচার ইজরায়েলি আক্রমণের মুখো জায়নবাদীরা 'হামাস'-এর ঘাঁটি ও সুড়ঙ্গ ধ্বংস করার নামে নির্বিচারে উড়িয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ধর্মস্থান, স্কুল, জনপদ—অসামরিক ঘরবাড়ি। পাল্টা রকেট হানা চালাচ্ছে 'হামাস'। তাতেও নিহত হচ্ছেন মানুষ। রাজনীতির সংস্কৃতি অথবা সংস্কৃতির রাজনীতিতে এই ধারাবাহিক নিকেশ কাণ্ড মনকে ব্যথাতুর, বেদনার্ত করে তোলে। ভাবি আর কবে সত্যিকারের 'মা নিষাদ' উচ্চারিত হবে কবি কণ্ঠে। সে কণ্ঠ প্রত্যয় শুনে থমকে ঘুরে দাঁড়াবেন চেতনা, চৈতন্য সম্পন্ন মানুষ। রাজার আসন সাফ করা একই সঙ্গে উচ্চারিত 'ভাঁড় ও কবি'—আহা, একই অঙ্গে কত রূপ সেই ক্ষমতা লিপ্সু কবিতাজীবীর, ছিটকে পড়বে সেই অমোঘ উচ্চারণে।

আহা, কবে আসবে সেই দিন।
প্রতীক্ষায় রইলাম।
সকলকে নমস্কার।

চঞ্চুতে ধরেছি মৃত কীট

দেবজিৎ চক্রবর্তী

চলো উড়ে যাই   গাছের পাতার মতো
যে গাছের ডালে পাখি থাকে
সে পাখির বাসা ডালে
বাসায় পাখির ছানা . . .
ছানার মায়ের ঠোঁটে কীট
মায়ের ছানার পেটে খিদে!

চলো উড়ে যাই
ঝরে যাই
ঝড়ে উড়ে যাই
ঝ'রে উড়ে যাই কোনো অন্য মাটিতে . . .

তবে তো প্রথমে তোর পাতা হওয়া লাগে,
তারও আগে হওয়া চাই বীজ
আরো চাই কূল ভাঙা জল
থাকা চাই সিঞ্চিত মাটি . . .

মাটি যদি বললে তবে সার নিয়ে এসো
এন.পি.কে, দশ-ছাব্বিশ, অথবা সুফলা!

শুধু সারে হবে কেন?
কীটনাশক চাই
সাথে চাই মেশিন—স্প্রে-গান!

গাছের শরীরে ঝরে স্প্রে
গাছের পাতায় ধরে কাঁপ
কম্পিত গাছের পাতায় মৃত কীট,
মৃত কীট মায়ের চঞ্চুতে
মৃত কীট পাখির ছানার ঠোঁটে!
বাছার যে খিদে পেয়েছে . . .

তোমার শরীর জুড়ে মৃতকীট—পেস্‌টিসাইড্!!
যন্ত্রের মতো জন্ম নিয়ে যায় শুধু নির্বীজ ফল . . .

ফল যার মাটিতে পড়ে না
মাটি যার ফলকে ধরে না বুকে
স্প্রে-গানে সিঞ্চিত সেই কীটহীন ফল
লরি পুরে ঢুকে যায় আমাদের পেটে!

খিদেকে সাইডে রেখে লরি যায় পেটের ভিতরে . . .
সেখানে বাজার বসে
সপ্তাহে দুই দিন হাটও . . .
(তাহলে ঝড়ে উড়ে এলে তুমি পেটের ভিতরে!)

সব কিছু পেয়ে যাবে হাটে
এমন কি 'তুমি'ও . . .
তোমার শরীর কেটে এক টুকরো 'তুমি' নিয়ে
আরো এক 'তুমি' গড়ে নেব—

তখন যদি উড়তে ইচ্ছে করে
ঝরতে ইচ্ছে করে পাতার মতোন
ঝ'রো তুমি
বাজারের তাতে কিছু এসে যাবে না . . .
ততদিনে আর একটা 'তুমি' যাবে
ব্যাগ হাতে বাজারের পথে
নির্বীজ ফল কিনে নিতে!

যে ফলের গাছে কোনো পাখি নেই . . .
সে বন্ধ্যা ফল বড় স্বাদু . . .

মানুষ হওয়ার এই মিছিল

শাশ্বত ব্যানার্জী

সমস্ত জটিলতা, বিতর্ক ও বিশ্লেষণ সরিয়ে রেখে একটা কথা বলাই যায়—যাদবপুরকে কেন্দ্র করে একটা বন্ধুত্বের ঢেউ উঠেছে। রাজ্য-দেশ-সীমান্ত দল-মত সব কিছু ঢেকে গেছে সহমর্মিতায়, রাগে।

দেশ-দেশান্তর থেকে গলা মেলাচ্ছেন মানুষ। উদ্বিগ্ন হচ্ছেন লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে-যাওয়া ভাইবোনেদের স্বাস্থ্য চিন্তায়। আশঙ্কা করছেন প্রশাসনিক প্রতিহিংসার পরবর্তী প্রকাশ নিয়ে। সকলেরই খুব আন্তরিক আশা—যেন ভুল পথে না চলে যায় এই জাগরণ। যেন 'ব্যবহৃত' না হয়ে পড়ে এই সম্মিলিত আবেগ।

আজ যেন নতুন করে মানুষ হওয়ার পাঠ নিচ্ছি আমরা সবাই!

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর বর্বর আক্রমণ কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে না। সেই আন্দোলনের কারণ বা পদ্ধতির প্রতি কারোর সমর্থন নাও থাকতে পারে। কিছুদিন আগে যাদবপুর ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে অনেকরকম কথা শোনা যাচ্ছে। তার কিছু সত্য, কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই বিকৃত। সত্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থেই দ্রুত যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার, এবং সেই দাবি নিয়েই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল পড়ুয়ারা। সেই আন্দোলনের প্রতি কারোর সহমর্মিতা রয়েছে কি না, তার চেয়েও এই মুহূর্তে বড়ো হয়ে উঠেছে—কীভাবে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হল।

রাতের অন্ধকারে সেই নৃশংসতার ফুটেজ সকলের সামনে এসে যাওয়ায়—মানুষ রেগে গেছে। এই রাগ কোনো রাজনৈতিক রাগ নয়। কোনো স্বার্থান্বেষী দেখনদারি নয়। এই রাগ মুক্তিকামী মানুষের নিহিত স্লোগান।

যাদবপুরের এই ছাত্র-আন্দোলনের ওপর রাজনৈতিক রং লাগানো হচ্ছে খুব চতুরভাবে। দুটি বক্তব্য শোনা যাচ্ছে প্রায়ই—

(১) যে মেয়েটির শ্লীলতাহানি হয়েছিল, সে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থক বলে, আন্দোলনের ছলে অন্যায়কারীদের আড়াল করা হচ্ছে।

(২) এখন সমস্ত মনোযোগ আসল ঘটনা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উপাচার্য ও অন্যান্যদের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনের দিকে। এবং যেহেতু পুলিশ আর উপাচার্য (এবং আক্রমণকারী গুন্ডারা; অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা বাদে বাকি সবাই) সরকারপক্ষের, তাই এই আন্দোলন হয়ে উঠেছে সরকার-বিরোধী। শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ কই?

প্রথম অভিযোগের বিষয়ে ওই ছাত্রীর মত জানা গেছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু তার বাবার বক্তব্য শুনলাম। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন—যত দিন গেছে ততই অসহযোগী ও নিশ্চেষ্ট হয়ে উঠেছেন বর্তমান উপাচার্য। তার ওপর কোনো ভরসা নেই আর।

কই কোথাও তো তিনি বলেননি, প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে আন্দোলন করছে তার মেয়ের সহপাঠীরা!

এরপর কী বলবেন, মেয়ের ইজ্জতকে তুচ্ছ করে দল বদলেছেন তার বাবা? কোথা থেকে কোন দল?

কলকাতার রাস্তায় ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা-করা মহামিছিল দেখে, পরের দিনই নিগৃহীতার বাড়িতে ছুটলেন শিক্ষামন্ত্রী। এতদিন সচেষ্ট হননি কেন? ভারতবর্ষের অন্যতম নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ-গঠনে নিরন্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন তারা। তাদেরই একজনের ক্যাম্পাসের ভেতর শ্লীলতাহানি হলে কেন ভ্রূক্ষেপ করবেন না আপনি, 'পরিবর্তিত' বাংলার শিক্ষামন্ত্রী? সর্বদা লোকচক্ষুর নজরে-থাকা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক পড়ুয়ার এই নিরাপত্তাহীনতা থাকলে, রাজ্যের প্রত্যন্ত কলেজগুলির কী অবস্থা? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন আন্তরিকতাসহ উদ্যোগী হলে এই পরিস্থিতি কি তৈরি হত? এমনকী শ্লীলতাহানির অভিযোগটিও সত্য না মিথ্যা (এমন কিছু কথাও ভাসছে বাতাসে) তা জানার জন্য তো তদন্ত প্রয়োজন।

লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরাই বা কেন মনোযোগ পাবে না আপনার?

দ্বিতীয় অভিযোগ প্রসঙ্গে বলি। একেকটি আন্দোলনের মূলত দু-ধরনের দাবি থাকতে পারে-একটি তাৎক্ষণিক, অন্যটি সামগ্রিক। এই দুটি দাবি হ'তেই পারে পরস্পরের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্কিত।

যে ভাবে কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে পুলিশ (ও বহিরাগত গুন্ডা) ডেকে বর্তমান উপাচার্য এই আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করলেন, তা থেকে উনি কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন—তা স্পষ্ট।

আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী, ভণ্ড একটা লোক দিনের আলোয় দলদাসত্ব করে। তার পদত্যাগ এই মুহূর্তের সবচাইতে বড়ো দাবি। শুধু যাদবপুরের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী নয়—গোটা ভারতবর্ষ ওনার অপসারণ চাইছে। যেতে ওনাকে হবেই।

এই যে দাবি তা উঠে এসেছে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি থেকে। মধ্যরাতে পুলিশের লাঠি ও বুটের ডগা থেকে। এই দাবি তাৎক্ষণিক। কাল উনি সরে গেলে এ চাওয়া আর থাকবে না।

কিন্তু এর সঙ্গে আসল ঘটনাকে আড়াল করার প্রসঙ্গ আসছে কেন?

যে-উপাচার্য ছাত্রদের মানুষ বলে ভাবেন না, তার কাছে এক নির্যাতিতা ছাত্রীর যন্ত্রণা মূল্যহীন হবে এ তো স্বাভাবিক। উনি তদন্ত-কমিটির কার্যকলাপ ও ভবিষ্যৎ দিক নিয়ে একটা পাবলিক স্টেটমেন্ট দিতে চাননি। নিজের আরামকেদারা ছেড়ে বাইরে এসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি; তার নাকি dignity তে বাঁধে। উনি করাবেন ছাত্র স্বার্থে যথাযথ তদন্ত?

শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে ওনার তৎপরতা কতদূর ছিল, তা তো ঘটনার অগ্রগতিতেই স্পষ্ট।

এই লোকটা সরে গেলে নতুন যিনি আসবেন, তিনি নিশ্চয়ই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ সুষ্ঠ তদন্তকমিটি গঠন ও নিরপেক্ষ তদন্তের যে সামগ্রিক দাবি তার সঙ্গে এই বিন্দুতে জুড়ে আছে বর্তমান উপাচার্যের অপসারণ।

ভবিষ্যতে যথাযথ তদন্তের কাজে যদি বাঁধা দেয় আজকের আন্দোলনকারীরা, কিংবা তদন্তে যদি বেরিয়ে আসে অপ্রকাশিত কোনো হীন অভিপ্রায় ছিল তাদের, তখন যথার্থই বলা যাবে তারা ক্ষুদ্রস্বার্থে আড়াল করতে চাইছে প্রকৃত দোষীদের। তখন আওয়াজ উঠবে বর্তমানের আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে; তার আগে নয়।

এছাড়াও তাদের সাম্প্রতিক জেনারেল বডি মিটিং-এ আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট বলেছে (লিখিত স্টেটমেন্ট রয়েছে) — শ্লীলতাহানির ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের লক্ষ্য তাদের সমস্ত দাবি অটুট থাকছে।

এরপর আর কী করার? নবান্ন-এর দেওয়ালে বড়ো বড়ো করে লিখে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

কোনো বিরোধী আন্দোলন যদি তার স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারে কেবলই টেনে নিতে থাকে আরও আরও বেশি মানুষ, তখন ঈর্ষায়, ভয়ে, নিজেদের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়ে-পড়ার আশঙ্কায় নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার শুরু করে শাসককুল। তাদের অপপ্রচার যত বেশি চোখে পড়বে, বুঝে নিতে হবে নিজের জোর বাড়াচ্ছে দলতন্ত্রের আওতার বাইরে থাকা গণ-আন্দোলন।

এই অপপ্রচারের কিছু নমুনা ও নিজের মতো করে তার উত্তর দিই—

অপপ্রচার (১) আন্দোলনকারীরা নাকি শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখায়নি।

আহা রে, বেচারা শিক্ষক! তা শিক্ষক কে? যিনি অন্যায় জেদ ধরে আরামে বসে থাকেন গেট-টানা ঘরের ভেতর আর বাইরে রাত-জেগে গলা ফাটিয়ে মরে তারই সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীরা? কী শেখার আছে ওনার থেকে যে ওই উপাচার্যকে শিক্ষক হিসেবে মানতে হবে? একটু দেখি—

(ক) নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনার তদন্ত যত রকম ভাবে দেরি করানো যায়, তিনি করেছেন। যা শুনলাম, প্রথমেই তো নাকি বলেছিলেন, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে ১৫ দিন সময় লাগবে। ইনি শিক্ষক? — ছিঃ।

(খ) আন্দোলন ভাঙতে উনি পুলিশ ডাকলেন। কার সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত? ওই সময়ের পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা কি একমাত্র ওনারই ছিল? নাকি অন্য কারোর দেখাদেখি একটু একানয়ক হওয়ার সাধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল?

(গ) অভিযোগ—প্রাণের হুমকি দিয়েছিল ছাত্ররা; ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল উপাচার্যকে।

ওনার সঙ্গে আটকে ছিলেন যারা, তাদের একজনও একবারও কোথাও প্রাণভয়ের কথা বলেছেন? বরং ঘটনার পরে একদিন সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কর্মস্থলে। ঢুকতে না পেরে দীর্ঘক্ষণ বসেছিলেন ওখানেই। পরে আন্দোলনকারীরা আলোচনার ভিত্তিতে ওদের ভেতরে যেতে দেয়। ওনারাই বলুন, অতক্ষণ তো বসেছিলেন অরবিন্দ ভবনের সামনে, একটা কেশাগ্রও স্পর্শ করেছে কেউ?

ছাত্রছাত্রীরা কী অমানুষ না দলের গুন্ডা যে খুন করবে?

তাছাড়া ঘটনার দিন রাত্রে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গেট বন্ধ। বাইরে গিটার, ভায়োলিন, স্যাক্সোফোন হাতে গান-বাজনা করছে ছেলেমেয়েরা। কোথায় প্রাণনাশের হুমকি, কোথায় তাণ্ডব চিহ্ন? (তবে ওনার রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে তারুণ্যের গানে ওনার হৃৎকম্পজনিত মৃত্যু হলেও হতে পারে; একেই কি প্রাণনাশের হুমকি বলছেন উপাচার্য!!)

(ঘ) বলছেন, নাকি বহিরাগতরা ঢুকেছিল ক্যাম্পাসে। গদিমোড়া চেয়ারে বসে ওনার দোসররা তো আরও কয়েকগুণ

বাড়িয়ে বলছে—ভয়ানক সব অস্ত্র নাকি ঢুকে পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে!

শুনলাম উপাচার্য হুমকি দিয়েছিলেন আগেই যে বাইরের লোক এনে আন্দোলন ভেঙে দেবেন। উনি নিজের মনে ভাবুন, 'বহিরাগত' কারা?

ওই বিশ্ববিদ্যালয়, ওই ক্যাম্পাস, প্রত্যেকটা ইঁট-বালি-ধুলোকণা ওখানকার পড়ুয়াদের। ঘটনার দিন অনেকক্ষণ ধরেই বাইরে জড়ো হয়েছিল শাসকের গুন্ডাদল। ক্রমাগত হুমকি দিয়েছে তারা—রাত নামলে দেখে নেবে। পুলিশের তো উচিত ছিল আগে গিয়ে ওইগুলোকে তাড়ানো। তা না করে ওদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের ওপর।

অসহায় হয়ে ছাত্ররা ডেকেছিল বন্ধুদের। সেই ডাক শুনে যারা মানুষ, তার যাবে না? বেশ করেছে গেছে। যারা গেছেন তারা দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছেন—বন্ধুর পাশে বন্ধু হয়ে গেছি, প্রেমিকার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রেমিক।

কিন্তু পুলিশের সঙ্গে ঢুকল যারা, তারা এসে বলুন সবার সামনে কেন গিয়েছিলেন ওইখানে ওই সময়ে? পুলিশ স্বীকার করুক তবে, আমরাও বিপন্নতাবোধে ডেকেছিলাম গেঞ্জি-পরা 'বহিরাগত' সঙ্গীদের।

এই অন্যায় তক্‌মার বিরুদ্ধে কেউ কিন্তু বলছে না সিঙ্গুরের ঘটনার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় ঢুকে চিৎকার করাটা অন্যায় হয়েছিল।

বলছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুকে বাঁচাতে যাওয়া প্রেসিডেন্সির বন্ধু যদি 'বহিরাগত' হয়, তাহলে সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে কী ছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী? কীই-বা ছিলেন 'স্বজন'-এরা, কীই-বা ছিলেন মেধা পাটেকর?

মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে আসবে এইটা স্বাভাবিক। ওইসব 'বহিরাগত'-টত বলে কোনো লাভ নেই। আসল কথা হল তাদের ভূমিকা কী ছিল ওই মুহূর্তে।

একটাও ছবি দেখান কেউ যেখানে সেইদিন যাদবপুরে যাওয়া ভিন্ন-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র-গবেষকেরা কোনোরকম অস্থিরতা তৈরি করেছে?

পুলিশ যদি বুটের লাথি মারে, আমরা কী বুক পেতে দেবো? আত্মরক্ষার অধিকার সবচাইতে মৌলিক অধিকার। হাত-পা ছুঁড়ে, আক্রান্ত বন্ধুর শরীর আগলে তাই করেছে ছাত্রছাত্রীরা। নিজেদের গা বাঁচাতে পালিয়ে যায়নি। দূর থেকে বসে টিভিতে যুদ্ধ দেখে মজা নেয়নি।

অস্ত্র যদি থাকত তবে ওই দানবগুলোর অন্তত একফোঁটা রক্তও ঝরত? কই, দেখান?

নাকি ওখানে সেদিন সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর সব অস্ত্রের ডেমো দেখিয়ে তুলে রেখেছিল ছেলেমেয়েরা?

(ঙ) ছাত্ররা নাকি আলো ভেঙে দিয়েছে।

কত বড়ো নির্বোধ হলে এই কথা বলা যায়! আলো ভেঙে কী সুবিধাটা পেল ওরা? অন্ধকারে ভয়ংকর সব অস্ত্রহাতে কটা পুলিশকে আহত করল?

বরং সবাই জানে এখন সব ফোনে ক্যামেরা থাকে। অত্যাচারের ছবি ছড়িয়ে গেলে সমস্ত সহানুভূতি চলে যাবে আন্দোলনকারীদের দিকে। এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ঠিক এমনটাই হয়েছে।

একটি ছাত্র সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে নিজের মোবাইলের ঘটনার সময়কার ভিডিও চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সমস্ত আলো প্রায় একই সঙ্গে নিভে যাচ্ছে, এবং এইসব আলোর নিয়ন্ত্রণ বন্ধ গেটের ওইপারে, অর্থাৎ উপাচার্যের কোর্টে!!

এছাড়া, পরের দিন ওইসব আলো ক্যামেরায় ধরে এনেছেন সাংবাদিকরা। সবকটাই অক্ষত।

তবে কী গুন্ডাদের হাত ধরে বাড়ি পৌঁছিয়েই অভূতপূর্ব তৎপরতায় লোক লাগিয়ে আলোগুলো বদলে দিলেন উপাচার্য? আহা কী কাজ পাগল লোক গো!!

(ছ) মাওবাদী—এ প্রসঙ্গে কথা না বাড়ানোই ভালো। একথা এত্ত বার এত্ত বার বলা হয়েছে এত্তদিন ধরে, যে আজকাল ঘোড়াও হাসছে। শুনলেই হাসছে।

উপাচার্যের গুণকীর্তন অনেক দূর গড়িয়ে গেল। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে ওনার শিক্ষকত্বের ছিটেফোঁটাও কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কোথাও? তারপর তো সম্মান।

প্রকৃত একজন শিক্ষকের কথা বলি। সৌমিত্র বসু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শনের শিক্ষক। সাম্প্রতিক পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। স্পষ্ট বলেছেন—এই নির্মম পদক্ষেপ মানা যায় না কিছুতেই।

উনিও আটকা পড়েছিলেন ঘেরাও-এ। পুলিশ বার করে নিয়ে আসে তাকে। তখন ভেবেছিলেন, ছাত্রদের কোনোভাবে সরিয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু পরে এই ঘটনা জানতে পেরেই তিনি পদত্যাগ করেন। প্রতিবাদ করেন। সর্বসমক্ষে তিনি জানিয়েছেন—ভুল হয়েছিল তার। বলেছেন, বিবেকের দংশনের কথা।

শিক্ষক হতে গেলে, অনেক জ্ঞানের চাইতেও এই 'বিবেক' থাকাটা বহুগুণ আবশ্যক। প্রণাম শিক্ষক সৌমিত্র বসু।

তুলনায় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না। কোনো অন্যায়

দেখিয়ে আরেক অন্যায়কে বিশ্লেষণ বা সমর্থন করা যায় না। তবু নিছক তথ্য-প্রদর্শনের খাতিরেই যারা 'শিক্ষক'দের প্রতি সম্মান নিয়ে চিন্তায় ফেসবুক ফাটিয়ে ফেলছেন, তাদের দু-একটা ঘটনা বলি।

কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ি ঘিরে ফেলে, তাকে বাইরে ডেকে, আঙুল তুলে হুমকি দেওয়াটা কী ধরনের সম্মানজ্ঞাপন? প্রশাসন নেই? উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেই? কলেজে বসে ভদ্রভাবে কথা বলা যায় না? বেশি দিন নয়, কাল-পরশুর ঘটনা। স্থান জলপাইগুড়ি (আনন্দচন্দ্র কলেজ)।

কিছু মাস আগে টিভিতে একটা ছবি দেখেছিলাম। এক কলেজের অধ্যক্ষের কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন এক ছাত্র। —এই সম্মান শিক্ষকের প্রতি!! কিছুদিনের মধ্যেই আবার এইসব 'দুষ্টু' ছাত্রদের প্রতি এসে পৌঁছেছে ওপরতলার আশীর্বাণী—ছোটো, সামান্য ঘটনামাত্র। নিছক দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছু না!

এছাড়া আরও আছে। শিক্ষিকার মুখে জলের জগ ছুঁড়ে ছিলেন এক 'তাজা নেতা'। তিনি আবার নতুন শিক্ষামন্ত্রীর প্রথম দিনে ঘরে গিয়ে চেয়ার দখল করে বসেছিলেন আপ্রাণ গম্ভীর-করে-তোলা মুখে (ঘরের বাকি সবাই যখন দাঁড়িয়ে!!)। অবশ্য উনি নিজেই বলেছিলেন যে, শিষ্য হয়ে গুরুর উন্নতির আনন্দে আটখানা হয়ে চলে গিয়েছিলেন ওইখানে!!

কিছুদিন আগেও তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের একটি সম্মেলনে মাননীয়া কৃষ্ণকলি বসু ভয়াবহ টুকলির প্রতিবাদে এক অধ্যক্ষের পদত্যাগ-করাকে 'বাড়াবাড়ি' বলেছেন। যারা টুকলি করেছিল, সেইসব দুষ্টুদের প্রতি তার, তার দলের সর্বাধিনায়িকার কী বক্তব্য?

এইসব কীর্তির পরেও যারা 'শিক্ষকের সম্মান' শব্দটা মুখে আনে, তাদের মানসিক সুস্থতার অবিলম্বে সি বি আই তদন্ত হওয়া উচিত ('সিট' হলে চলবে না!)।

অপপ্রচার (২) আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা নাকি অশালীন পোশাক ও ভঙ্গিমায় ছিল ওইখানে।

এই অশালীনতার মাপকাঠি কী—এইটা একটা বড়ো বিষয়। আমাদের দেশে তরুণ প্রজন্মের পোশাক-আশাকের ধরন এখনও অনেকটাই অর্থনৈতিক শ্রেণী ও সবচাইতে কাছের বড়ো শহর থেকে তার আবাসস্থলের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে মানসিকতা ও রুচির বিশ্বায়ন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, অন্তত ভারতবর্ষে।

তাছাড়া যারা এইসব বলছেন, তাদের অনেকেই নিশ্চয়ই মানেন একটি মেয়ে ছোটো জামাকাপড় পরলেই তাকে ধর্ষণের অধিকার জন্মায় না।

তাহলে যেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রসঙ্গ উঠছে, সেখানে ছোটো জামাকাপড়, বন্ধুর গলায় বান্ধবীর হাত—এইসব তুচ্ছ কথা কী আনা উচিত?

ভালোবেসে পিছন থেকে বন্ধুর গলাটা জড়িয়ে ধরা পাপ আর হাত-পা ধরে মাটির ওপর ছেঁচড়ে ছাত্র টেনে নিয়ে যাওয়া 'সংবেদনশীলতা'?

আর রাজনৈতিক উদ্দেশে যারা এইসব সংস্কৃতি আর শালীনতার কথা পাড়ছেন, তাদের মনে করিয়ে দিই একের-পর-এক কলেজে প্রতিষ্ঠা দিবস ও আরও নানাবিধ উপলক্ষে তাদের কর্মীদের উন্মত্ত নাচ—কোথাও নিজেরাই, কোথাও শিল্পী ভাড়া করে। সমস্ত কিছুর ভিডিও আছে। চাইলেই দেখতে পারেন রাতের মেহফিলে কেমন বাদশাহী মেজাজে টাকা ওড়াচ্ছেন একজন কিংবা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বছরের সেরা ছাত্র' কেমন জামা খুলে সুন্দর নাচ দেখাচ্ছে (আবার দেওয়াল থেকে কে যেন চেয়ে চেয়ে দেখছে সেই নাচ!)

এছাড়া ফেসবুক খুললেই দেখা যাচ্ছে # হোককলরবের পালটা দিতে # হোক_ক্যালানি! বাহ্ সংস্কৃতি!

অপপ্রচার (৩) কথা উঠছে, যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মাদক দ্রব্যের ব্যবহার রুখতে খুবই তৎপর বর্তমান উপাচার্য তথা কর্তৃপক্ষ। তাই তার বিরুদ্ধে এই ছদ্ম-আন্দোলন। এই আন্দোলন নাকি আসলে 'নৈরাজ্য, অপসংস্কৃতি ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার'এর পক্ষে যাদবপুরের একাংশ ছাত্রছাত্রীর তৎপরতা।

নানান সময়ে নানান জায়গায় ছাত্ররা অনেক অন্যায় দাবিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেন, যেমন ফেল-করা ছাত্রদের পাশ-করানোর দাবিতে, টুকলির অধিকারকে স্বীকৃতি-প্রদানের দাবিতে। এইসব আন্দোলনকে কোনোভাবেই সমর্থন করেন না শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যদি নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের ব্যবহার হয়ে থাকে, তাকে বন্ধ করাটা একদিনের প্রক্রিয়া নয়। সব ছাত্রই তো আর মারণ-নেশায় মজে নেই। যারা নেই, তাদেরকে পাশে পেতে হবে কর্তৃপক্ষের। ধৈর্য-সহকারে এগোতে হবে। কঠোরতা প্রয়োজন, কিন্তু প্রথম পর্যায়েই তা যদি হয়ে ওঠে অমানবিক, তাহলে তা ফলপ্রসূ হবে না কিছুতেই।

যদি উপাচার্য মাদক-বিরোধীতার খুব তৎপর মুখ হন, তাহলে এই ইস্যুতে একাংশ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরাই এসে দাঁড়াবেন ওনার পাশে। কই তারা? যিনি ছাত্রী-নিগ্রহের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে সময় চান, তিনি পড়ুয়াদের নৈতিকতার উন্নয়নে ব্রতী হবেন, বিশ্বাস করতে বেশ কষ্টই হয়।

আমাদের রাজ্যেরই আরেক উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বেসু। একসময় তার ক্যাম্পাসের অশান্তির খবর প্রায় রোজই দেখা

যেত সংবাদপত্রের পাতায়। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সমস্ত অস্থিরতা কাটিয়ে ক্যাম্পাসের শান্তির বাতাবরণ নজর কেড়েছে সকলেরই। কই ছাত্রছাত্রীরা নৈরাজ্যের পক্ষ নিয়ে এর প্রতিবাদ করছে না তো? উপাচার্যকে হেনস্থা করছে না তো। বরং যতটুকু জানি, সেই উপাচার্য অত্যন্ত আদর ও সম্মান পেয়ে থাকেন শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের থেকে।

মিথ্যাকথা বলে, এর-ঘাড়ে-ওকে চাপিয়ে পরিস্থিতি গুলিয়ে দিয়ে কোনো লাভ আছে কি?

আবার বলি, এই মুহূর্তে এই আন্দোলন এই উপাচার্যকে অপসারণের ও পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদ। তাকে সমর্থন করেই এই লেখা।

মাদকদ্রব্য-বিরোধী প্রচেষ্টা ও মানবিক পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন হয়েছে আমার।

অপপ্রচার (৪)। অসীম চট্টোপাধ্যায় যেহেতু গেছেন যাদবপুরে, প্রতিবাদ করেছেন, এর অর্থ হল ভেতরে ভেতরে নকশাল ক্রিয়াশীলতা শুরু হয়ে গেছে। কেন গেলেন অসীম? উনি তো ছাত্র নন। অর্থাৎ বহিরাহত।

যারা বলছেন এ-কথা, তারা ভুলে যাচ্ছেন কেন, একদিন এই অসীমবাবুই নির্বাচন লড়েছিলেন তৃণমূলের সমর্থনে, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন নিজের। বহুদিন ধরেই উনি বাংলার একজন প্রতিবাদী মুখ। গুণী মানুষ। বিদগ্ধ বিশ্লেষক ও প্রাবন্ধিক। সারদা কেলেঙ্কারীতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষজনের হয়েও উনি লড়ছেন।

এখানেও ওই একই কথা। মানুষ বিপদে পড়লে আরেকজন মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম আর্তের পাশে এসে দাঁড়ানো। মানবিকতা যুক্ত হওয়ার কথা বলে, আর ক্ষুদ্র কায়েমী শক্তি, অত্যাচারী শাসককুল সর্বশক্তি দিয়ে চারিয়ে দিতে চায় বিভাজন।

নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পর নোয়াম চমস্কির বার্তা নিয়ে হেঁটে ছিলেন মানুষজন। শারীরিকভাবে চমস্কি না থাকলেও, বাংলায় এসে পৌঁছেছিল তার গভীর উদ্বেগ। এই উদ্বেগটুকুই একজন মানুষের মানুষ হয়ে থাকা। একে রাজনৈতিক কুৎসায় রাঙিয়ে ছোটো করা অন্যায়।

অনেকেই ভাবছেন মাত্র তিন বছর আগেই 'পরিবর্তন'এর আকাঙ্খায় এক বিপুল ঢেউ এসে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের একছত্র শাসন। মানুষের গভীর প্রত্যাশায় ভর করে, স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে মসনদে এল নতুন সরকার।

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই এই তার রূপ! তবে এর পরে কী? এর পরেও আবার কীসের পরিবর্তন? আবার সিপিএম? নাকি বিজেপি?

অর্থাৎ আজকের প্রতিবাদের অভিমুখ ঠিক কী?

আমাদের সমস্যা হল, আমরা সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য-ব্যাখ্যার জন্য রাজনীতির পথে ভাবতে চাই। সব উন্নয়নের প্রত্যাশা সঁপে দিই রাজনীতির কাছে। আর ব্যর্থতার দায়ভার চাপাই রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের ওপর।

কিন্তু সমাজের সব গুণগত উন্নয়ন রাজনীতি-নির্ভর নয়। তাই এইবারের পরিবর্তনটিকে খুঁজতে গেলে শুধুই সিপিএমের বদলে তৃণমূল বা তৃণমূলের বদলে অন্য কেউ—এই দিকে তাকালে হবে না।

আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও ব্যাপ্ত জগতের সঙ্গে জুড়ে আছি সত্যের মাধ্যমে। সত্যের যথার্থ অনুভবই আমাদের ন্যায়ের পথে চালিত করে। সেই অনুভবের নিরিখে যে প্রতিক্রিয়া, ঔচিত্যের সংজ্ঞা মেনে চলে সে-ই।

চারপাশে ঘটে চলা নিরন্তর প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠা সামাজিক সত্যগুলিকে আমরা অনুভব করি বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা। যেমন খুব দূরের কোনো অঞ্চলে কোনো অশান্তি ঘটলে তার খবর আমরা পাই লোকমুখে, মিডিয়ার মাধ্যমে। এখন সব মাধ্যম-বাহিত খবরেই কিছু না বিকৃতি ঢুকে পড়ে। আর আমরাও আমাদের ভেতর পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবে গেঁথে যাওয়া কিছু বিশ্বাস, কিছু মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের পছন্দমতো মাধ্যম দ্বারা বাহিত খবরটিকে গ্রহণ করি। এতে সত্যের যথার্থ অনুধাবন হয় না।

সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে দিনের বেশির ভাগ সময় যে চ্যানেল চলে, একজন তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে হয়ত সে চ্যানেল খোলাই হয় না। পাড়ায় পাড়ায় এক অদ্ভুত পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয় মানুষজনকে—ও তৃণমূল, ও সিপিএম, ও বিজেপি, ও কংগ্রেস। এবং 'বিরোধী' মত মানেই তা অবান্তর ও অভিসন্ধিমূলক।

অর্থাৎ এক ধরনের অন্ধত্ব এসে ঘিরে নেয় আমাদের সত্য অনুধাবনের প্রক্রিয়াটিকে। আমরা একপক্ষের কথাই কেবল গ্রহণ করি, মেনে চলি। সেই মতো কাজ করি। এর থেকেই আসে প্রশ্নহীন আনুগত্য; যা থেকে জন্ম নেয় নিরঙ্কুশ দলতন্ত্র।

যাদবপুরে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে এই যে একের-পর-এক মিছিল, তাদের ভেতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি কেন খুঁজতে চাইছেন টিএমসিপি তথা তৃণমূল সমর্থকেরা? কারণ তারা ভয় পাচ্ছেন যে, এই প্রতিরোধ আসলে তাদের দলের বিরুদ্ধে। এবং স্বাভাবিকভাবেই তা নিশ্চয়ই সিপিএম-এর সমর্থনে।

কেন তারা ভাবতে পারছেন না কোথাও ভুল হয়েছে তাদের সরকারের? কেন ভাবতে পারছেন না, অন্ধ আনুগত্য নয়, ইস্যু-ভিত্তিক সমর্থনের কথা?

যে দল যে ইস্যুতে সঠিক, যুক্তিযুক্ত অবস্থান নেবে, সেই ইস্যুতে আমি সেই নির্দিষ্ট দলটিকে সমর্থন করব। সমর্থন করব ভালো কাজকে, সামগ্রিকভাবে দিনের পর দিনে চোখ বন্ধ করে কোনো একটি দলকে নয়।

এই আন্দোলন শ্লীলতাহানির ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি তুললে—সমর্থন। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধতা করলে—সমর্থন। দোষীদের আড়াল করলে—প্রতিবাদ। গোপনে মাদক-ব্যবহার চালু রাখতে চাইলে—প্রতিবাদ।

বর্তমান সরকার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যাসন্তান-বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইলে—সমর্থন।

সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত কাউকে আড়াল করতে চাইলে—প্রতিবাদ।

আমার মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতি এক সুদীর্ঘ অন্ধত্ব বিনাশের ইঙ্গিত দেয়, অন্তত আংশিক হলেও। যাদবপুরের ছবি ছড়িয়ে গেছে দুনিয়া জুড়ে। আর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যপ্রবণ বিকৃতি নেই। প্রায় নিজের চোখেই সব দেখে যন্ত্রণায় রাগে জ্বলে উঠছেন সকলে।

আন্দোলনকারীরা কেউ কিছু ভুলছেন না ২০০৫-এর ১১ই জুন কী করেছিল তৎকালীন বামপন্থী সরকার। কেউ ভুলছে না নন্দীগ্রাম। তাই এই মিছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএম-এর, একথা বলা অমূলক।

সাম্প্রতিক বর্বরতার প্রতিবাদের সামিল হয়ে আসলে সংকীর্ণতা থেকে এক উদার প্রাঙ্গণে পা রাখছেন বহু মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রযুবকেরা, যাদের মনোভঙ্গি ও সক্রিয়তাই একটি সমাজের দিক নির্দেশ করে। এতে করে পরের নির্বাচনে কারা জিতবে এই প্রশ্নের সমাধান হয় না। কিন্তু অশান্তি-উদ্ভূত আলোড়নের ফলে, উত্থিত নানান প্রশ্ন ও গণ-আলোচনার ফলে যে মন্থন, যে যুক্তি-বিনিময়, তার দ্বারা আমাদের সমাজ-মানসিকতা ও বোধের পরাধীনতা ঘুচে উন্নতি হয় অনেকটাই। এ-ই হল নতুন পরিবর্তন।

এই আন্দোলন আসলে বার্তা দেয়—ভবিষ্যতের কোনো শাসক, কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর যদি হিংস্র অত্যাচার নামিয়ে আনে, তার প্রতিবাদ হবে। দলমত-নির্বিশেষে গর্জে উঠবে ছাত্রদল। গর্জে উঠবে সমাজ।

২০ সেপ্টেম্বরের মিছিলে আসার জন্য কোনো প্রলোভন ছিল না। ছিল না কোনো চোখ-রাঙানি। তবু বাংলার প্রত্যন্ত কোণ থেকে মানুষ এসে ভরিয়ে তুলেছে বাংলার রাজপথ। স্থানীয় রাজনৈতিক গুন্ডাদের শাসন মানেনি, বৃষ্টি মানেনি। কেউ কাজ কামাই করেছে। কেউ ক্লাস করেনি। অসুস্থ কোনো মানুষ একদিন পিছিয়ে দিয়েছে ডাক্তার দেখানো। কেন?

কারণ তারা অনুভব করেছে 'হয় সিপিএম নয় তৃণমূল নয় বিজেপি নয় কংগ্রেস'—এই অতিসরলীকরণ আর নয়। এতে করে পিছিয়ে পড়তে হয়। মাথা উঁচু করে চলতে গেলে, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে হলে দলের বজ্রমুঠি থেকে বেরোতেই হবে।

শাসক চায় প্রতিরোধহীন এক্তিয়ার। ২০০৫-এ তাই মধ্যরাত্রে পুলিশের গুন্ডামি দেখেছে যাদবপুর। ২০১৪-এও তাই।

আসলে কোনো নির্দিষ্ট আন্দোলন নয়। শাসকের লক্ষ্য হচ্ছে ওই বিরোধী স্বর। ছাত্রসমাজের প্রতিস্পর্ধা।

আর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করতে করতে, অন্ধ হতে হতে তারা খেয়াল করে না কোথায় পা রাখছে তারা।

যাদবপুরের মাটি এখন আকীর্ণ অঙ্গার। কোনো অন্যায়কারীর একবিন্দু জমি নেই সেখানে।

আসুন, যে যেখানে আছি সেখান থেকে বুক দিয়ে রক্ষা করি এই দুর্দম আন্দোলন, যা পুলিশের বুট ও লাঠির মুখ থেকে বিচ্ছুরিত করে নির্ভীক আলো, রোদ বৃষ্টি হুমকি কিছুতে দমে না। ক্রমশ বেড়ে ওঠে। আর বেড়েই চলে . . .

পাশবিক

সঞ্জয় সিংহ

যূথের দখল নিতে লড়ে যায় মদ্দা হরিণ
হত্যাও করে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ
উলুখাগড়া বন থেকে নির্ভয়ে তাকিয়ে দেখে
মৃগের দঙ্গল। পশুদের একই প্রজাতিতে
হত্যার বড়ো কোনো আয়োজন নেই।

সঙ্গিনীকে জিতে নিতে পশুদের নানান তরিকা,
নিশ্চিন্ত সঙ্গিনী মজা দেখে। ত্রাস নেই তার।
নগ্নতা বা সঙ্গম সহজ ও স্বাভাবিক বলে
ধর্ষণ ও হত্যা নয় পশুদের রীতি।

পশুরা পোশাক-পরা-সভ্যতার উপযুক্ত নয়।
বানানো পোশাক ছেড়ে
মানুষ কি কোনোদিন প্রকৃতই পাশবিক হবে?

বৃহত্তম বাম জোটের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই

বর্ণালী মুখার্জী

এ রাজ্যে ১৭টা বাম দল একসঙ্গে বিজেপিকে মোকাবিলা করতে চাইছে। এই লেখার আলোচ্য বিষয় হল, জোটটা আক্রমণের হাতিয়ার হবে নাকি স্রেফ রক্ষণাত্মক হাতিয়ার। এই প্রসঙ্গে ঢোকার আগে কিছু ভূমিকা সেরে নেওয়া যাক।

মোদীকে জনগণ জিতিয়েছেন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী, শক্তিশালী সরকার ও শক্তিশালী দেশ গঠনের জন্য। থোড়-বড়ি-খাড়া-র রাজনীতির বদলে জনগণ একটা গা ঝাড়া দেওয়া নীতি চাইছিলেন। এ দেশের অর্থনীতিতে যে রক্তক্ষরণ চলছে তাকে মোকাবিলা করে 'জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' নিতে সে আমেরিকাকে টক্কর দেবে, মোদীর প্রতি তাদের এমনই আশা। তাই মোদী আমেরিকাতে গিয়ে ওবামার চোখে চোখ রেখে কথা বললে জনগণ খুশি হন। বিদেশি মুদ্রার তীব্র সংকট ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাও সরকারকে বাধ্য করেছিল এদেশের সবচেয়ে দামি সম্পদগুলি বিক্রয় করে বিনিময়ে ডলার রোজগারের পথ খুলতে। বামেরা সেদিনই বলেছিল যে এই পথ ভ্রান্ত, যা আজ প্রমাণিত হয়েছে ভারতবাসীর কাছে। সুতরাং একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী যদি সম্মান ফেরাতে পারে, জনগণের সেই আশা! যদিও ভারতকে বলশালী করতে হলে তার মুদ্রাকে ক্ষমতাশালী করতে হয়, সুতরাং ডলার আর টাকাকে সমান আসনে বসাতে হয়, বিদেশী বাণিজ্যের ফলে যাতে এদেশের ক্ষতি না হয়। এক কথায়, এদেশে মজুত বিরাট পরিমাণ সোনা দেখিয়ে, ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে হয়। প্রয়োজনে ব্রিকস বা সার্ক জোটের সাহায্য নিতে হয়, ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের মতোই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হয় আমেরিকাকে। নরেন্দ্র মোদী আদানি-আম্বানিদেরই চটিয়ে কালো টাকা উদ্ধার করার সাহস পান না, তিনি আবার টক্কর দেবেন আমেরিকাকে! কংগ্রেস আমলের সেই থোড়-বড়ি-খাড়ার রাজনীতি চালিয়ে আরও আরও ভর্তুকি দিয়ে নন পার্ফর্মিং অ্যাসেটওয়ালা ব্যাংকগুলিকে চাঙ্গা রাখা হচ্ছে। সারদা তো চুনোপুঁটি, সারদাকে ভর্তুকি দেওয়া হয়নি বলে আমার সব কেলেঙ্কারি জেনে যাচ্ছি। অথচ ব্যাংকগুলির মাথারা সারদার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা নয়ছয় করেছে, তা জানতেই পারছি না কারণ সরকার ভর্তুকি দিয়ে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমান ভারতের মতোই এমনই বৈপ্লবিক আকাঙ্খা নিয়েছিলেন জার্মান জনগণ, এবং শেষ পর্যন্ত হিটলার সেই আকাঙ্খাকে ভাষা দিয়েছিলেন আমেরিকা-ব্রিটেন ফ্রান্সকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে, ভার্সাই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে। মোদীর হিটলারের মতো হওয়ার শখ আছে অথচ হিটলারের মতো আমেরিকাকে টক্কর দেওয়ার সাহস নেই!!! অতএব দ্বিতীয় হিটলার প্রহসন, ভজনে গোবিন্দি মোদীর তড়পানি ওই পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধে! সামরিক ক্ষেত্রের তিন প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে মোদী বলে দিয়েছেন যে, এখন পরিস্থিতির চাপ তাদের বড়ো যুদ্ধের দিকে যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু তাতে তারা যেন রাগ না করেন, পাকিস্তানকে টাইট দিতে এদেশে সর্বক্ষণ একটা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখা হবে, ঘুষঘুষে জ্বরের মতো! কংগ্রেস আমলের মতো শুধু সংকটে পড়লে যুদ্ধ আর বাকি সময় বর্ডার টেনশনহীন, এরকমটা হবে না। পাকিস্তান ও তাদের এজেন্ট, অর্থাৎ মুসলিমদের টাইট দিতেই হবে। আমেরিকাকে শায়েস্তা করতে স্বাধীন মুদ্রা গড়তে না পারলেও, পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে সমাজ জুড়ে আর এস এস-দের গুন্ডামিকে খোলা ছাড় দেওয়া হবে, দেশজুড়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিরাট মেরুকরণের জন্য আরএসএস-এর মাধ্যমে দুর্বৃত্তায়নের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। অতএব আজ তাদের প্রধান হাতিয়ার শ্রমসংস্কার বা সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রকে বেচে দেওয়া বা ডিজেলের ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া নয়। তাদের প্রধান হাতিয়ারগুলি হল ফ্যাসিস্ট মতাদর্শকে সমাজে চ্যাম্পিয়ন করা যার অন্যতম স্লোগান হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। যা আসলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। আমাদের দেশের আইনের যে মূল দর্শন—আইনের চোখে সকলে সমান নয়, বড়োলোক বা সবল যদি অপরাধ করে তার যা শাস্তি, দুর্বল বা গরিব মানুষ যদি অপরাধ করে তার শাস্তি এক নয়—এই নীতিকেই ধ্বংস করার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় হাতিয়ার ৩৭০ ধারা বাতিল। সে প্রসঙ্গে গভীরে আলোচনা আমরা করবো, কিন্তু এক কথায় বলা যায়, ৩৭০ ধারাই হল কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে রাখার একমাত্র উপায়। যে ধারার মধ্য দিয়ে নেহরুর সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার চুক্তি সফল হয়েছিল, জবরদস্তিমূলক ঐক্য নয়, ঐচ্ছিক ঐক্যের পথে গিয়েছিল কাশ্মীর, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে-চুক্তির জোরে তারা পাকিস্তানে না গিয়ে এদেশে থেকে গিয়েছিলেন, তা বাতিলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরকে দেশের বাইরে বার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া এ আর কিছু নয়। মুসলমান মানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুসলমান মানেই আরো কত কি—হিন্দুস্তান নাকি হিন্দুদেরই, এই জাতীয় আওয়াজ তুলে তারা এই দেশের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে চাইছে। মোদীদের জয়যাত্রা রুদ্ধ হয়ে যাবে যদি না তারা পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে পারে, যদি না এ-রাজ্যের সমন্বয়ের,

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশকে তারা ধ্বংস করতে পারে। আগামী বনগাঁ নির্বাচনের আগে হয়তো ছোটোখাটো দাঙ্গাও তারা করতে চাইবে। আর এইসবের পথ প্রশস্ত করেছেন মমতা ব্যানার্জী বিগত তিন বছর ধরে। এরাজ্যে যত গুন্ডামি তৃণমূল বাহিনীকে দিয়ে করানো হয়েছে তাতে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছিল মুসলিম সমর্থকদের। যাতে বিজেপি গোকুলে বেড়ে উঠতে পারে। ধর্ষণ কাণ্ডের পরও আইনের শাসন জারি হয়নি এই রাজ্যে, যাতে আরএসএস বাহিনী মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে আগামী দিনে সমাজের অভিভাবক হয়ে উঠতে পারে, নিজেদের চূড়ান্ত তালিবানি নীতি নিয়ে।

মুসলিম মানুষের বিরাট আশীর্বাদ পেয়ে মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মমতা ব্যানার্জীর ফ্যাসিস্ট চরিত্র অনুযায়ী তাঁকে এখন সংখ্যালঘু জনগণের সর্বনাশ করতেই হবে। হিটলার ক্ষমতায় এসেই প্রথমে ইহুদি বা কম্যুনিস্ট হত্যা করেননি, আগেই হত্যা করেছিলেন নিজেদেরই দলের নেতাদের। আগেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেননি, আক্রমণ করেছিলেন পোল্যান্ড। অর্থাৎ ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় এসে নিজেদের বন্ধুদেরকেই আগে পথ থেকে সরান, দেয় প্রতিশ্রুতিগুলি যাতে পালন করতে না হয়। মমতা ব্যানার্জীও ক্ষমতায় এসে আগেই তাদের সরাবার ব্যবস্থা করলেন যাদের সাহায্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার আক্রমণের লিস্ট সাজালে এরকমটা দাঁড়াবে—প্রথমে কিষেণজী (যাঁর সাহায্যে তিনি ৪১টা বিধানসভা আসন জিতেছিলেন, প্রতিশ্রুতি ছিল বন্দী মুক্তি, তাঁকে মেরে ফেলা হল), তারপর সিঙ্গুর (যা ছিল তার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চাবিকাঠি, প্রতিশ্রুতি ছিল জমি ফেরত দেওয়ার, জমি ফেরত দেওয়ার বিষয়টিকে বিশ বাঁও জলে পাঠিয়ে সিঙ্গুরকে শ্মশানে পরিণত করা হল), তৃতীয় নম্বরে এলেন বিমল গুরুং (প্রতিশ্রুতি ছিল গোর্খাল্যান্ড বানিয়ে তাকে 'প্রধানমন্ত্রী' করার, এখন তার বাড়িতে সকাল-বিকেল পুলিশ যাচ্ছে আর বামফ্রন্ট আমলের পুরোনো সব কেস পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে), চতুর্থ নম্বরে থাকলো পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা (যাদের বিরাট সমর্থনে এবার দিদি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এখন তাদের দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, ইচ্ছুক ধর্ষিতা ও অনিচ্ছুক ধর্ষিতা, সিনেমা আর্টিস্টদের হাতে রাজ্য ও দেশকে তুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশজুড়ে মোদী-মমতার নেতৃত্বে ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সেক্স ট্যুরিজম চালু করার চেষ্টা চলছে)। সকলে একে একে গেল। সুতরাং এখন দিদির পথের কাঁটা হিসেবে আর মাত্র এক দল 'বন্ধু' বাকি আছে—পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষ, যাদের বিরাট সমর্থন ছাড়া তিনি মুখ্যমন্ত্রীই হতে পারতেন না। অতএব এই অংশটির সর্বনাশ করতে হলে মমতা ব্যানার্জীর সামনে এখন একটাই পথ, মুসলিমদের বিপদে ফেলো। যত তারা বিপদে পড়বে ততই পরিত্রাতা হিসেবে হাজির হবেন তিনি! আর বিপদে ফেলার জন্য বিজেপি তো রইলই!

১৭ দলের জোট প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই জোটের লক্ষ্য তিনটে হতে পারে—এক, ফ্যাসিবাদীদের হারিয়ে দেশের বুকে কংগ্রেসকে নয় বরং নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। দুই, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা কিন্তু তার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা পুঁজিবাদকেই, অতএব হিন্দু রাষ্ট্রের বিপদকে টিকিয়ে রাখা। তিন, দিল্লিতে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেওয়া, সাম্প্রদায়িকতার ও হিন্দু রাষ্ট্রের বিপদকে চিরতরে বিলুপ্ত করা। এর মধ্যে কোনটা ভালো বা হওয়া উচিত, বামপন্থীরা এভাবে বিচার করে না, কোন্টা সম্ভব বা স্বাভাবিক এভাবেই বিচার করা হয়। স্বাভাবিকতা বা বাস্তবতা যেহেতু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তাই ইতিহাসেই ফেরা যাক।

পুঁজিবাদের চরমতম সংকটকালে, একইসাথে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতির জন্ম হয়। একজনকে মেরে ফেলেই অন্যজনের জন্ম হয়। আবার মৃত্যুর পর তাকে সমাজতন্ত্রের জন্যই রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, কম্যুনিস্টরা প্রস্তুত থাকলে পুঁজিবাদে ফেরত যাওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ মোদী যদি ভারতে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে তবে তাকে মোকাবিলা করার জন্য বামেরা নিশ্চয়ই রাস্তায় নামবে, কিন্তু তা হবে ভারতের বুকে যাতে আর কখনো হিন্দু রাষ্ট্রের আওয়াজ উঠতে না পারে, যাতে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়কে উৎখাত করা যায়, যাতে সমাজতন্ত্র দিয়েই ফ্যাসিবাদকে প্রতিস্থাপন করা যায় সেই উদ্দেশে। আমরা দেখেছি ফ্যাসিস্টরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল যে সময়ে, সেই ১৯২১ বা ১৯৩৩ সালে পিসিআই (ইতালির কম্যুনিস্ট দল) বা কেপিডি-এসপিডিকে (জার্মানির দুই কম্যুনিস্ট দল) প্রায় মেরে ফেলেই জন্ম হয়েছিল মুসোলিনি-হিটলারের। আবার হিটলার-মুসোলিনির মৃত্যুর পর সেইসব দেশে শুধু নয়, ইয়োরোপ জুড়েই লাল ঝান্ডা উড়েছিল, জোট সরকারের মধ্য দিয়ে হোক বা একক সরকারে গিয়ে হোক। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে সেই যুগটা আলাদা ছিল, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তখন শক্তিশালী ছিল, তুলনায় ২০১৪ সালটা ফ্যাসিবাদ বা সমাজতন্ত্রের, কোনো পরিস্থিতির জন্যই অনুকূল নয়, কারণ তাদের মত অনুযায়ী পুঁজিবাদ অতটা সংকটগ্রস্তই নয়। আবার এমন মতও আছে, ''শ্রমিকের শক্তি নয়, বরং তাদের দুর্বলতাই ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ''! ইহুদীরা মানবতার শত্রু, মুসলমানরা দেশের শত্রু, এই ধরণের মতাদর্শের বিকাশ ঘটা মানেই জনগণের অবস্থা পশ্চাদপদ, অতএব ১৭ দলের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জোটের আক্রমণাত্মক হওয়া অসম্ভব। যদিও ইতিহাস ঠিক এর বিপরীতটাই প্রমাণ করেছে। শ্রমিক

শ্রেণী যখন অত্যন্ত শক্তিশালী, নিজ অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত জঙ্গি এবং তারা অর্থনীতি ও রাজনীতির একটা মৌলিক রূপান্তরও চাইছেন, অথচ কম্যুনিস্টরা তাদের শক্তিশালী ভাবতে পারছেন না, তখনই ফ্যাসিস্টরা সেই শক্তিকে ঠিক চিনে নিয়ে তাকে ব্যবহার করতে পেরেছে। ব্যবহার করার রাস্তায় জনগণকে আস্তাকুড়ের মতাদর্শে দীক্ষিতও করা হয়েছে, তবে তা আগে নয়। জার্মানিতে জনগণ কতটা সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ হল হিটলারের ফুয়েরার হিসেবে উত্থানের প্রাকলগ্নেও, এসপিডি সরকারের হাজার অপদার্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও, জনগণ কোনো প্রতিক্রিয়ার উত্থানের মধ্য দিয়ে হিটলারকে ক্ষমতায় আসতে দিতে চাননি। অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের সবরকম সুযোগ তারা দিয়েই যাচ্ছিলেন। এমনকি রাইখস্ট্যাগ পোড়ানোর ঘটনাটিতেও জনগণ খুব বিচলিত হননি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন, জনগণের চাপে, আদালতে বিদেশী সাংবাদিকদেরকেও প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হয় হিটলার। একমাত্র মূল অভিযুক্তকেই প্রাণদণ্ড দেওয়ায় হয়, আর ডিমিত্রভের মতো বাম সব নেতাকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তারা। হিটলারকে এককভাবে ক্ষমতায় না এনে, তাকে জোট সরকারেই বেঁধে রেখেছিলেন জার্মান জনগণ। কিন্তু শেষ পর্যন্তও যখন কেপিডি এবং এসপিডির সমবেত ভোট হিটলারের ভোট থেকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনো জোট হল না, ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল করার দাবি বাম মহল থেকে উঠলো না, তখনই ভার্সাই চুক্তি বাতিলের বৈপ্লাবিক পদক্ষেপ নিয়ে গণভোটে ফুয়েরার হওয়ার মতো ৯৫% সমর্থন আদায় করলো হিটলার। একইভাবে ১৯৯২ থেকে ২০১৪, এই দীর্ঘ পর্যায় জুড়ে ভারতের জনগণের শুভবুদ্ধির পরিচয় এবং তাদের সচেতন নির্বাচনি ভূমিকা বারবার আমরা দেখেছি। বার বার জোট সরকার, দ্বিদলীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে কার্যত বাতিল করে দেওয়া, সবই তারা করেছেন। এত কিছুর পরেও যদি তাদের অসচেতন বলা হয়, তবে কি আর মোদীর উত্থানের জন্য জনগণকে দোষ দেওয়া চলে! অর্থাৎ জনগণের অবস্থা আমাদের জোটের আক্রমণাত্মক হওয়ারই সহায়ক। সে তারা যতই তৃণমূলকে জেতান না কেন। কেউ প্রশ্ন ছুঁড়তেই পারেন, শুধু জনগণের অবস্থা দিয়ে তো হবে না, পুঁজিবাদের সংকট কতটা তার উপর নির্ভর করবে আক্রমণাত্মক হওয়ার বাস্তবতা। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পুঁজিবাদ কার্যত আর নিজের বাজার অর্থনীতির ওপর টিকে নেই। টিকে আছে মার্শাল পরিকল্পনা, গ্যাট চুক্তি, এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের চুক্তি, বিলাস ব্যবসা ও অস্ত্র ব্যবসার মতো মূলত অর্থনীতি বহির্ভূত কার্যকলাপের ওপর। বিলাস ব্যবসার প্রয়োজনে সম্পদের কেন্দ্রীভবন সেদিন থেকেই আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলাফল নয়, বরং উদ্দেশ্য। যার অর্থ পুঁজিবাদ কার্যত সেদিন থেকেই মৃত। সমাজতান্ত্রিক উপরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে সে টিকে থেকেছে, সংসদীয় গণতন্ত্রের সাহায্যে টিকে থেকেছে। কিন্তু সেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে মোকাবিলা করার কৌশল বা নীতি কম্যুনিস্টরা আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু আজ পুঁজির অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সংকট এতই গভীর যে সেটুকুও সে পারছে না। কোথাওই বড়ো যুদ্ধ করে নিজেদের সংকট মেটাতে পারছে না। ছোটোখাটো দেশও আমেরিকাকে টক্কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। পাকিস্তানের কাছেও আমেরিকাকে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে দ্রোণ পাঠানোর জন্য। কোনো দেশকে কব্জা করতে ভেতরে গৃহযুদ্ধ বাঁধানো বাধ্যতামূলক হয়ে যাচ্ছে। সিরিয়া বা ইরানেও তারা ব্যর্থ। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনই একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সর্বত্রই মোদী-ওবামারা সামরিক প্রধানদের বোঝাচ্ছেন, এখনই বড়ো যুদ্ধ অসম্ভব। সবচেয়ে বড়ো কথা এখন সংসদীয় গণতন্ত্র এমনই এক অবস্থা তৈরি করেছে যেখানে বিরোধী পক্ষ মানেই সে কমবেশি সমাজতান্ত্রিক! মমতাও বিরোধী নেত্রী হিসেবে বাম স্লোগান তোলেন, বিজেপিও বিরোধী হিসেবে দেশের কালো টাকা উদ্ধারের কথা বলে। ভারতের মতো দেশে প্রচুর দল, এই রাজনৈতিক মুক্ত প্রতিযোগিতা একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সোভিয়েতের পতনের পর সমাজতন্ত্র বনাম সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব শেষ হয়েছে বলে তারা যে আহ্লাদ করেছিল, তা এখন আতঙ্কে পরিণত। এখন এই দ্বন্দ্ব একটি দলেরই মধ্যে মাথা তুলছে, দলগুলির পরস্পরের মধ্যেই যেন সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে! সরকার পক্ষ আর বিরোধী পক্ষের মধ্যে দিয়ে এই বিরোধ রূপ পাচ্ছে। অতএব এবার পুঁজি তার শেষ আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে, ভারতের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশে প্রচুর টাকা ঢেলে আরএসএস-এর মতো ফ্যাসিস্টদের জেতাচ্ছে। জনগণের ‘অ্যান্টি ইন্‌কাম্বেন্সি’র ওপর শুধু ভরসা রাখতে পারেনি তারা। একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলে সমাজতন্ত্রের এই আত্মাকে তারা দূর করতে চায়। দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে একচেটিয়া পুঁজির সমস্যা হয় না, গুজরাটের দাঙ্গা তাদের সাহায্যই করেছিল, প্রশ্নাতীত এক উন্নয়নের ছবি তারা আঁকতে পেরেছিল দেশ জুড়ে। অতএব, ফ্যাসিবাদের আগমণ বার্তা পুঁজিবাদের দুর্বলতাকেই দেখাচ্ছে। যদিও প্রশ্ন এখানেই শেষ হয় না। ইতিহাসেরই সাহায্য নিয়ে কেউ কেউ এখনো বলবেন, হিটলারের পতনের মধ্য দিয়ে সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। দেখা যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, হিটলারের পতনের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সমস্ত সুযোগ চলে আসে। দেশে দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ইউরোপ

জুড়ে সরকারগুলিতে বামেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর্থিক নীতিতেও জাতীয়তাবাদী দলগুলি বাম কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকারকে হিটলার বা মোদীরা যেমন ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান করার কাজে ব্যবহার করেছে বা করতে চায়, সেই পথে যাওয়া গেল না। বাম বা বাম গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী বলে আখ্যা দেওয়া হল না, বরং তাকে পরবর্তীকালে 'ইউরো কম্যুনিজম'-এর আওতায় ফেলা হল। পরে, ১৯৭৬ সালে ইতালিতে, যেখানে পিসিআই সরকারে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেনি, এবং একই দশকে পর্তুগালের কম্যুনিস্টরা তা গ্রহণ করেনি। এই ঐতিহাসিক ভুলের ইঙ্গিত আমরা পাই যখন দেখি সংসদীয় গণতন্ত্রের আমলেই সার্বজনীন ভোটাধিকারকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করার যে পরামর্শ কমরেড এঙ্গেলস ১৮৯৫ সালেই দিয়েছিলেন, তাকে অনেকেই ওনার বুড়ো বয়সের ভীমরতি বা কাউটস্কির প্রভাব বলে জ্ঞান করেছিলেন। যদিও ১৮৯৫-র অনেক আগেই, ১৮৭৪ সালেই তিনি আয়ারল্যান্ডের সাংসদের বিপুল উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নির্বাচনি সাফল্যে তিনি বরাবরই খুব উৎসাহিত ছিলেন। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গঠিত এই সবকটা সরকারকেই তিনি কতটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি রূপায়নের হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছিলেন। এমনকি মাও সে তুঙ আমেরিকাকে মধ্যে রেখে কুয়োমিন্টাং-কম্যুনিস্টদের জোট সরকার ও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ খোলা রেখেছিলেন। লেনিন ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের সরকারে আসার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। অতএব ১৭ দলের জোটের দায়িত্ব বর্তায় বিজেপিকে হারিয়ে, শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকার ব্রত নিয়ে দিল্লিতে সরকারে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা। বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে জোট সরকার হলেও তাদের ন্যূনতম কর্মসূচী হবে এদেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের কর্মসূচি, যে চাহিদা থেকে জনগণ মোদিকে জিতিয়েছে। সেক্ষেত্রে বলপূর্বক বাধা এলে তাকে মোকাবিলা করা মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত পুরোনো রাষ্ট্রক্ষমতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে নতুন দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। অথচ সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজও ব্রাত্য, আজও সকলেই আমরা খ্রুশ্চেভের ছাত্র-ছাত্রী। খ্রুশ্চেভের তত্ত্ব অনুযায়ী আজও আমরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় সরকার বানানোর বিরুদ্ধে, যতদিন না সশস্ত্র পথে ক্ষমতা দখল হচ্ছে ততদিন কংগ্রেসদেরকে বা ওবামাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার পক্ষে। এহেন চিন্তার প্রভাবেই কম্যুনিস্ট পার্টির ১৯৫২ সালের নির্বাচনি ইস্তাহার বদলে হয়েছিল ১৯৫৭ সালের নির্বাচনি ইস্তাহার! তাই কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গে যেসব বাম গণতান্ত্রিক সরকারগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলো কোনোটাই পরিকল্পনামাফিক নয়, বরং হঠাৎ করেই সিপিআই-এর হাতে চলে আসে। সদ্য স্বাধীন ভারতে বহু আক্রমণ নামিয়েও সিপিআই-কে প্রধান বিরোধী পক্ষ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি কংগ্রেস। এতদ্‌সত্ত্বেও, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে বা কেন্দ্রে সরকার দখল করার জন্য পরিকল্পনা করা অন্যায় এবং সংসদসর্বস্বতা বলেই বিবেচিত হয়েছে। এমনকি তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অন্যতম রূপকার কমরেড সুন্দরাইয়াও স্বীকার করেছেন যে, তাদের আন্দোলনের এটাই দাবি ছিল যে, নিজামকে তাড়ানোর পর যেন সেখানে ইত্তহাদ মুসলিমিন আর কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা যায়। অতএব ফ্যাসিবাদের পতনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের পতনের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তাকে কম্যুনিস্টরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। অতএব এই ভ্রান্ত ধারণাই শক্তিশালী হয় যে, বুর্জোয়া নির্বাচনে জিতে যেহেতু বুর্জোয়াদেরই সেবা করতে হবে অতএব ফ্যাসিবাদ বিরোধী জোট হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেই ফেরানোর হাতিয়ার, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার নয়।

আজও এই বিভ্রান্তির প্রমাণ আমরা একভাবে দেখি লাতিন আমেরিকা জুড়ে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে হুগো শ্যাভেজ ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট হিসেবে রাষ্ট্রনায়ক হননি। চিলির একসময়ের প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, যাকে সি আই এ ক্যু করে হত্যা করেছিল, তিনিও নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেননি। আজ লাতিন আমেরিকা জুড়ে এবং সম্প্রতি এমনকি কিছুদিন আগে গ্রিসেও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এ ধরণের সংগ্রামী শক্তিগুলির সরকারে যাওয়ার যে সম্ভাবনাগুলি তৈরি হয়েছে, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে, তাদের নেতৃত্বই সেগুলিকে মার্ক্সবাদী মতবাদের ঊর্দ্ধে বলে দাবি করেছেন। এমনকি, বিশ্বের অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বও সেই সুরেই সুর মিলিয়েছেন। অথচ ট্র্যাজেডি এটাই যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের সুযোগ থাকলে তা করার পরামর্শই দিয়ে গেছে ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ। শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকার নীতি অনুশীলন করে মানবসভ্যতাকে রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব উপহার দিয়েছেন নেতারা। কমরেড হুগো শ্যাভেজ, কমরেড আলেন্দে না জানতে পারেন, কিন্তু কম্যুনিস্টরা জানেন বিপ্লবের প্রথম ধাপ অর্থাৎ ক্ষমতা দখল যে পথেই হোক না কেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় অটুটই থাকে, তাকে ভেঙেই বিপ্লবের পরবর্তী ধাপ, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে হাত দেওয়া যায়, নচেৎ সেই ক্ষমতা দখল অর্থহীন হয়ে পড়ে। জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা মত দিয়েছিলেন তারা অনেকেই ভেবেছিলেন সেই সরকারকে নানা ভাবে হেনস্থা করা হবে, আরএসএস থেকে শুরু করে কংগ্রেস, দেবগৌড়া হয়ে পুলিশ-মিলিটারি- আদালত-আমেরিকা

সকলে মিলে তার পিছনে লাগবে! এই মতাবলম্বীরা কি তবে এমনটা মনে করেছিলেন যে সশস্ত্র পথে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ করে জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হলে কেউ আর তাকে বিরক্ত করতো না? ক্ষমতা দখল যে পথেই হোক, বিরক্ত করার জন্য থেকে যায় প্রতিক্রিয়াশীলদের রাষ্ট্রযন্ত্র। এমনকি, ১৯৯৬ সালের ঘটনাপ্রবাহ যদি রাজ্য থেকে কেন্দ্রের শাসন দখলের সচেতন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীও হতো—অর্থাৎ তৃতীয় ফ্রন্ট একটি দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হতো, তার ন্যূনতম কর্মসূচিতে কেন্দ্রের সরকারের কর্তব্য হিসাবে মৌলিক সংস্কারের উল্লেখ থাকত, অন্যান্য শরিকদের তুলনায় ভালো ফল করলে কম্যুনিস্টরাই যে প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার হবেন তাও আগে থেকেই বলা থাকতো, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হতেন, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ন্যূনতম কর্মসূচি গ্রহণ করতে শুরু করতেন, ও নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দেবগৌড়াও নীরবে তা মেনে নিতেন—এই এত্তোগুলো পর পর স্বপ্নের মত সুষ্ঠুভাবে হলেও কি এদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র, পুঁজির শেষ আশ্রয় অনির্বাচিত আমলা-সামলা- হামলারা চুপ করেই বসে থাকতো? নিশ্চয়ই রাষ্ট্রযন্ত্র সেই সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তো, প্রকাশ্য বা অন্তর্ঘাতমূলক, দুই কার্যক্রমই তার দিক থেকে জারি থাকতো। কমরেড লেনিনরা অভ্যুত্থান করে ক্ষমতাতে এসেও রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্ঘাত বা তাদের শরিকী সংঘর্ষ কম ভোগ করেননি। কয়েকদিনের মাথাতেই মন্ত্রী আন্তনভকে চোরাকুঠুরিতে কয়েদ করে রেখেছিলেন স্বয়ং সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাই! অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পরেও লেনিনদের যেভাবে জেনারাল দুখোনিনকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল, একইভাবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে নেপালের প্রচণ্ডদেরও কাটোয়ালকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আবার আলেন্দের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা কার্যত রাশিয়াতেও হয়েছে। দু-বছরের মাথাতেই লেনিন নিজের সতীর্থদের হাতেই গুলি খেলেন এবং সেই আঘাতেই কয়েক বছরের মধ্যে মারাও গেলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা মাও সে তুঙকেও কয়েক বছর যেতে না যেতেই ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়েছে, বিদেশী মদতে। তারই দলে এবং জোট সরকারের (চীনের সরকারে প্রায় দুই দশক পর্যন্ত বুর্জোয়া দলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন) মধ্যে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বার বার। বেশ কয়েক বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঘিরে রেখেছিল রাশিয়াকে, শুধু আর্থিকভাবেই নয়, একেবারে সামরিকভাবেও। যুদ্ধ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে জার্মান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শর্তকেই মোটামুটি মেনে বলশেভিকরা ব্রেস্ট লিতভস্ক চুক্তি করেছিলেন, তাও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। চীনের অবস্থাও শোচনীয় ছিল, একমাত্র রুশিয়া ছাড়া বহু দিন তাদের অন্য কোনো দেশই স্বীকৃতি দেয়নি। যাঁরা ভেবেছিলেন যে ৫৩৭ (তখন এটাই এম পি সংখ্যা ছিল)-এর মধ্যে ৫০০টা আসন পাওয়া অবধি কম্যুনিস্টদের অপেক্ষা করতে হবে, যা পেলে বুর্জোয়ারা নিস্তেজ হয়ে পড়বে তারা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত নন। শুধু কম্যুনিস্ট সরকারই বা কেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রপ্রধানরা, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী থেকে সঞ্জয় গান্ধী, রাজীব গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, কেনেডি থেকে গান্ধীজী সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপিতা হয়েও নিজেদেরই বা পুঁজিরই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নিহত হয়েছেন ঘাতকের হাতে। যদিও তার ফলে রাজীব গান্ধী বা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নে পিছু হঠেন না।

বিজেপির বিরুদ্ধে ১৭ দলের জোটের লড়াই মানেই শেষে আসবে একটাই প্রশ্ন, বিজেপির বদলে কেন্দ্রে তবে কে? এটাও কারুরই অজানা নয় যে আপাতত একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার, উত্তর এরকম হলেও ঘটনাপ্রবাহ থেমে থাকবে না। এর পরের ধাপই হল বাম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লিতে বাম সরকার ও বাম প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রসঙ্গ আসবেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে। অতএব প্রশ্ন হল, সেই বাম সরকারের থাকবে বুর্জোয়া কর্মসূচি নাকি মৌলিক কর্মসূচি? কেউ কেউ বলবেন আধা বাম, মেকি বাম, অতিবামদের নিয়ে এই জোটের মধ্য দিয়ে মৌলিক কর্মসূচি কি করেই বা রূপায়িত হবে! প্রথমেই বলে রাখা ভালো, জোটে কখনোই জোটসঙ্গীর ইতিহাস, ভূগোল নিয়ে বাছবিচার চলে না। একটি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। কুয়োমিংটাংরা কয়েক লক্ষ কম্যুনিস্টদের হত্যা করার পরেও যদি কম্যুনিস্ট পার্টি ওদের সঙ্গে জোট করতে পারে তবে এই ১৭ দলের তো তা হতেই পারে। কেপিডি এসপিডি এই ভাবেই অযথা হিটলারের বিরুদ্ধে ঠিক সময় দাঁড়াতে পারেনি। সশস্ত্রভাবে এক দলের এলাকা দখল করার কর্মসূচি বাতিল করার ন্যূনতম শর্তই মানতে রাজি হয়নি তারা। অতএব জোটসঙ্গীর চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল তার ন্যূনতম কর্মসূচি। জনগণের আকাঙ্খাকে যদি ভাষা দিতে হয় তবে এই জোটের নিশ্চয়ই থাকতে হবে এদেশকে স্বাধীন-ধর্মনিরপেক্ষ-সমাজতান্ত্রিক ভারতে রূপান্তরিত করার কর্মসূচি, আমাদের সংবিধানের প্রথম পাতাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কর্মসূচি। বিশ্বায়নকে নাকচ করা বা এদেশের টাকাকে ডলারের সমান করার কর্মসূচি। আমূল ভূমিসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফসল সরাসরি ক্রয় করে ভর্তুকিতে তা রেশনে চালু করার কর্মসূচি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হিন্দু রাষ্ট্রের বিপদকে চিরতরে দূর করতে প্রতিটা রাজ্যেরই হাতে ৩৭০ ধারার অধিকার তুলে দেওয়ার কর্মসূচি। এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

বিজেপি-র উত্থান আমাদের জওহরলাল নেহরুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তিনি অনুতাপ করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উত্থান দেখে যে হঠাৎ তিনি আর চারিপাশকে চিনতে পারছেন না। আসলে বামপন্থীরাই একমাত্র বোঝেন যে সার্বজনীন ভোটাধিকার আর সংসদীয় গণতন্ত্র একসঙ্গে খাপ খায় না। এই কম্বিনেশন সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত আদিম প্রবৃত্তি ও মতাদর্শকে উস্কানি দেয়, কারণ সংসদীয় গণতন্ত্র বুর্জোয়া ব্যবস্থারই রাজনৈতিক রূপ, পুঁজিরই হাতিয়ার। এই রূঢ় সত্যটা ধরতে পারলেও সেই এককেন্দ্রিক সংসদীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করে আরেকটু বেশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার যে সুযোগটুকু তার বা কংগ্রেস দলের সামনে এসেছিল পরাধীনতার আমলে তা গ্রহণ করা হয়নি। তাঁর দলের নেতা মৌলানা আজাদ থেকে শুরু করে সব ধরণের গণতান্ত্রিক শক্তি বার বার আওয়াজ তুলেছিল যে এদেশের গণতন্ত্রকে ব্যপ্ত করার একমাত্র হাতিয়ার হল রাজ্যগুলির হাতে স্বায়ত্ত্বশাসন। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতের কেন্দ্রে একটি জোট সরকার যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার জন্য কংগ্রেস দলটি পরাধীন আমল থেকেই ছিল মরিয়া। তারা মাত্র তিনবার গণ আন্দোলনের ডাক দেয়, এবং প্রতিটাই ছিল ইংরেজদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রস্তাব তারা ফিরিয়ে নেয়। প্রথমটি জালিয়ায়নওয়ালাবাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল বলে যতই দাবি করা হোক এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে তা ছিল নির্বাচনের সংরক্ষণের সুযোগ থেকে মুসলিম লীগকে সরিয়ে রাখার জন্য। দ্বিতীয়টি ছিল মুসলিম লীগের ১৯২৭ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রস্তাবকে ব্রিটিশরা গুরুত্ব দিয়েছিল এই অপরাধে এবং সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে। তৃতীয়টি, অর্থাৎ ১৯৪২-র টা ছিল ক্রীপস মিশনের বিরুদ্ধে। ১৯৪১-এর আগে কিন্তু ইংরেজ ভারত ছাড়র ডাক দেওয়া হয়নি। যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্য না করার জন্য যখন কম্যুনিস্টরা আবেদন জানালো কংগ্রেস নেতৃত্ব তোয়াক্কা করেননি। কিন্তু যে মুহূর্তে জাপান যুদ্ধে প্রবেশ করলো এবং ইংরেজদের এশিয়াতে পর্যুদস্ত করতে করতে এগিয়ে এল, ১৯৪২ সালে শুধু অসহযোগই নয়, স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ১৮৮৫ সালে জন্ম নেওয়ার পর এই প্রথম তারা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল! জাপানের অগ্রগতীকে দেখে কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝেছিল জোট রাজনীতির দফা রফা না হওয়া পর্যন্ত, মুসলিম লীগকে ভালোমতো কোণঠাসা না করা পর্যন্ত বৃটিশদের বদলে জাপানকে নিয়ে আসা যায়। যা নিয়ে প্রাথমিকভাবে নেহরু এবং আজাদ চরম বিরোধিতা করেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চান। কংগ্রেস সোসালিস্টদের ঘাড়ে আন্দোলনের দায়িত্ব দিয়ে তারা জেলে ঢুকে গেলেন। ভেতর থেকে আন্তর্জাতিক সমীকরণ খেয়াল রাখলেন, যখন বুঝলেন অক্ষ শক্তি শেষ, তখন ক্রীপস মিশনের সমস্ত প্রস্তাবই শেষে মানা হল। কিন্তু শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রস্তাবটিকে খারিজ করা হল। আবার ক্যাবিনেট প্রস্তাবের আমলে মৌলানা আজাদ, যিনি দলের প্রেসিডেন্ট পদে থেকে দলকে সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাকে সরিয়ে, স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এসে যুক্তিরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সপক্ষে করা চুক্তি ভঙ্গ করলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। যে-চুক্তি অনুযায়ী ভারতের রাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা ছিল, অনেকটা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী। যে লাহোর প্রস্তাবকে কংগ্রেস আবার পাকিস্তান প্রস্তাব বলে চালাতে চেয়েছে। সেই থেকে সংবিধানসভা আহ্বান পর্যন্ত মুসলিম লীগকে দূরে রাখার জন্য আম্বেদকারকে বসানো হল সংবিধান সভার মাথায়। যদিও আম্বেদকার নিজেই দুঃখ করে গেছেন যে সমস্ত গুরুত্ব দলিল দস্তাবেজ রচনা করছিলেন নেহরু-প্যাটেলরাই। চূড়ান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী আম্বেদকারের কাঁধে বন্দুক রাখা হল। ১৯২৭ সালে সেই যে ‘দুটি দলের পথ দুদিকে গেল বেঁকে; তা বেঁকেই থাকলো। পাকিস্তান তৈরির পরও জিন্নাহের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে গ্রহণ করলো না সেই দেশের রাষ্ট্র। যার ফলে সেই দেশও কয়েকবছরের মধ্যেই আবার ভেঙে দুই টুকরো হল। এই ভাঙাভাঙির খেলা থেকে শিক্ষা নিল না, এদেশের সরকারগুলি। রাজ্য সভার গুরুত্বকে বাড়ানোর চেষ্টা হল না, রাজ্যগুলির হাতে বেশিরভাগ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল না। অতএব কাশ্মীর সমস্যা থেকে গেল। থেকে গেল উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যা। থেকে গেল দক্ষিণ ভারতের সমস্যা। প্রতিদিন আরেকটা করে সমস্যা বাড়ছে। এবং ওৎ পেতে বসে আছে বিজেপি। স্বাধীনতা সংগ্রাম জুড়ে কার্যত হিন্দু মহাসভার হাতে পুতুল হয়ে বসে থাকা কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে আজও পরিহাস করছে তারা।

এই বিষয়টার গুরুত্ব আজ আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি। এক ব্যক্তি এক ভোটের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অতি শক্তিশালী হয় তবে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ১৫টি হিন্দু প্রধান রাজ্যের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার সুযোগ থাকবে না ৭টি মুসলিম প্রধান রাজ্য। গোটা দেশের নিরিখে হিন্দুরাই বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদি সেই ভোট এককাট্টা হয় তবে এই দেশ হিন্দু-রাষ্ট্র হতে বাধ্য। এই আতঙ্কে রাজ্যগুলির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল সিপিআই থেকে আবুল কালাম আজাদ, পেণ্ডেরেল মুন থেকে জিন্নাহ। যাতে এই দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে, ৭টি রাজ্যের জনগণের আতঙ্ককিত হওয়ার বাস্তব ভিত্তি ক্রমেই লোপ পায়। গান্ধী থেকে ক্রীপস, ওয়াভেল থেকে নেহরু সকলেই বুঝেছিলেন

যে এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় দিল্লি সবল হবে, রাজ্যের তুলনায় দিল্লি দুর্বল হবে, জোট সরকার বাধ্যতামূলক হবে। শুধু তাই নয় কেন্দ্রের যে কোনো সিদ্ধান্ত রাজ্যের বিধানসভায় পাশ করানো বাধ্যতামূলক হবে, রাজ্যপালের ওপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এগুলি হয়নি, কেন্দ্র তালিকা-রায় তালিকা-যুগ্ম তালিকার নামে রাজ্যকে কার্যত পঙ্গু করা হয়েছে, প্রশাসন পঞ্চায়েত থেকে পরিচালিত না হয়ে দিল্লি থেকে পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু সেই নীতির যে কি বিপুল শক্তি তা আজও আমরা টের পাই। আজ সব রাজ্যেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অথচ ১৯৯২ থেকে আঞ্চলিক দলগুলির মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলির ক্ষমতা যতটুকু বেড়েছে, রাজ্য সভার গুরুত্ব যতটুকু বেড়েছে, আঞ্চলিক দলগুলি যতটুকু কংগ্রেস-বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখছে, ততই আমরা দেখছি হিন্দু রাষ্ট্রের এজেন্ডা এমনকি এনডিএ-র পক্ষেও সামনে আনা সম্ভব হয় না। আজও যখন মোদী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে এসেছে তখনো রাজ্য সভায় বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকায় তারা দুর্বল। আর তাত্ত্বিকভাবে বললে বিষয়টা এরকম, রাজ্যের হাতে স্বায়ত্বশাসনের নীতি কার্যকর হলে একটি দল যত সংখ্যক এমপিই জেতান না কেন, তাদের এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে হলে সবকটি রাজ্যে সরকার বানাতে হবে, তাও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার, যা আজকের দিনে কার্যত অসম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বললে, প্রতিটা রাজ্যের হাতে ৩৭০ ধারা বা স্বায়ত্ত্বশাসন আসলে একটি লুজ কনফেডারেশন, বা নমনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। আমেরিকাতে যা রয়েছে (মার্কিন দেশের রাজ্যগুলির ক্ষমতায়নের সুফল তারা নিজেরা ভোগ করলেও, পররাষ্ট্র সম্বন্ধিত নীতিতে তার প্রতিফলন ঘটে না কারণ শেষ পর্যন্ত তা নির্ধারিত হয় পেন্টাগন, এফবিআই, সিআইএ দ্বারা), সোভিয়েত ছিল। রাজ্যগুলির হাতে স্বায়ত্বশাসনের অর্থ আজ একা কাশ্মীর যে সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছে, চাইলে সংসদে গৃহীত যেকোনো আইন যেমন নয়া অর্থনীতি বাতিল করতে সে পারে, চাইলে পেট্রল ডিজেলের মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এই সুযোগ সকলেরই থাকলে বিজেপির ৩৭০ ধারা বাতিলের আওয়াজকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব।

বিজেপির নীতি হল দেশকে টুকরো টুকরো করা, বহু দেশের মাঝে একটা অতিশক্তিশালী কেন্দ্র যাতে গড়ে ওঠে আমেরিকাতে। রাজ্যগুলিকে খণ্ডিত করা, যার বহু রাজ্যের মধ্যে একটি অতি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে দিল্লিতে। সমাজকে বিভাজিত করা, যাতে অতি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে পাড়ায়, মহল্লায় তৈরি হওয়া আরএসএস-র অফিসগুলিতে। ৩৭০ ধারা না থাকলে কাশ্মীর এদেশে আর থাকবে না, আমেরিকার অস্ত্র বিক্রির আরেকটা দেশ হবে। সিমলা চুক্তি না মানলে উত্তরপূর্বাঞ্চলে ঝামেলা বাড়বে, সেগুলি থেকেও দেশছাড়া হওয়ার আওয়াজ উঠবে। মসুলিমরা পাকিস্তানের চর, ইত্যাদি বলে তারা বহু যুগের হিন্দু মুসলমান অন্তঃসলিলা বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে, যাতে এর ফলে মুসলিম মৌলবাদ আরো শক্তিশালী হয়, জঙ্গি হামলা কমার বদলে বাড়ে। ঠিক যেমন আমেরিকা যত (মুসলিম) সন্ত্রাসবাদকে কাঠগোড়ায় তুলছে ততই তা বেড়ে চলেছে।

শুরুতেই বলেছি মোদী চাইলেও হিটলার হতে পারবে না, বা পারছে না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ সেই সুযোগ তাকে বা পুঁজিকে দিচ্ছে না। মোদী চাইলেই আজ হিটলারের মতো করে ভাবতে পারবে না যে সে পাকিস্তানের কোনো খনির মালিক হবে, বর্মার কোনো বন্দরের প্রভু হবে। তাই তাকে আজ মমতা ব্যানার্জীর কাঁধে চড়ে আসতে হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জী মুসলিম মৌলবাদকে ব্যবহার করে গণতন্ত্র কেড়েছে, তাই এবার সে হিন্দু মৌলবাদ, যা কি না এই দেশে অনেক বড়ো বিপদ, ব্যবহার করে গণতন্ত্র কাড়বে! তবে এই ১৭ দলের জোট যদি আক্রমণাত্মক হতে পারে, যদি সত্যিই আরএসএস-দের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে পারে, তবে ভবিষ্যৎ বিজেপিরও নয়। কংগ্রেসকে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে পাশে পেলেও ভবিষ্যৎ শুধু কংগ্রেসের নয়, অনন্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তাই বলে।

Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom.

—B. Russell

There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.

—Socrates

A collative effort (cut & paste?) to depict the nature of Neo-liberalism

A. M.

"The advance of capitalist production develops a working class, which by education, tradition, habit, looks upon the conditions of that mode of production as self-evident laws of Nature. The organisation of the capitalist process of production, once fully developed, breaks down all resistance."- Capital, Vol.-I, Chapter 28 pp 516.

The above quote clearly indicates the evolutionary capability of Capital so as to perpetuate its very existence & growth. In order to further deepening of its roots the Capital finds a way out to philosophise the nurturing of the concept of Capital and to make it more natural, mystifies it in the form of neoliberalism!

First of all, let us look into the picture (we took it from one of the articles by David Harvey) which defines the fundamental of Capitalism.

The Greatest Cartoon Ever!

The underlying principle of Neo-liberalism lies in the fact that any way of thought to become domi-nant, a conceptual apparatus has to be advanced those appeals to our intuitions and instincts, to our values and our desires, as well as to the possibilities inherent in the social world we inhabit. If successful, this conceptual apparatus becomes so embedded in common sense as to be taken for granted and not open to question. The founding figures of neoliberal thought took political ideals of human dignity and individual freedom as fundamental, as 'the central values of civilization'. In so doing they chose wisely, for these are indeed compelling and seductive ideals. These values, they held, were threatened not only by fascism, dictatorships etc, but by all forms of state intervention that substituted collective judgements for those of individuals free to choose.

According to theory, the neo-liberal state should favour strong individual private property rights, the rule of law, and the institutions of freely functioning markets and free trade. These are the institutional arrangements considered essential to ensure guarantee individual freedoms. The legal framework is that of freely nego-tiated contractual obligations bet-ween juridical individuals in the marketplace. The sanctity of contracts and the individual right to freedom of action,

expression, and choice must be protected. The state must therefore use its monopoly of the means of violence to preserve these freedoms at all costs. By extension, the freedom of businesses and corporations (legally regarded as individuals) to operate within this institutional framework of free markets and free trade is regarded as a fundamental good. Private enterprise and entrepreneurial initiative are seen as the keys to innovation and wealth creation. Intellectual property rights are protected (for example through patents) so as to encourage technological changes. Continuous increases in productivity should then deliver higher living standards to everyone. Under the assumption that 'A rising tide lifts all boats', or of 'trickle down', neoliberal theory holds that, the elimination of poverty (both domestically and worldwide) can best be secured through free markets and free trade.

Neoliberals are particularly diligent in seeking the privatization of assets. The absence of clear private property rights—as in many developing countries—is seen as one of the greatest of all institutional barriers to economic development and the improvement of human welfare. Enclosure and the assignment of private property rights are considered the best way to protect against the so-called 'tragedy of the commons' (the tendency for individuals to irresponsibly super-exploit common property resources such as land and water). Sectors formerly run or regulated by the state must be turned over to the private sphere and be deregulated (freed from any state interference). Competition—between individuals, between firms, between territorial entities (cities, regions, nations, regional groupings)—is held to be a primary virtue. The ground-rules for market competition must be properly observed, of course. In situations where such rules are not clearly laid out or where property rights are hard to define, the state must use its power to impose or invent market systems (such as trading in pollution rights). Privatization and deregulation combined with competition, it is claimed, eliminate bureaucratic red tape, increase efficiency and productivity, improve quality, and reduce costs, both directly to the consumer through cheaper commodities and services and indirectly through reduction of the tax burden.

The neoliberal state should persistently seek out internal reorganizations and new institutional arrangements that improve its competitive position as an entity vis-à-vis other states in the global market.

Concepts of dignity and individual freedom are powerful and appealing in their own right. Such ideals empowered the dissident movements in Eastern Europe and the Soviet Union before the end of the Cold War as well as the students in Tiananmen Square.

Most importantly, we need to reclaim the idea of freedom. We have to reject the neoliberal version of freedom as market deregulation, which is really just license for the rich to accumulate and exploit, and license for the few to gain at the expense of the many. We have to assert that thoughtful regulation can in fact promote freedom, if by freedom we mean freedom from poverty and want, freedom to have the basic human dignity afforded by good education, housing, and healthcare, and freedom to earn a decent living wage from a hard day's work. Instead of accepting that freedom means unhinging the economy from the constraints of democratic society, we need to assert that true freedom entails harnessing the economy to help us achieve specific social goods that are democratically arrived at and collectively ratified.

It wouldn't be out of context to mention that the first experiment with neoliberal state formation, it is worth recalling, occurred in Chile after Pinochet's coup on the 'little September 11th' of 1973 (almost thirty years to the day before Bremer's announcement of the regime to be installed in Iraq). The coup, against the democratically elected government of Salvador Allende, was

promoted by domestic business elites threatened by Allende's drive towards socialism. It was backed by US corporations, the CIA, and US Secretary of State Henry Kissinger. It violently repressed all the social movements and political organizations of the left and dismantled all forms of popular organization (such as the community health centres in poorer neighbourhoods). The labour market was 'freed' from regulatory or institutional restraints (trade union power, for example). The subsequent Chilean experiment with neoliberalism demonstrated that the benefits of revived capital accumulation were highly skewed under forced privatization. The country and its ruling elites, along with foreign investors, did extremely well in the early stages. But how was the stalled economy to be revived? The policies of import substitution (fostering national industries by subsidies or tariff protections) that had dominated Latin American attempts at economic development had fallen into disrepute, particularly in Chile, where they had never worked that well. With the whole world in economic recession, a new approach was called for. The coup in Chile and the military takeover in Argentina, promoted internally by the upper classes with US support, provided one kind of solution. Redistributive effects and increasing social inequality have in fact been such a persistent feature of neo-liberalization as to be regarded as structural to the whole project.

We can, interpret neo-liberalization either as a utopian project to realize a theoretical design for the reorganization of international capitalism or as a political project to re-establish the conditions for capital accumulation and to restore the power of economic elites. In what follows I shall argue that the second of these objectives has in practice dominated. Neo-liberalization has not been very effective in revitalizing global capital accumulation, but it has succeeded remarkably well in restoring, or in some instances (as in Russia and China) creating, the power of an economic elite.

Some effects that we see:-

Small, medium, even some bigger enterprises are pushed out of the market, forced to fold or swallowed by transnational corporations because their performances are "below average" in comparison to speculation – rather: spookulation – wins. The public sector, which has historically been defined as a sector of not-for-profit economy and administration, is "slimmed" and its "profitable" parts ("gems") handed to corporations ("privatized"). As a consequence, social services that are necessary for our existence disappear. Small and medium private businesses – which, until recently, employed 80% of the workforce and provided "normal working conditions" – are affected by these developments as well. The alleged correlation between economic growth and secure employment is false. Where economic growth only means the fusion of businesses, jobs are lost. Neoliberal policy shift in privileging the market over the state has increased the hiatus between the two major goals of the Indian constitution, i.e. democracy and social justice. Indeed, our foregoing discussion has shown that even the goal of democracy is given a short shift in practice. This is fraught with serious implications and consequences for the stability and survival of the Indian polity.

If there are any new jobs, most are "precarious", meaning that they are only available temporarily and badly paid. One job is usually not enough to make a living (Ehrenreich 2001). This means that the working conditions in the North become akin to those in the South and the working conditions of men akin to those of women – a trend diametrically opposed to what we have always been told. Corporations now leave for the South (or East) to use cheap – and particularly female – labour without "union affiliation". This has already been happening since the 1970s in the "Free Production Zones" (FPZs, "world market factories" or "maquiladoras"), where most of the world's computer chips, sneakers, clothes and

electronic goods are produced (Frobel/Hein Richs/Kreye 1977). The FPZs lie in areas where century-old colonial-capitalist and authoritarian-patriarchal conditions guarantee the availability of the cheap labour needed (Bennholdt-Thomsen / Mies / Werlhof 1988). The recent shift of business opportunities from consumer goods to armaments is a particularly troubling development (Chossudovsky 2003).

It is not only commodity production that is "outsourced" and located in the FPZs, but service industries as well. This is a result of the so-called "Third Industrial Revolution", meaning the development of new information and communication technologies. Many jobs have disappeared entirely due to computerization, also in administrative fields (Frobel et al. 1977). The combination of the principles of "high tech" and "low wage"/"no wage" (always denied by "progress" enthusiasts) guarantees a "comparative cost advantage" in foreign trade. This will eventually lead to "Chinese salaries" in the West. A potential loss of Western consumers is not seen as a threat. A corporate economy does not care whether consumers are European, Chinese or Indian.

The means of production become concentrated in fewer and fewer hands, especially since finance capital – rendered precarious itself – controls asset value ever more aggressively. New forms of private property are created, not least through the "clearance" of public property and the transformation of formerly public and small-scale private services and industries to a corporate business sector. This concerns primarily fields that have long been (at least partly) excluded from the logics of profit – e.g. education, health, energy, or water supply/ disposal. New forms of so-called "enclosures" emerge from today's total commercialization of formerly small-scale private or public industries and services, of the "commons", and of natural resources like oceans, rain forests, regions of genetic diversity or geopolitical interest (e.g. potential pipeline routes), etc. (Isla 2005). As far as the new virtual spaces and communication networks go, we are witnessing frantic efforts to bring these under private control as well.

All these new forms of private property are essentially created by (more or less) predatory forms of appropriation. In this sense, they are a modified continuation of the history of so-called "original accumulation", which has expanded globally following to the motto: "Growth through expropriation!"

Most people have less and less access to the means of production, and so the dependence on scarce and underpaid work increases. The destruction of the welfare state also destroys the notion that individuals can rely on the community to provide for them in times of need. Our existence relies exclusively on private, i.e. expensive, services that are often of much worse quality and much less reliable than public services. (It is a myth that the private always outdoes the public.) What we are experiencing is undersupply formerly only known by the colonial South. The old claim that the South will eventually develop into the North is proven wrong. It is the North that increasingly develops into the South. We are witnessing the latest form of "development": namely, a world system of underdevelopment (Frank 1969).

Development and underdevelopment go hand in hand (Mies 2005). This might even dawn on "development aid" workers soon.

It is usually women who are called upon to counterbalance underdevelopment through increased work ("service provisions") in the household. As a result, the workload and underpay of women takes on horrendous dimensions: they do unpaid work inside their homes and poorly paid "housewife-zed" work outside (Bennholdt-Thomsen et al. 1988). Yet, commercialization does not stop in front of the home's doors either. Even housework becomes commercially co-opted ("new maid question"), with hardly any financial benefits for the women who do the work (Werlhof 2004).

Not least because of this, women are increasingly coerced into prostitution (Isla 2003, 2005), one of today's biggest global industries. This illustrates two things: a) how little the "emancipation" of women actually leads to "equal terms" with men; and b) that "capitalist development" does not imply increased "freedom" in wage labour relations, as the Left has claimed for a long time (Wallenstein 1979). If the latter was the case, then neoliberalism would mean the voluntary end of capitalism once it reaches its furthest extension. This, however, does not appear likely.

Today, hundreds of millions of quasi-slaves, more than ever before, exist in the "world system" (Bales 2001). The authoritarian model of the "Free Production Zones" is conquering the East and threatening the North. The redistribution of wealth runs ever more – and with ever accelerated speed – from the bottom to the top. The gap between the rich and the poor has never been wider. The middle classes disappear. This is the situation we are facing.

It becomes obvious that neoliberalism marks not the end of colonialism but, to the contrary, the colonization of the North. This new "colonization of the world" (Mies 2005), points back to the beginnings of the "modern world system" in the "long 16th century" (Wallenstein 1979, Frank 2005, Mies 1986), when the conquering of the Americas, their exploitation and colonial transformation allowed for the rise and "development" of Europe. The so-called "children's diseases" of modernity keep on haunting it, even in old age. They are, in fact, the main feature of modernity's latest stage. They are expanding instead of disappearing. Where there is no South, there is no North; where there is no periphery, there is no centre; where there is no colony, there is no – in any case no "Western" – civilization.

Raymond Plant in his important theoretical contribution to the debate on neoliberalism has aptly argued that without loyalty to and trust in it, the neoliberal order, for that matter any politico-economic order, cannot sustain by itself. He goes on to say that a basic precondition for trust and loyalty are a high degree of democratic equality in society and a good deal of scope for democratic decision making in the government. Plant persuasively argues that "the neo-liberal has rather limited views about both the scope of democracy and the scope of equality". F. A. Hayek's belief that so long as the neoliberal order maintains material prosperity, the moral questions about popular trust and loyalty in capitalism are held at bay. However, as Plant aptly observes with most recent problems in global capitalism in view, there is nothing in the capitalist system to ensure continued growth without recession. And a recession may quickly erode the "vertical" popular trust in the system as well as the "horizontal" corporate trust among firms and individuals. Without there being the state to deflect the costs of recession from falling on the people or the weaker firms in the interest of social justice, the system may in fact plunge into deeper crisis. "So material prosperity", concludes Plant, "cannot in fact be the ultimate guarantor of the popular legitimacy of the free market system. There has to be a source of trust and loyalty outside of that and neo-liberal thinkers have, I believe, to accept that the sources of trust and loyalty have to be found outside the market".

Most of the literature on the developmental state indicates that, during times when the state was most actively involved in development, their political regimes were relatively non-democratic. This has not been the case with India. Since independence from colonial rule, India has been a democracy, and state intervention in the economy has not involved deprivation of democratic rights. The state functions in collaboration with the society. One must understand the state as a political project in a continual process of formation; deformation and reformation (cf. Painter 2000). One has also to comprehend that Indian state as fragmented rather than

monolithic, actively engaged with society, with no sharp demarcation between the two, and with social, political and economic changes forged on the basis of state-society coalitions (as per Gramsci 1971: 160, 261; Alvarez 1997; Bosco 1998; Young 2000; et all). The same was aptly narrated by the famous poet Atul Prasad Sen: - 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান"...

The nature of state-society coalitions in a democratic country, however, differs from those in non-democratic countries. Unlike the situation in a non-democratic political regime, where state-society coalitions reflect the relatively stable class or clan power of those controlling the means of production, in India, such coalitions are seen to be an amorphous, and in a state of fluidity; they constantly form and re-form based on principles that include the universal adult franchise, in addition to factors like class, caste, ethnicity, and so on. It is in this context of intra-class and inter-class and caste contestation that India's economic policy transformations have to be understood. In a situation where the vast majority of the population remains very poor, the state continues to function in collaboration with the society, and the elite continues to exercise power over the government.

Pre-neoliberalism, the Indian state remained focused on producing balanced economic growth, primarily invested in rural development, and also public utility and industry. Major focus on agricultural reforms and assistance, and associated utility services; helped India tide over chronic hunger, starvation and famine that had become common during the British rule. Even though rural elites benefited disproportionately, yet, policies were geared to address the concerns of the majority of the population who lived in rural India or migrated to cities in search of jobs in the publicly owned manufacturing industry.

But neoliberalism has been naturally accompanied by a disproportionate rise in the political and economic power of the urban elite – **disproportionate**, because the urban elite constitute the numerical minority, yet, neoliberal policies benefits only this small segment of the Indian society and neglects the poor, vast majority of whom continue to live in villages, and the remaining live in the slums of the cities.

Much has been written about the rising wealth and prosperity of Indians. All kinds of clichés are in use, devised by the likes of Thomas Friedman. But just how rich are the Indians today? What is the distribution of wealth in India among its 1.2 billion citizens? What is considered rich? What is the income range of middle class households? Here are some statistics from a recent survey that was written up in "Open" Magazine.

- **"Rich"** households $35,000+ per year: 1.3% (16 million people)
- **"Middle class"** households: $8,000 to $35,000 per year: 13% (160 million)
- **"Aspiring middle-class"** households : $3,500 to $8,000 per year: 30% (359 million)
- **"Deprived"** households
  Below $3,500 per year: 57% (684 million)

We wish there had been another category of "Severely deprived" households comprising, say, the bottom 300 million people. We can bet that the household income there is below $800 per year (~$2/day).

About 170,000 people, or 0.01%, have a net-worth over $1 million. Of these, 25 are dollar billionaires.

Top Indian Salaries 2010

NO.	NAME	DESIGNATION	COMPANY	ANNUAL SALARY IN RS CRORE	$M
1.	Naveen Jindal	Exec VC & MD	Jindal Steel & Power	69.8	15.5
2.	Kalanithi Maran	CMD	Sun TV	37.1	8.2
3.	Kavery Kalanithi	Jt MD	Sun TV	37.1	8.2
4.	Pawan Kant Munjal	MD & CEO	Hero Honda	30.9	6.9
5.	Brijmohan Lal Munjal	Chairman	Hero Honda	30.6	6.8

SOURCE : ANNUAL REPORT FIGURES COLLATED BY BUSINESS INDIA.

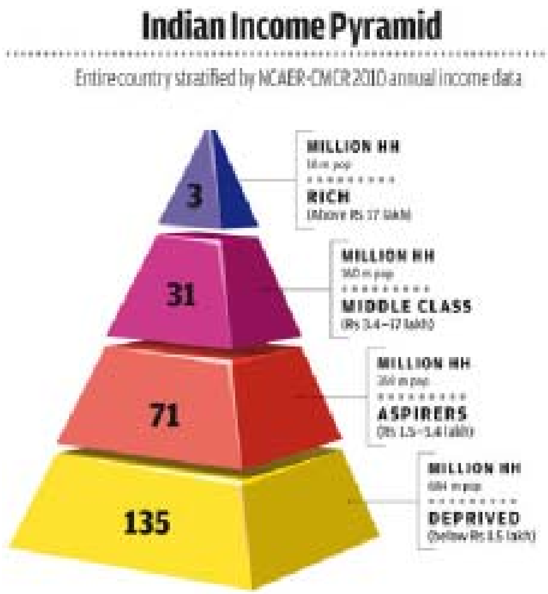

HH : HOUSEHOLDS, **POP :** POPULATION, **FIGURES:** IN MILLION EXCEPT ANNUAL INCOME STRATA, (IN RS LAKH), **TOTAL HOUSEHOLDS:** 240 MILLION:
SOURCE : NCAER-CMCR DOOR TO DOOR SURVEY

But neither the elite, nor the poor, are monolithic groups. The elite section of the society has fractured along the lines of the industry and economy they control or benefit from, in addition to the region in India from which they principally operate. Further, one's class position within the Indian society, to a large extent, intersects with one's caste position. And higher castes in India have had greater access to education and wealth and they have benefited most from India's New Economic Policy. This has ramifications for the nature of economic change, as state-society collaboration continuously undergoes formation, deformation and reformation.

This is evident in how "a new breed of entrepreneurs," represented by the Confederation of Indian Industries, matured through the mid and late 1970s and the 1980s to occupy position of prominence in the 1990s – in terms of influence on the state, they surpassed the traditional industrial bourgeoisie, the TATA(s) and the BIRLA(s). This is also evident in how the urban class and caste elite were able to reassert class and caste power, which had started declining after India gained independence and began affirmative action/program to ensure social justice. Even under the constitutional rhetoric of socialism, the class and caste elite continued to have access to superior education in the English Language and get better jobs in public institutions.

When India started neo-liberalising, the Indian elites were in a position to usurp the advantages accruing out of international technological collaborations, profits and expansion of employment opportunities in the corporate sector (requiring human-resource conversant in the English language). Reassertion of class and caste power through neoliberalism has been fundamental to the New Economic Policy's continuance in India. The growth of private industries and corporations has led to the creation of 'secure' spaces for the elite where any discussion or actions to ensure social justice or affirmative action have been shunned.

An example of de-mystification is elaborated below:-

The government of India (GOI) embarked on a path of neoliberal economic reforms consisting of liberalization, privatization and globalization (LPG) policies in 1991, in the wake of what was diagnosed as a twin crisis- the fiscal crunch and the balance of payments crisis. It is now nearly a decade and a half since the reforms were launched, and a stock-taking would certainly be in order. It was initially argued by the proponents of reforms that LPG policies would replace the inefficient sector with the efficient private sector, and that with increasing openness of the economy, competitive forces would promote not only efficiency but also growth, leading over time, to significant reduction in levels of poverty and unemployment.

As the reforms process unfolded, there was an increasing obsession with the fiscal deficit, and a resulting steep decline in the government's developmental expenditures, especially in rural areas. Agriculture was massively negatively impacted by the LPG reforms during a period of global decline in primary commodity prices. By the end of the 1990s and the beginning of the present decade, evidence emerged of a slowdown in GDP growth while data from the national sample surveys showed a steep decline in the rate of growth of employment, especially in

rural areas. Although official statistics, which have been strongly contested, showed a substantial decline in the proportion of rural households below the abysmal official poverty line, the evidence seems to point in a somewhat different direction. LPG policies appear to have rendered the vulnerable sections of the population even more insecure than earlier, and food security has been eroded. The gender implications of the reforms have also been a matter of concern. Employment, rural livelihoods and sustainability of the LPG process are key emerging issues that need a fresh consideration.

If we track the policy perspective of successive Governments in India after independence and identify the alternatives thrown up by the Lefts, we will find:-

The Left Front Government in West Bengal was a manifestation of these alternative policies in action within structural limitations. The most glaring success was the land reforms through which the agrarian crisis was addressed. Despite initial backwardness and stagnation in the seventies, West Bengal recorded evident success in social indices including infant mortality, maternal mortality and education. "The fact that there was a fundamental transformation in the nature of India's political economy with the coming of the Left Front in 1977 cannot be denied. It placed on the agenda - the last 2-3 years notwithstanding - an alternative way to take this country forward in the direction where we will finally be able to mobilise the support for its structural transformation…."

We also can recall the days of semi-fascist terror in West Bengal in seventies and commented, 'Many friends in media chose not to know or not to inform'. Left Front assumed office in a terrible situation when the youths were frustrated, education was in doldrums, and democracy was in peril. Left Front Government brought about a social security. Land reforms not only did a distributive justice it actually empowered the peasantry and contributed in the growth of production. Those successes are in danger under the new regime. Already more than 100 farmers have committed suicide in West Bengal. The Trinamool Congress-led Government in West Bengal appears to have set in motion an "agrarian counter-reform," Any attempt to reverse the land reforms in the state will invite disasters.

The role of Left Front Government in poverty reduction, decentralization of power through panchayats and on top of everything the defence of democracy were irrefutable. The civil liberties and democratic rights of the people were safeguarded under Left Front Government. 'The initial trends of the new Government have sent ominous signals of intolerance'.

'Left Front leaders have soberly accepted the defeat in the elections and have reacted with patience but there should be serious watch that the rights of people are not lost'.

We should sharply criticize those who talk of so-called 'misrule' of 34 years. The 'misrule' was so that more than 60 per cent of land distribution in the entire country took place in West Bengal only. Left Front Government ensured the minimum wages for the agricultural workers, established three tier panchayats and ensured democratic rights of the working people including Government employees. It was known to the Left parties and their activists that no fundamental transformation of the society would come through a State Government. The aim was to deliver for the people within the limitation. Tremendous success was achieved though there were mistakes. The task of the Lefts is to overcome those mistakes and go forward with Leftism.

One of the major tasks of the first Left Front Government was to restore democracy. In 1977, just after the Left Front Government was formed, the left leaders' viz. Comrades Jyoti Basu and Promode Dasgupta gave a call that no political retaliation should be carried out. The Government freed all political prisoners. First Left Front Government fulfilled 28 tasks of 36 issues declared in election manifesto. Even on the eve of 16th Parliamentary Election 2014, the lefts had come out with the most comprehensive election manifesto.

So even though neoliberalism was thrust on India by its ruling class in collaboration with international floating or finance capital i.e. the World Bank, the IMF etc, its continuance has been ensured by a section of the class and caste elite. In other words, the exogenous power of the global governance institutions

has worked in tandem with the interest of the local elite to produce, what Gramsci calls hegemony or the production of consent through non-physically coercive means. Because of this very existence of 'non-physically coercive means', and because of the Indian Left's seeming failure to mobilise mass movements against the mystification policy of the neo-liberalism, the situation today remains so confusing!

As already being seen by the Indian people that within 200 days of the new Government was voted into power:-

- The Union Budget didn't inspire the nation as such (except the big houses)!
- The democratic institutions all across the country are put under deconstruction mode!
- Communal tension & clashes are in increasring mode!
- Debate over Article 370 is being unnecessarily resurrected!
- Price of essential commodities going beyond the reach of majority of people!
- Patronization of Hindutva in education system!
- Transfer/sacking of Governors in a discrete manner for narrow political gains!
- Tension mounting across border regions!
- There are unprecedented attempts for draconian changes in labour laws!
- Aggressive disinvestment plans unveiled for CPSEs!
- Uncontrolled privatisation of Bank & Insurance sector!
- Attacks on marginalised rural population in the form of purposefully shrinking the gamut of coverage of the MNREGS!
- Proposal to abolish planning Commission!

It wouldn't be out of the way to revisit the resolutions taken at Karachi Congress in 1931! The Karachi session became memorable for its resolution on the Fundamental Rights and the National Economic Programs. Even though the Congress had from its inception fought for the economic interests, civil rights and political liberties of the people, this was the first time that the Congress defined what Swaraj would mean for the masses. It also declared that in order to end the exploitation of the masses, political freedom must include the real economic freedom for the starving millions. Though we know that even after 67 years of Independence none of the following were totally achieved, the overwhelming appeal of those universal demands can move the masses even today:-

- *Basic civil rights of freedom of speech,*
- *Freedom of Press,*
- *Freedom of assembly,*
- *Freedom of association,*
- *Equality before law Elections on the basis of Universal Adult Franchise,*
- *Free and compulsory primary education,*
- *Substantial reduction in rent and taxes,*
- *Better conditions for workers including a living wage, limited hours of work,*
- *Protection of women and peasants,*
- *Government ownership or control of key industries, mines, and transport,*
- *Protection of Minorities.*

We must also remember the words of EMS Namboodiripad ***"One has to remember that building of India on modern democratic and secular lines requires an uncompromising struggle against the caste based Hindu society and its culture. There is no question of secular democracy, not to speak of socialism unless the very citadel of India's 'age old' civilization and culture, the division of society into a hierarchy of castes is broken. In other words, the struggle for radical democracy and socialism cannot be separated from the struggle against caste society."***

Organized political activism or movement is responsible for the degree of democracy we have today, for universal adult suffrage, for women's rights, for trade unions, for civil rights, for the freedoms we do enjoy. Even if the notion of a post-capitalist society seems unattainable, we know that human political activity can make the world we live in vastly more humane. As we get to that point, perhaps we will again be able to think in terms of building a political economy based on principles of co-operation, equality, self-government, and individual freedom.

We would like to welcome the initiatives taken by the lefts to come together on a common joint platform to fight the common enemy of the mankind i.e. Neo-liberalism.

Epilogue:-

The choice is ours, the choice is yours.

সত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য • সত্যব্রত ভট্টাচার্য

বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০১৩

নাটক
হেলমেট

চক্রবুহ্য

অনুপম দাশশর্মা

এ দেশ মধ্যমা আঙ্গুলে সুখে থাকে
বেশির ভাগ সমঝোতা আর কোলের ঝোলের
রং বদলে দেবার হাওয়ার মতিগতি
অভ্যেসের বারান্দায়
তবুও তো বেঁকে বসে না
বশ না মানা জিভ!
যাঁরা থাকেন সুরক্ষা বলয়ে, ক্ষমতার মোরামে,
তাঁরা চলকে ওঠেন শিল্পের পাটাতনে
ওঁনারা পকেট বড়ো রাখেন
বিকল্প সাদা খাতারা যদি ভ'রে যায় উড়ন্ত অক্ষরে . . .
জেনে রাখো ভূমিক্ষয় রুখবেই বাংলা কবিতার
বটতলা চিরকাল থাকে সোপ অপেরায়
থাকুক সে নিরালার গোপন ত্রিভুজে।

আহ্বান

অমিতোষ হালদার

আজ আবার ভীষণভাবে চাইছে তোকে মন।
অমানিশার ঘোর আঁধারে,
আজ যে আলোর বান ডেকেছে,
চারিদিকে দীপাবলীর আলোর রোশনাই।

একলা আমি শূন্য ঘরে, থাকব কেন আঁধার করে।
আয়না আমার আলোর দিশা,
এই আঁধারে হাতটি ধরে কাছে বসে রই।

তোর সাথে যে জনম জনম হয় না দেখা,
তোর বিহনে আজও একা।
পথের মাঝে তোকেই খুঁজি।

আইনা সোনা একবার-টি
মনের সুখে দেখি তোকে,
না হয় আবার মিলিয়ে যাস,
পথের বাঁকে, যেমন করে হারিয়েছিলি।

সেই প্রভাতে

অনুপম চক্রবর্তী

তোমার অশেষ চাওয়ার তালিকা থেকে
অন্তত বাদ রেখো একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল
আর রোদ্দুর-পোড়া মন কেমন করা দুপুর
অপ্রয়োজনীয়—তাই ছেড়ে দিও সোনালী সকাল
আর সব তুমি নাও; গাড়ি, বাড়ি, ভোগ্য—
লালসাভরা রাত্রি, পণ্যভরা দোকান
কেবল রাত শেষ হলে আফসোস করো না
তোমার ছেড়ে দেওয়া
সকাল, দুপুর, বিকেল . . .।

দুটি কবিতা

মনোতোষ চক্রবর্তী

এক

পাথরটা সরিয়ে দিও না বুক থেকে
লাভার উত্তাপে পুড়ে যেতে পারো
ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারো এক মুহূর্তে।

পাথরটা সরিয়ে দিও না বুক থেকে
ভূকম্প অনুভূত হতে পারে
সৃষ্টি হতে পারে বৃহৎ হ্রদ।

পাথটা সরিয়ে দিও না বুক থেকে
বিষাক্ত গ্যাস কেড়ে নিতে পারে জীবন
কিংবা ক্ষীপ্র জলধারা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদের।

তখন?

দুই

ছোট ছোট ছন্দ পতন
ঘনীভূত করে ঝড়ের ভ্রুকুটি

মৃদু মন্দ কম্পনে
ভূস্বর্গে ফুটে ওঠে ফাটল

শক্তপোক্ত ভীত নড়েচড়ে তাসের ঘর
ভেসে যায় এক টুকরো শরতের মেঘে।

কবিতাগুচ্ছ

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

ভগবান

কে ভগবান?
ফুল, চন্দন আর বেলপাতা
এ সমস্ত উপসর্গ
স্বর্গ কি জানি না
দেখিনি কখনো।
দারিদ্র্য, সততা দেখেছি
বুঝিনি সব কিছু।
কাঠ, পাথর, ধাতু আর মাটি
দেখেছি
এ সমস্ত জড় পদার্থ।
শুনেছি ঈশ্বর শক্তির উৎস
আমার শক্তির উৎসকে দেখেছি
তিনিই ঈশ্বর।

আমি

কেন, কখন, কিভাবে
এলাম জানি
কবে, কখন, কিভাবে
যাবো জানি না।

এই জানা অজানার মাঝে
জীবন
সেটাও আমার নয়
বন্দী সে ভাগ্য বা অদৃষ্টের হাতে।

আমার বলতে এই দেহটা
সেটাও আত্মার রূপক,
ভাবছি আমি কে?

মৃত্যু

জন্ম মৃত্যুর জন্য
জানি কিন্তু বুঝি না
ঘুরে চলি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে
বৃত্তের আকারে।

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-তৃপ্তি
পরিবর্তন হয়ে চলেছে
দিন-রাতের মতো
জীবনের ওপর দিয়ে।

লক্ষ্য কিন্তু একটাই
কেন্দ্রবিন্দুতে
জানি না কখন কেমন করে
কিভাবে পৌঁছোবো
না, সে আসবে।

নেপথ্য নায়ক

এসেছি পুতুল নাচের আসরে
গানে, সুরে, অভিনয়ে জমজমাট আসর।
সুরে ছন্দে মিল আছে, অমিলও আছে
কিন্তু অভিনয় প্রাণবন্ত।
হাসি, কান্না, সুখ, তৃপ্তি সবই বাস্তব।
কে এই যাদুকর?

যার আঙুল নাড়ায় হচ্ছে সবকিছু
চিনি না তাকে
সে নেপথ্যে থেকেই খেলায়
না চিনলেও তার নাম দেখেছি
রঙ্গমঞ্চের মাথায়।

ভগবানের দোহাই ছাড়া ধর্ম বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না। —মেঘনাদ সাহা

আমার অনন্ত অনন্ত-র আমি

অনন্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ইদানিং আমার অনেক কিছুই গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি একটু আধটু লিখি-টিখি। সেসব লেখা-টেখা কেউ কেউ হয়তো পড়ে-টড়ে। কিন্তু অনন্ত-র দাবি ও-সব লেখা নাকি তারই। আর অনন্ত-র দাবিটা দিন দিন এমন জোরদার হয়ে উঠছে যে ওর কথাতে আমার সায় না দিয়ে যেন উপায় নেই। কেন-তা একটু ভেঙে বলি। অনন্তর বেশ নাম ডাক হয়েছে হালফিল। অনেক ভালোমানুষ তার লেখাকে বেশ ভালো বলে; আবার অনেক মানুষ (যাদের অন্যেরা তেমন ভালো বলে না) তার লেখাকে খারাপ না বললেও তেমন ভালো বলে না। এই দু-দল মানুষের মধ্যে যেহেতু শেষেরটি দলে ভারী তাই তারাই অনন্তকে নিয়ে নাচানাচি বেশি করে। তাদের মাথায় চড়ে অনন্ত সভা-সমিতি -ঘণ্টা চ্যানেল-নিরানন্দ-সদানন্দ চ্যানেল করে বেড়ায়। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই অনন্ত আনন্দে থাকে। আর এদিকে আমার লিখে-লিখে হাতে-কড়া পড়ে গেল। তবুও অনন্তর দাবিটা আমাকে মেনে নিতেই হয়। কেননা, লোকজন তো অনন্ত-র খোঁজে আমার কাছেই আসে। আমাকে সামনে বসিয়েই তো তারা অনন্ত-র লেখালেখির হদ্দমুদ্দ করে। ভেবে নিলেই তো হয় আমি-ই অনন্ত; তাহলে তো এ অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অনন্তও সেকথাই বলে। বলে 'আরে আমিই তো তুমি, আর তুমি আমি। এসব নিয়ে আর দিক্ কোরো না তো।' তা বললে কি হয়? যে আমি প্রাতঃকৃত্য সারি, বাজারে যাই, বেঁচে থাকতে ডান হাতের কাজ সারি রোজ—সে আমি আর অনন্ত কি এক? যে আমি ছোটোবেলায় মায়ের কাঠের বাক্সে রাখা গুঁড়ো দুধ চুরি করে খেতাম, সে আর অনন্ত কি এক। যৌবনে যে-আমি এক ছেড়ে বেশ কয়েকটি প্রেমে পড়েছি (অবশ্যই সাধ্য অনুযায়ী এবং সুযোগ যেমন-যেমন মিলেছে) এবং প্রেমিকার প্রত্যেককেই বলেছি (কখনও সম-সময়ে কখনও সময়ান্তরে) 'তুমিই আমার জীবনের ধ্রুবতারা'—যদিও সেসব কখন সত্য না কি তার অপলাপ—সেটা আজও আমার কাছে ধন্দ। সে আমি আর অনন্ত কি এক! সব থেকে বড়ো কথা আমি যখন অনন্ত হয়ে লিখি তখন আমি বেশ ভালো মতো টের পাই—ওই লেখাটা ঠিক আমার নয়। কেননা আমি ঠিক যেমনটি চাই; লেখাটা কখনোই তেমনটি হয়ে ওঠে না। লেখাটার মধ্যে কখন যে অনন্ত ঢুকে পড়ে লেখাটাকে তার ইচ্ছেখুশি মতো চালায়। তার মরজিমাফিক যা ঘটেনি তা ঘটিয়ে দেয়; যে রং লাগেনি তা লাগিয়ে দেয়—মোট কথা, আমি যা কখনো চাইনি—অনন্ত-র হাতে পড়ে লেখাটা ঠিক তাই হয়ে ওঠে। অথচ অনন্ত বলে ওটা নাকি আমারই লেখা।

লেখাটা আমারই হোক বা অনন্ত-র বা অন্য কারও—সব লেখার মধ্যেই তো কিছু ভালো, কিছু খারাপ। কিছু না-ভালো না-খারাপ মিলেমিশে থাকে। কিছু উপলব্ধি, কিছু অনুভব থাকে আর সেসবই তো আমার বা অনন্ত-র বা অন্য কারও আসে যেসব মানুষের মাঝে আমরা মিলেমিশে দ্বন্দ্বে-সংঘাতে বেড়ে উঠি তাদের মধ্যে থেকেই। তবে কেন আমি বা অনন্ত বা অন্য কেউ এককভাবে লেখাটার দাবিদার হয়ে উঠতে পারি? আর সে কারণেই আমি লেখাটা শেষ করার সময়েও ধন্দে আছি— লেখাটা কার? আমার না অনন্ত-র না অন্য কারও? না কি তামাম দুনিয়ার!

মানক

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

এ নিখিলে বেড়িয়ে পড়েছ
হাজারো-এক মানক হাতে
মেপে নিচ্ছ সব
ঘরবাড়ি পথঘাট আকাশ বাতাস
ধূলিকণা থেকে নদী, নোনাজল।
কোনোটা মাপছ গজফুট মিটারে
বোনোটা গ্রামে, কিলোগ্রামে, পোয়াটাক
সেরে—মাপসই জীবনে খাপে খাপে
ভরে নিচ্ছ সব—ধনমানজীবন যৌবন
ভালোবাসা! পেয়েছ কি কোনো
মানক তার? মাপবার কল?
পাওনি তো—তবে এসো
মানকের মাপকাটি, হিসেব নিকেশ ছুঁড়ে ফেলে
ভালোবাসি — তোমাকে আমাকে;
কুলোতে পারলে একা
এবং আরও কয়েকজনকে।

ডিম

পল্লববরন পাল

আমাকে বউ ডিম কিনতে দেয়না কিছুতেই। আমি ডিম কিনলে নাকি তারা বেশিক্ষণ আস্ত থাকে না। বাড়ি ঢোকবার আগেই তারা ফেটে যায়।

এই তথ্যটা আমাদের পাড়ার চেনাশোনা চৌহদ্দির সবাই জানে। বন্ধু শত্রু নির্বিশেষে। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি তাঁরাও সবাই। আমার বউয়েরা চার বোন—তাদের শ্বশুরবাড়ি, আমার নিজের দিদির আর ছোটভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি—মাসতুতো খুড়তুতো পিসতুতো ভাইবোন, তাদের নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ির লোকজন—তারাও জানে। আমার বউসহ এদের প্রত্যেকের ফেসবুকের বন্ধুবান্ধবীরা পর্যন্ত জানে। তাদের কেউ কেউ আবার আমারও ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। তারা সবাই সামনে পেছনে স্মাইলি সাজিয়ে এই তথ্যটা আমার দেওয়ালে লিখেছেন। স্মাইলিগুলো ভারি সুন্দর দেখতে—ডিমের কুসুমের মতো।

আমার বউ কোনোদিন মিথ্যে বলে না। যদিও আমার স্মৃতিতে একবার, মাত্র একবারই—বউয়ের নির্দেশমতো আমি ডিম কিনে চারশ' ফুট অনুভূমিক আর চারতলা উলম্ব অতি সতর্ক হয়ে হেঁটেও চারটে আস্ত ডিম আমার বউয়ের হাতে তুলে দিতে পারিনি। আমার সতর্কতায় এক শতাংশ-ও খাদ ছিল না। আমি জানি। কিন্তু আমার বউ জানে যে আমি সতর্ক ছিলাম না। কাজেই আমার সতর্কতায় অবশ্যই খাদ ছিল। এবং তাই বউ বলে—ওই, আমি ডিম কিনলেই নাকি—যেন সাকুল্যে অন্তত দু'শো ছাপ্পান্নবার ঘটে গেছে এমন, অর্থাৎ দোকান থেকে বাড়ি ফেরার মধ্যবর্তী সময়ে আমার হাতে ডিম ফেটে গেছে। আমার বউ মিথ্যে বলতে পারে না। তাই আমি আর কোনোদিন ইচ্ছে হলেও ডিম কিনতে পারি না। আমি ইচ্ছে না হলেও মাছ কিনি, মাংস কিনি, বাঁধাকপি আলু পালংশাক গরম মশলা দারচিনি, মাসকাবারে চাল ডাল চিনি চা-পাতা। স্যারিডন সাবান শ্যাম্পু—সব কিনি।

শুধু ডিম কেনে পাঁচুর মা।

এই একটা ব্যাপারে আমি পাঁচুর মাকে হিংসে করি। যদিও পাঁচুর মা ওই ডিম দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস অমলেট বানায়, ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানায়। সেগুলো ব্রেকফাস্ট হিসেবে আমার ভীষণ প্রিয়। আমি ডিম খেতে খুব ভালোবাসি। আমার বউয়েরও ডিম হট ফেভারিট। অন্তত এই একটা বিষয়ে আমরা দু-জন আদর্শ দম্পতি।

ডিমের প্রতি এ হেন অপত্য প্রেম আমার আশৈশব। সপ্তাহে শুধু রবিবার সকালের ব্রেকফাস্টে একটা করে গোটা ডিমসেদ্ধ বরাদ্দ ছিল আমাদের তিন ভাইবোনের জন্য। ওঃ, সে কতক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে নুন গোলমরিচ লাগিয়ে লাগিয়ে খেতাম আমি। দিদি বা ছোটভাইয়ের এতো ডিম প্রেম ছিল না। তাই পড়তে বসতে দেরি হওয়ার জন্য শুধু আমিই মায়ের বকুনি খেতাম নিয়মিত। ডিমে ডিমাকার অবস্থায় ওই বকুনিটাও আমার কাছে তখন গোলমরিচের ঝাঁঝের মতো, মন্দ লাগতো না।

আমাদের বাবা ছিলেন পুরোনো দিনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। প্রতি রোরবার আমাদের বাইরের ঘরে বাবাদের পার্টি মিটিং হতো। আমরা তিন ভাইবোন ভেতরের দালানে বইখাতা খুলে বসতাম। আমার কান থাকতো খাড়া বাইরের ঘরের দিকে। হাওয়ায় ভেসে আসতো 'পুঁজিবাদ' 'প্রলেতরিয়েত' 'সমাজতন্ত্র' 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত'-র মতো কঠিন কঠিন শব্দ। মানে বুঝতাম না। কিন্তু শব্দগুলোর উষ্ণতা টের পেতাম।

বুঝলাম কলেজে এসে। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে আমার উৎসাহ তেমন ছিল না। আমার পছন্দের দিক নাটক, গান। ইউনিয়ন লাল। তার ওপর আমি আবার কমিউনিস্ট-সন্তান। সুতরাং একটু বেশিই ঘনিষ্ঠতা সূত্রে শব্দগুলোর অর্থ বুঝলাম। বুঝলাম, সোভিয়েত দুর্গ পতনের পরে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সারা পৃথিবী জুড়ে আরও বেশি সর্বত্রগামী হিংস্র ও সক্রিয়। কলেজ ক্যান্টিনে তখন 'পুঁজিবাদ' 'প্রলেতরিয়েত' 'সমাজতন্ত্র' 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত' মেখে পাঁউরুটি ডিমের ঝোল আমার রোজকার রুটিন আনন্দ।

এখন এ বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী। আমি আর বউ না না স্যরি, বউ আর আমি। ছোটভাই ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশে থাকে। সন্তান নেই বলে আমাদের দু-জনেরই মনে চাপা দুঃখ। আমাদের যেদিন দুঃখ উপচে ওঠে, আমরা সেদিন ডিম খাই। আমার বউয়ের আর কোনও দ্বিতীয় দুঃখ নেই। আমার দ্বিতীয় দুঃখ—আমাকে আমার বউ ডিম কিনতে দেয় না। আমি ডিম কিনলেই নাকি বাড়ি ঢোকবার আগেই তারা ফেটে যায়।

ওই একটাই গোপন কাঁটা আমার শুধু ডিম খাবার নয়, জীবনের সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছে।

আমার স্থির বিশ্বাস—এর পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। কিন্তু চক্রান্ত থাকলে তার এক বা একাধিক কারণ থাকবে। এর পেছনে কে বা কারা, তাদের মতলবটাই বা কী—এই সব কঠিন কঠিন ব্যাপার নিয়ে চিন্তা শুরু করতে গেলেই বুক কেঁপে ওঠে, শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে ওঠে, আমি ঘামতে শুরু করি। আর ঘাম হলেই আমি শারীরিকভাবে খুব

চাঙ্গা হয়ে উঠি। তখনই ফেলুদার মতো সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকি—বিশ্লেষণ করতে থাকি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের—কার কার কী কী স্বার্থ থাকতে পারে।

চক্রান্তকারী এক নম্বর—বউ। ধ্যুত্তেরিকা—এই লিস্টে বউ এলো কোত্থেকে? ছিঃ, বউকে নিয়ে এরকম চিন্তাও পাপ। বউ তো সবসময়েই সত্যি। ধ্রুব সত্য। সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রসঙ্ঘ। যা ধ্রুব, তার আবার ডিসেকশন হয় নাকি? বউয়ের আবার কিসের স্বার্থ? বউ সব সন্দেহের উর্ধে। সুতরাং—বউ কাটা।

দু-নম্বর—পাঁচুর মা। ওর সঙ্গে বাড়ির কাজের যা যা শর্ত, তার মধ্যে অবশ্যই নিয়মিত ডিম কেনা নেই। শুধুমাত্র ডিম কেনার জন্য ও মাসের মাইনেতে কোনও বোনাস পায় না। ডিম কেনার টাকা থেকে খুচরো ইচ্ছে হলেও ঝাড়ার কোনও সুযোগ নেই। যদিও পাঁচুর মা মানুষটা খুবই নিরীহ ও সজ্জন। বাজার ফেরত আমার থেকেই রোজ পাই-টু-পাই হিসেব বুঝে নেয় বউ। পরিমলের দোকানে একদিন কয়েনের বাটিতে আধুলি ছিল না। আমি বলেছিলাম—ছাড়ো তো পরিমল, আট আনার জন্য অতো চাপ নিও না, বাকি খদ্দেরদের দেখ, সবাই অফিস-তাড়ায় আছে—বরং মনে থাকলে পরে অ্যাডজাস্ট করো। রাত্রে আমি অফিস থেকে ফিরতে চায়ের কাপ টেবিলে ঠকাস করে রেখে বউ বলেছিল—সকালে আট আনা কম ফেরৎ দিয়েছ। এরকম ঘটনা প্রথম প্রথম পাঁচুর মায়ের সাথেও হয়েছে। তবে নিতান্তই দু-একবার। তাড়াহুড়োয় সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ টাকাটা দিতে ভুলে গেছি হয়তো, বা হয়তো হাতের কাজটা শেষ করে হিসেব করে ফেরৎ দেবে ঠিক করেছিল পাঁচুর মা। কিন্তু মিনিট দু-তিন অপেক্ষার পরেই আমার বউয়ের গলা ধৈবতে—কী হলো পাঁচুর মা? ফেরত আসেনি কিছু? ব্যাস, ঝাঁটা ফেলে কিম্বা গ্যাসউনুনের সুইচ ঘুরিয়ে দৌড়ে এলো পাঁচুর মা—দাদা বেরুবেন, তাই ভাবছিলুম ঝাঁটটা দিয়ে নিই আগে, অথবা তরকারিটা নেগে যাচ্ছিলো তাই—কিন্তু ভবি ভোলেনি। ওই প্রথম দু-একবারের পরে পাঁচুর মা-ও আর ওই ভুল করেনি কোনদিন। কাজেই পাঁচুর মায়ের যুতসই দাঁড়াচ্ছে না। পাঁচুর মাও কাটা।

বউ গেলো, পাঁচুর মাও গেলো। তিন নম্বর কে? এই চক্রান্ত রহস্যের মধ্যে আমাকে ছাড়া আর তো কোনও মনুষ্যচরিত্র নেই। মনুষ্যচরিত্রের বাইরে আছে ডিম। তাকে বিশ্লেষণ করে ফেসবুকের স্মাইলির মতো স্বর্ণালি কুসুম ছাড়া আর কিছু বেরবে না। তার মানে, চক্রান্তটা গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। সরাসরি মঞ্চে অবশ্যই আর কোনও চরিত্র নেই। কিন্তু উইংসের পাশে, ব্যাক স্টেজে? অডিটোরিয়ামের বাইরে? রাস্তার ওফুটে? গঙ্গার ধারে? অন্য শহরে?

যেমন—লোকনাথ ভাণ্ডার। যার মালিক শেখর। মানে যে দোকান থেকে ডিম আসে, মানে যে দোকান থেকে কিনে বাড়ি আসতে আসতে আমার হাতে চারটে ডিম ফেটে গিয়েছিলো কবে সেই দ্বাপর যুগে একবার—সেই শেখর কি সন্দেহের তালিকায় নেই? তার তো ডিম বিক্রি হওয়া নিয়ে কথা। সে আমিই কিনি বা পাঁচুর মা কিনুক। তাতে শেখরের কিছু আসা-যাওয়ার কথা নয়। সেই শেখর হঠাৎ আমাকে বেছে বেছে ফাটা ডিম দেবেই বা কেন? কী মতলবে? শেখরের বয়স চল্লিশের কোঠায়। আমার চেয়ে বছর কয়েক ছোটোই হবে। পাঁচুর মাকেও বলতে নেই দেখতে একেবারে হাড়গিলে ছিবড়ে গোছের। শেখরের সেরকম উরুসন্ধির দোষ আছে কিনা জানি না, থাকলেও এ ক্ষেত্রে চান্স নেই। শেখর বিজেপি করে, তাই হয়তো দোকানের নাম রাখে লোকনাথ। আমি কংগ্রেস সিপিএম বা তৃণমূল সমর্থক—এমন কোনও তথ্যও ওর কাছে থাকার কথা নয়, কারণ, আমি কাকে ভোট দিই, সেটা আমার বউই জানে না, শেখর তো কোন ছার। কাজেই আমাকে শুধুশুধু জব্দ করার কোনও কারণ নেই। এই ষড়যন্ত্রে কোনও রগরগে অথবা লোকাল রাজনৈতিক গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না।

তাহলে এই সম্ভাব্য চক্রান্তকারীদের তালিকা থেকে শেখর বাদ। ডিম বাদ। বউ বাদ পাঁচুর মাও বাদ। মাও যখন বাদ, তখন মার্ক্সও বাদ। লেনিনও বাদ। পুঁজি অর্থাৎ ডিম তো আগেই বাদ হয়ে গেছে। তাহলে আর হাতে রইল সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ চক্রান্তটা আরও অনেক বড়ো এবং গভীরতর চক্রান্ত! এরকম কথা আগেও শুনেছি—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চায়, পৃথিবী থেকে কমিউনিজম মুছে ফেলতে। কারণটা বিশদে বুঝতে পারবেন হয়তো পোড় খাওয়া রাজনীতিবিশারদরা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা মনে হচ্ছে—পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কৌশলে যে কমিউনিস্ট নিধন চলছে, আমার ব্যাপারটা তারই একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টামাত্র। আরে বাবা, আমি কমিউনিস্ট পার্টি করি না ঠিকই, কিন্তু আমার বাবা তো কমিউনিস্ট ছিলেন। ওনার রক্ত তো আমার শরীরেও বইছে। তাই আমিও ওদের অন্যতম টার্গেট।

হ্যাঁ, এইবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীর অদৃশ্য কালো হাত আমার হাতে ধরা ঠোঙার দিকে সকলের নজর এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আমিও টের পাচ্ছি না। ডিমগুলোকে গোপনে স্পর্শ করছে। ডিমগুলো ফাটবার কথা বোমার মতো। একের-পর-এক। নিঃশব্দে।

কিন্তু ফাটেনি। একবার। আমি বুঝিনি। আমার বউ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। এবং এটাও নিশ্চয়ই জানে যে, ওরা আবার চেষ্টা করবে। আঃ, এতোদিনে বুঝলাম, আমার বউ কেন আমাকে আর কোনোদিন ডিম কিনতে পাঠায়নি।

বউ, তোমার জন্য গর্বে আমার বুক আরো ফুলে উঠলো। আর মিঃ বারাক ওবামা, আমার বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য আমি আপনাকে অভিযুক্ত করলাম।

সেই লোকটা

ভবানী ঘটক

আশ্চর্য, লোকটাকে আমি প্রতিদিন দেখি। কার মতো যে দেখতে, ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে। কোনো আত্মীয়স্বজন, কোনো কাছের বন্ধুবান্ধবের মতো তার মুখের আদলটা হবে। তবে হুবহু কারোর মতোই নয়। অনেক পরিচিত আদলের একটু একটু পরিচিত ভঙ্গিমার, আচরণের একটু-একটু ওর মধ্যে মিশে আছে। তার কোনো একটাকে বিশেষভাবে ধরলে যে সম্পূর্ণ লোকটা আসবে, এমন নয়। আর এই লোকটাই এখন আমার সবকিছুর মূলে—একেবারে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকটার সঙ্গে আমার এক তীব্র অথচ শীতল দ্বন্দ্ব, একটা মানসিক লড়াই চলছে। হ্যাঁ, একে লড়াই ছাড়া আর কী বলা যায়? লড়াইয়ের প্রতিটা অবস্থায় আমার অবর্ণনীয় দশা কোনো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। বুঝি, কিন্তু কী করব আমি, ঈশ্বর! ইচ্ছে করেই বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টা করি। কেননা, ওকে ভুলতে না পারলে আমার যে মুক্তি নেই, তা মনে মনে অনুভব করি। নইলে আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো, চেতনা, রুচি নষ্ট হবে, হবেই। কিন্তু চেষ্টা করে ভুলতে গিয়ে দেখেছি, আমি আরও বেশি করে তার স্মৃতিতেই ডুবে যাই। ওঃ, কী বিশ্রী সেই মুহূর্তগুলো, যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়! রাস্তাঘাটে, দোকানে-বাজারে অবিশ্বাস্যভাবে ঠিক উদয় হবেই। লোকটা মাঝবয়সী। প্যান্ট-শার্ট পরে, কখনো-সখনো ধুতি পাঞ্জাবি। প্রথম প্রথম আমার দিকে সরাসরি তাকাত—যখনই দেখা হত, একেবারে চোখে চোখে। একধরণের চাপা স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ত তার ঠোঁট জুড়ে, গোঁফের আড়ালে। কিন্তু আমি ঝট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েই অন্যদিকে তাকাতাম। একবারও ফিরে দেখিনি, সে মুহূর্তে লোকটার চোখমুখের অভিব্যক্তি কেমন হত। আমার কাছ থেকে অবাঞ্ছিত ব্যবহার পেয়ে লোকটার কেমন প্রতিক্রিয়া হত। অথচ আমার দেখতেও ইচ্ছা করে। আর ইচ্ছাটা তরতর করে যতই প্রবল হত, ততই নিজের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সংগ্রাম চলত—না; আমি ওকে আর দেখব না, ফিরে তাকাব না কিছুতেই। দেখাই যাক—না, কি হয় এর পরে। কিন্তু ফের দেখা হত। আবার সেই হাসি, আর আমারও আবার ঠিক সেইরকম . . . আচ্ছা, কেন আমি এমন করি? নিজেকে শুধাতাম। কেমন যেন মনে হত, লোকটা আমার দিকে করুণার দৃষ্টি নিয়ে তাকায়—হ্যাঁ, প্রচ্ছন্ন এক করুণা ঝরে পড়ে ওর চোখ দিয়ে, ওর হাসি দিয়ে, ওর . . . । আর অম্‌নি আমার নখের থেকে চুল অবধি একধরণের ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ত—তুমি কোন পীর হে যে করুণা করবে? আমি কি করুণার পাত্র? শুধু তুমি কেন, আমি কারোরই করুণার পাত্র হতে যাব কেন? কেন?

এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে, এই ভাবনার সঙ্গে ঝটিতে আমার চোখ সরানোর ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটে যেত যে আমি সত্যিই অবাক হতাম। এসব কিছু ভেবেই কি চোখ সরাতাম, না চোখ সরানোর পরে ভাবতাম, না কি দুটো কাজ একসঙ্গে হয়ে যেত তা অবশ্য আজও বুঝিনে। সে যাই হোক, তার দিকে আমি বেশিক্ষণ তাকাতে পারতাম না, এখনো পারিনে। আমার ভয় করে, হ্যাঁ—ভয়, আর গোপনে একধরণের লজ্জাও। মনে হত। আমি যদি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে হয়তো আমার পক্ষ থেকে সায় পাবে, হাসিটাকে ঠোঁটে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করবে, তারপর অদ্ভুত কোনো কায়দায় আমার সামনে এসে পরিচয় করবে। আর আমাকেও ভদ্রতার খাতিরে আলাপ করতে হবে, মাপা মাপা কথা বলতে হবে, পরিমিতি বোধের পরিচয় দিতে হবে—নইলে তুমি অসভ্য। তারপর কথার আদানপ্রদানে ভাবের আদানপ্রদান যদি-বা হয়, তাহলে লোকটা সুযোগ পেয়েই আমাকে বলে দেবে—তুমিও এক ধ্বস্ত মানুষ, তোমাকে আমি প্রতিদিন দেখি, তোমার সঙ্গে . . . ইস্‌স্‌, কী অসহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সেটা। আমি তা চাইনে।

কিন্তু কিভাবে বোঝাব, আমার চাওয়া না-চাওয়ার উপরে পৃথিবীর কোনো ঘটনা-ই শেষপর্যন্ত নির্ভর করে না। আমি না চাইলে কি ওই লোকটা আমার দিকে হাসি হাসি মুখ নিয়ে, করুণার দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে না? আমি না চাইলে কি আমার এই ভাবনাগুলো, এই আচরণ চলতে থাকবে? তার একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, বিকেলের যে-সময়টাতে আমি বাইরে বেরোই, আর অনিবার্যভাবে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তার অনেক পরে—সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোব। আর বড়ো রাস্তা ধরে না গিয়ে ভিতরের গলি-পথ দিয়ে আড্ডার ঠেকে যাব। এইভাবে যদি লোকটাকে কয়েকদিন এড়ানো যায়। তারপর একসময় নিশ্চয় ও আমাকে ভুলে যাবে, তখন . . .

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর তিনদিন বাড়ি থেকে বেরোইনি। অথচ কি অদ্ভুত, বাড়িতে আমার নির্জন সময়গুলো তার স্মৃতিতে ছাড়া কাটেইনি। আর যখন লোকটার হাঁটা-চলা-হাসি, তাকানোর ভঙ্গিমা ছবির মতো মনের পটে ভেসে উঠেছে, তখনি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে আদৌ সহজ নয়। তিনদিন ধরে কী নিষ্ঠুর খেলা নিজের সঙ্গে খেললাম যে, উফস্‌! সারাদিন বাড়িতে বসে বসে কাটানোর পর যখন ধীরে ধীরে দুপুর

গড়িয়ে বিকেল হত, আমার বাইরে বেরোনোর সেই নির্দিষ্ট সময়টা প্রতিদিনের মতো এগিয়ে আসত, তখন আমি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে পড়তাম। কি এক অমোঘটানে বাইরে যাওয়ার জন্যে আমার মনপ্রাণ এমন চঞ্চল হয়ে উঠত, আমি বেশ অস্থির হয়ে পড়তাম। যেন কেউ জোর করে আমাকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যাবেই। হা ভগবান, আমার অভ্যাসের কাছে আমি কত অসহায়! এই সেই অভ্যাস—অন্ধকারের অসত্য আগুন? . . . প্রথমদিন যন্ত্রের মতো উঠে গিয়ে জামা-প্যান্ট পরেও নিয়েছি। ঠিক বেরোতে যাওয়ার মুখে ভাগ্যিস মা বলল—শোন্, সারাদিন শুয়ে শুয়ে কাটালি, কি হয়েছে তোর?

—কিছু না।

মা কাছে এল—আজ না বেরোলেই নয়?

ব্যাস্; আমিও থমকে গেলাম, আমার তো বেরোনোর কথা নয়। এ আমি কি করছি? এ আমি কি করছি? বাইরে বেরিয়ে সত্যিই জগতের কোন মহৎ কাজটাই-বা আমি করব? বাইরে গিয়ে যদি ওই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয় তবে আমার কাছে আমি হেরে যাব? . . .

দুপদাপ করে ছাতে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ একলা একলা পায়চারী করে শেষে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। বিকেলের পড়ন্ত নিস্তেজ রোদ আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে পায়ের কাছে প্রণত হয়েছে। আমার ছায়াটা এখন দীর্ঘ, প্রলম্বিত। ভিতরে ভিতরে যেন নিবিড় এক শান্তিতে বুক ভরে আসছিল আমার। ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেলি—ঠিক আছে, কয়েকদিন বাইরেই যাব না, নাহ্—যাবই না।

আর ঠিক এরপর থেকে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে চলল—চলেছে—আরো কত-কতদিন ঘটতে থাকবে, তা আমি জানি না। বাড়িতে দ্বিতীয় দিনও সেই এক অসহ্য ছটফটানির মধ্যে কাটালাম বটে, কিন্তু তৃতীয় দিন নিজেকে ঠিক রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। আচ্ছা, আপনাদের কি এমন মনে হয়, হয়েছে কখনো যে, একটা মানুষের কেবলমাত্র গোঁফজোড়া দেখছি, গোঁফের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়া কয়েকটা খাড়া খাড়া গোঁফের চুল . . . দেখতে দেখতে মানুষের মুখখানা বিড়াল হয়ে উঠল! উফস্, কোনো সময় হয়তো লোকটার শুধু নাক ভেবেছি, আর মাথার মধ্যে চট করে সাপের ছবি ফুটে উঠেছে। আবার কখনো ভুরুর আড়ালে থাকা তার সেই চোখদুটো, যা তীক্ষ্ণ, সপ্রতিভ, অথচ. . .ভাবতে ভাবতে সেদিনও বিকেল উতরে সন্ধ্যা নামল। বাড়ির পাশের ঢ্যাঙা নারকেল গাছদুটো, গলির মোড়ের নিমগাছটাও অন্ধকারে ডুব দিল। আর ঠিক এই সময় আমার সবকিছুকে ওলোটপালোট করে দিল বিপুল ও কল্পনা এসে। বিপুল এলেও আসতে পারে, মাঝে মাঝে ও আমার এখানে আসে, আমিও যাই ওদের বাড়িতে। একসঙ্গে বসে বিসিএস পরীক্ষার জন্যে নোট তৈরি করি আমরা। কিন্তু কল্পনা এসেছে যে—সেই কল্পনা। আমার ছোট্ট ঘরের খাটের পরে বসেছে কল্পনা। বসে আছে কুঁচি দেওয়া শাড়িটা পায়ের পাতার 'পরে বিছিয়ে। অনেকটা নাথবতী অনাথবতের বিজ্ঞাপনের ঢঙে বসেছে। ওর দিকে তাকাতেই আমার বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। কল্পনার চোখে চোখ পড়তেই আমাকে বলল—তিন-চার দিন তোমার কোনো পাত্তা নেই, কি ব্যাপার?

—কই, কোনো ব্যাপার না তো।

—ব্যাপার নয়?

—না।

—অথচ তুমি . . . তোমার. . .

বক্তব্য শেষ না করে রহস্য সৃষ্টি করল কল্পনা। তার থেকেও অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত পেলাম বিপুলের সঙ্গে ওর কেমন এক চোখাচোখিতে। কেন ওরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে তাকাচ্ছে? সহজ স্বাভাবিক হয়ে সবকিছু বলছে না কেন? তবে কি আমার সম্পর্কে ওরা অন্যরকম ধারণা করেছে? কী ধারণা, কী? . . . আমি যেন একটু-একটু করে বিমর্ষ হয়ে পড়ছি। নানান চিন্তা, প্রশ্ন মাথায় এভাবে উঁকি দিলে আমিও সহজ হতে পারব না, ছি ছি। মনে মনে সংযমী হতে থাকি, যাতে ওরা বুঝতে না পারে, চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছি, আর কল্পনাকে দেখছি। পান্নারঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে কল্পনা। পাকা গমের মতো গায়ের রং ওর। দু-হাতের আঙুলে গোলাপি নেলপালিশ। 'দ'-এর মতো ভাঁজ করা হাঁটুতে কখনো নিজের থুত্‌নি রাখছে, কখনো তুলছে-বা। একদিন কাপড়ের আড়ালে ঢাকা ওর নাভিকুণ্ড হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম। সারারাত সেদিন ঘুম হয়নি আমার। ওঃ, কল্পনা। . . . সত্যি, কল্পনাকে যদিও ভালো লাগছে এ সময়, কিন্তু বিপুলের প্রত্যেকটা কথা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। বিপুল আমার দিকে তাকাল—ঠিক করে বল তো, কি হয়েছে তোর?

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওই সময় আমি নির্ঘাৎ চিৎকার করে উঠতাম—কিচ্ছু হয়নি, কেন তোরা এসব প্রশ্ন করছিস—যদি না মা ঘরে ঢুকত, চায়ের কাপগুলো ধরিয়ে না দিত। মায়ের ঘরে ঢোকা, ওদের সঙ্গে একটু ভদ্রতার আলাপ সারা, আর চলে যাওয়ার মধ্যে আমি বেশ সময় পেয়ে গেলাম। আমার চট করে মনে হল, এসব আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না তো। আমি যে অসুস্থ নই—সবল, সক্ষম, সুস্থ যুবক তা দেখিয়ে দিতেই হবে। ওদের সঙ্গে এখুনি বেরোব। নির্দিষ্ট ঠেকটাতে, সেই নির্দিষ্ট পাঁচ-ছজন বন্ধু ফের আড্ডায় মশগুল হব। কিংবা কল্পনাদের বাড়ির ছাতে। ওদের সঙ্গে তো প্রাণখুলে সেই লোকটার কথা আমার কোনোদিনই বলা হয়নি। অথচ কতবার তো বলতে চেয়েছি। আজ বলব। . . .

তখন সন্ধ্যা গড়িয়েছে। আমরা তিনজন হেঁটে চলেছি। তিনদিন পরে, যেন দীর্ঘদিন বাদে রাস্তায় বেরিয়ে পরিচিত সবকিছুকেই নতুন নতুন লাগছে। ওরা অনেক কথা বলছে—হাসির কথা, রঙ্গের কথা, গানের কথা। আমি কোনোটা শুনছি, আবার শুনছি না। বাইরে বেরোবার জন্যে এক দিলখুস্ ভাব লাগছিল মনে মনে। তাড়াতাড়ি ওদেরকে বললাম—ডানদিকের গলিতে চল। গলি দিয়ে যাব।

ওরা কোনো প্রতিবাদ না করে, আমার সঙ্গে গলিতে ঢুকল। আর কি অদ্ভুত, গলির সামনের বাঁকটা ছাড়িয়েই দেখি, আলো-আঁধারির মধ্যে দুটো মানুষের মূর্তি আমাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রলোকের হাঁটার ভঙ্গিমা আবছা থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর হতেই আমার হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসছিল। আর প্রতিটা পদক্ষেপেই কাতর প্রার্থনা করে চলেছি—যেন সে না হয় ঈশ্বর, যেন সে না হয়।

অথচ সে, সেই লোকটা—একটা শনি।

কিভাবে যে বোঝাব ওই মুহূর্তটুকুর নাটকীয়তা। ক্রমশ মূর্তিদুটো পরিষ্কার হল, ক্রমশ আমাদের মধ্যে দূরত্ব কমে এল। আমি বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, লোকটার আচরণ দেখে—এ-ও কি সম্ভব! সেই তো দেখল আমাকে, সেই তো চোখাচোখি হল, তবু মুখের সেই স্মিত হাসিটা কোথায়? তবে কি লোকটা আমাকে ভুলেই গেছে না কি দেখেও না দেখার, চিনেও না-চেনার ভান করল? ওহ্ ভান—চতুর্দিকে শুধু ভান, অসহ্য।

কয়েক পা সামনে গিয়ে ওরা-ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিপুল একটু পিছিয়ে এসে বলল—দাঁড়ালি যে?

আমি আনমনে অল্প কথায় জবাব দিলাম—কিছু না, চল।

আমার যে কি হল—সন্দেহ থেকে আরেক সন্দেহে, কৌতূহল থেকে কৌতূহলের পিছনে ছুটতে ছুটতে পাকে পাকে আমি লোকটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। ঠিক পরদিন আবার আগের মতোই বাইরে বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় ওঠার মোড়ে এসেছি। ভিতরে ভিতরে একটা ইচ্ছা কাজ করে চলেছে—অন্তত আর একবার লোকটাকে দেখতে হবে, সত্যিই আমাকে ভুলে গেছে কি না। ভান করেছিল কি না। না কি, কোনো সুন্দরী মহিলাকে পাশে নিয়ে চলার গর্বে উদাসীন ছিল কিনা। . . . শীতের বেলা হুট করে ফুরিয়ে এসেছে। বড়ো ক্যাসেটের দোকানটা থেকে, ডানদিকের পানবিড়ির দোকান থেকেও টেপরেকর্ডের মিউজিক, আর কি এক গানের সুর আছড়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে কোনো এক রাজনৈতিক নেতার অনর্গল বক্তৃতা মাইকের চোঙ থেকে ছিটকে ছিটকে হাওয়ায় মিশছে। শব্দের সমূহ মিশ্রণে মোড়টাতে এক উদ্ভট পরিবেশ। মাইকে বক্তার ক্ষুব্ধ স্বর ফেটে পড়ল—''এইভাবে গণচেতনা গড়ে তুলতে হবে। বন্ধুগণ, গোটা দেশকে, জাতিকে নষ্ট করার, বিপথে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কারোর নেই। আপনারা . . .'' ঠিক এই সময় আমার দৃষ্টি রাস্তার উলটো ফুটে যেন গিঁথে গেল। এ কোন দৈবযোগ! আমার মনের ইচ্ছা বাসনা এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে যে তা আমি কিভাবে জানব! আমি তখন কোনো গান, মিউজিক, কোনো বক্তৃতা, শব্দ আর শুনতে পাচ্ছি নে। সমস্ত চেতনায় তখন সে—সেই লোকটা।

আমি নিশ্চিত, আমিই ওকে আগে দেখেছি। লোকটা ওই ডানফুট ধরেই টুকটুক করে এগিয়ে এল। একেবারে আপনমনে, নিজস্ব স্বাভাবিক ছন্দে। বুকের মধ্যে উত্তেজনা চেপে এ পাশের ফুটে দাঁড়িয়ে ওর দিকে নজর রেখে দিয়েছি। লোকটা আমার সমান্তরালে এল, যেমন করে অন্যদিন আমাকে দ্যাখে ঠিক তেমন করে আমার দিকে তির্যকভাবে তাকাল—অথচ, হায়, অত্যন্ত উদাসীন ম্যাড়মেড়ে দৃষ্টিতে তাকাল, আর তেমনি ঔদাসীন্যে আমার ওপর থেকে চোখটা সরিয়ে নিল। কোনো ভান নয়—না, কোনো ভণিতা-ভণ্ডামির বালাই নেই তার হাবভাবের মধ্যে। চাহনিতে শুধু এক উদাসীনতা, এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি, কিংবা তাচ্ছিল্য। . . .

ব্যাপারটা আমার মাথায় রোখ চাপিয়ে দিল।

পরদিন রাস্তায় বেরিয়েই ভাবলাম, যে-ফুট ধরে লোকটা হেঁটে আসবে সে-ফুট ধরে আমিও তার দিকে হেঁটে যাব। তার গায়ে এক ধাক্কা মারব। তারপর দেখব তুমি কেমন উদাসীন থাকো। আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চলবে কেন? আমি তো মানুষ। আমাকে তুমি চিনতে। আমার সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার কোনো-না-কোনো অনুভব আছে, প্রতিক্রিয়া আছে—আছেই।

আমি জানি, আমাকে আপনারা কেউ ক্ষমা করবেন না। মঙ্গলময় ঈশ্বরও কোনোদিন ক্ষমা করবে না। কেননা, লোকটাকে আমি সত্যিই এক ধাক্কা মেরেছিলাম, হ্যাঁ, ইচ্ছা করেই। আরো একটু জোরে ধাক্কা দিলে লোকটাকে ধপাস করে ফেলে দিতেও পারতাম। আমার মধ্যে তখন কোনো লজ্জাশরম বোধ কাজ করেনি। দূর থেকে লোকটাকে দেখে নিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে তার হাঁটবার গতিবেগ। তারপর তক্কে তক্কে থেকে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আর, রাস্তার ডানফুটে ঠিক লন্ড্রির সামনে মুখোমুখি হতেই, ওহ্, ধাপ করে ধাক্কাটা মেরে দিলাম,—অভদ্রের মতো, অত্যন্ত অশালীনভাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ভান যা করার আমিই তো করলাম! ধাক্কা খেয়েই লোকটা আঁক করে আঁতকে টলে পড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ডান বাহুটা খপ করে ধরে ফেলেছি—ইস্‌স্, একদম দেখতে পাইনি।

যেন আমি না, অন্য কেউ আমার ভিতর থেকে বলে উঠল। আমার আঙুলগুলো লোকটার বাহুতে বিশ্রীভাবে চেপে বসেছিল। হঠাৎ অনুভব করলাম, লোকটা আমার মুঠো থেকে তার বাহু ছাড়াতে চাইছে। ছেড়ে দিয়েই ফের বললাম—বিশ্বাস করুন, বুঝতে পারিনি।

আমি কেমন বেমালুম দুটো মিথ্যে কথা বলে ফেললাম। বুকটা ডলতে ডলতে অতীব ভদ্রভাবে, নম্রকণ্ঠে সে বলল—ঠিক আছে।

তখনো আমার দিকে পরিষ্কার করে লোকটা তাকায়নি। কিন্তু এত সহজে আমি ওকে ছেড়ে দিতে চাইনি, ছেড়ে দেব-ও না। বললাম—খুব লেগেছে, না?

তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে রয়েছি। ভিতরে উত্তেজনার স্রোত বয়ে চলেছে আমার—এই তো তোমাকে এখন পেয়েছি, তোমাকে আজ ছাড়ব না। অথচ লোকটার মুখে কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই।

ফের বললাম—আপনার নিশ্চয় খুব লেগেছে।

এই এতক্ষণে লোকটা পরিষ্কারভাবে আমার মুখে তাকাল। হ্যাঁ, কী যন্ত্রণাদায়ক! ওই এক পলকের দৃষ্টি বিনিময়েই লোকটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, তার কিছুই হয়নি। যেন নিতান্ত পথচলতি, তুচ্ছ একটা ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর এমনি স্পষ্ট এক অবহেলার দৃষ্টি। আর আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে দুটো শব্দ ভাবলেশহীনভাবে তার মুখ থেকে বার হল—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

এ তো আমি চাইনি। লোকটা আমার মুখে সপাটে এক থাপ্পড় কষাতে পারল না? এতক্ষণ ধরে আমার প্রয়াসকে, আর আমাকে এতটাই গুরুত্বহীন করে তুলল? কেন? তুমি কি অতিমানব যে তোমার কাছে কোনো কিছুর মানবীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই? না কি তুমি মহামানব? এই পৃথিবীতে কোথাও আজ অন্তত একজন মহামানবও তো অবশিষ্ট নেই। তবে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি লোকটার চলে যাওয়া দেখছিলাম। অথচ ওই লোকটার সঙ্গেই এইমাত্র আমার সংঘাত হল! ওকে আমি ধাক্কা মেরেছি। আরো জোরে মারলে ওকে আমি ফেলে দিতেও পারতাম। তাই হয়তো আমার উচিত ছিল।

ঠিক এই মুহূর্তে কুৎসিত মতলবটা হঠাৎ মাথায় খেলে গেল।

আমি লোকটার পিছু নিলাম। আট-দশ গজ দূরত্ব রেখে রেখে ওর পিছনে ধাওয়া করলাম। এমন চতুরভাবে যাতে করে আমি সবসময় চোখের সামনে ওই শনিটাকে রাখতে পারি, কিন্তু ও আমাকে দেখতে পারবে না। এখন কোন জায়গায় লোকটা যায়, আমি দেখব। এই শহরের কোন বাড়িটা ওর, আমি চিনব। আমার থেকে লোকটা কতটা সচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত, কতটা উঁচুতে, কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক—এই সবকিছু খুঁটিয়ে জানতে হবে, বুঝতে হবে আমাকে। একবার যখন সংঘাত হল তোমাকে তো এমনি ছেড়ে দেব না। . . .

তো চলেছি ফেউ লাগার মতো অনুসরণ করে। লোকটা একটুও জানতে পারছে না, বুঝতেই পারছে না। ভয়, কৌতূহল, না প্রতিশোধস্পৃহা—ঠিক কোন শব্দটা দিয়ে যে আমার মানসিক অবস্থা বোঝাব, জানি না। যেন এক অলৌকিক আকর্ষণের টানে টানেই চলেছি। অথচ আমি মূর্খ নই, বোকা নই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর উতরানোর বিদ্যাটুকু অর্জন করেছি। আর আমি যদি বোকা হই তবে চালাক কি বাড়ির বিড়াল-কুকুর! কিন্তু এখন তো আমাকে উদ্বেল করে তুলেছে এই প্রশ্ন—কে এই লোকটা? কী চায় ও? আমার মৃত্যু? তাই যদি ওর কাঙ্ক্ষিত হয়, তবে সে এত সহজে তো হবে না? তার আগে অন্তত ওকে আমি শেষ করব। কেননা, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে সবসময় আমি বড়ো এক পরিণতির কথা ভাবি। আমার মৃত্যু যেন ভীষ্মের মতো মহান কোনো পতনের ধরণে হয়। সে তো ওর ইচ্ছাতে হবে না, হতেই পারে না।

প্রায় মিনিট পাঁচেক হয়ে গেছে, আমি পিছন পিছন হাঁটছি। লোকটা যেভাবে হাঁটছে আমাকেও সেভাবে হাঁটতে হচ্ছে। বাঁদিকে ঘেঁষে হাঁটলে আমাকেও ওর পিছনে বাঁদিকে ঘেঁষতে হচ্ছে। ডানদিকে ঘেঁষলে, ডানদিকে। এখন ওর যে-যে অসুবিধা হচ্ছে, আমারও সেই সেই অসুবিধা। বরং আমারই বেশি অসুবিধা, কেননা, আমাকে যে অনুসরণ করে চলতে হচ্ছে।

এমন সময় লোকটা ঝট করে ফুটপাথের উপর পানবিড়ির দোকানটাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তো অবাক। থম করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, লোকটা কি আমাকে দেখেছে? দেখলে-বা কী? দ্যাখে দেখুক, যা হয় হোক, আমিও প্যান্টের দুই পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে ধীর অথচ কঠিন হয়ে ওর বাঁ পাশে দাঁতে দাঁত চেপে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। আর সামনের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি ভাসিয়ে রাখলাম যেন লোকটার আচরণ না তাকিয়েও আমি দেখতে পারি, বুঝতে পারি। মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছি, বুঝি এইবার কোনো অঘটন ঘটবে। . . . হঠাৎ লোকটা আমার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের আঙুলগুলো প্যান্টের পকেটের মধ্যে মুঠিবদ্ধ হয়ে উঠল। তবুও লোকটাকে আমি না-দেখার ভান করে চলেছি। লোকটা চট করে, দোকানের ঝাপের নীচে এক পা এগিয়ে দাঁড়াল। আমিও এক পা এগিয়ে ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। কপালের রগদুটো আমার দপদপ করছে। মনে মনে প্রমাদ গুনে চলেছি। ধীরে ধীরে আমি যেন নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলছিলাম। সমস্ত ঘটনার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, বাঁধন নেই . . . হা ঈশ্বর, লোকটা আমার দিকে ফের তাকাল। আর এইবার আমিও ওর চোখে সরাসরি, স্থিরভাবে চোখ রাখলাম। এক দুই তিন চার

সেকেন্ড ওর চোখের পরে আমার চোখ। অথচ কেন কে জানে, আমিই দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে, কেননা লোকটার দুই ভুরুর মাঝে কয়েকটা রেখার ভাঁজ দেখলাম। বোধহয় কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে লোকটা, স্মরণ করছে, কিংবা আমাকে অনুধাবন করছে। কিন্তু কি বুঝতে চায়? বুঝেই-বা কী করবে? আমি চেপে নিশ্বাস ছেড়ে চলেছি। ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিলাম না আর। এখুনি কি এইসব কিছুর নিষ্পত্তি করে ফেলব? শনিটার পায়ে মাথা কুঁটে বলব নাকি—দোহায়, আমাকে আর জ্বালিও না। তুমি কে, হে উন্নত জীব? বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। . . .

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। আমি কি অক্ষম? আমার থেকে কোনদিকে ও শ্রেষ্ঠ, জানি না। তোমার পরিবারের চোখে, প্রতিবেশীর চোখে তুমি কেমন জানি না। নিজেকে তুমি কি ভাব জানি না। ভ্রান্ত মত, আদর্শ আঁকড়ে আছ কিনা, তা-ও জানি না। এইসব—এই সকল ক্ষেত্রে তোমার কোনো অসংগতি নেই? দ্বন্দ্ব নেই? প্রতিযোগিতা নেই—নিছক প্রতিযোগিতা? এমন সময় দোকানদার জিজ্ঞাসা করল—আপনাকে কি দেব?

বুকের মধ্যে তড়াক করে উঠল। সত্যি, আমি কিছু কিনতে আসিনি। পানবিড়ি সিগারেট বা কোনো কিছুর নেশাও আমার নেই। তবে এখন কি করি? আমি না-শোনার না-বোঝার ভান করলাম। হঠাৎ দেখি, লোকটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। আমিও তীক্ষ্ণচোখে ওর দিকে তাকিয়ে পড়ি। কিন্তু অদ্ভুত, লোকটা এখন আমাকেই না দেখার ভান করছে। বোধহয় আমার সম্পর্কে বিরূপ কিছু ভাবছে ও। নাহলে চাইবে না কেন? . . . এবার লোকটা ধীরে ধীরে ওর শালের মধ্যে থেকে, হাতদুটো বার করল। তারপর যেমনি সে ডানহাত বাড়িয়ে দোকানদারের হাত থেকে পানের খিলিটা নিতে যাবে, অমনি চোখের পলকে আমিও ডানহাতটা ওর সমান্তরালে সটান বাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, বিশ্রীভাবে—ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেললাম। আমার ওই বাড়ানো হাতের দু-আঙুলের ফাঁকে একখানা দশ টাকার নোট। বাঁপাশে দাঁড়ানো খদ্দের দুজনের মুখের ওপর চোখ ঠেরে একটু দেখেও নিলাম—না, কেউ তেমন সন্দেহ করছে না। হাত বাড়ানোর সময় শুধু ওই লোকটাই ঝট করে আমাকে একবার দেখে নিল। বোধহয় ভেবেছিল, ওর পানের খিলিটা আমি দোকানদারের হাত থেকে কেড়ে নেব। কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটা অত্যন্ত নির্বিকারভাবে হাতখানা গুটিয়ে আনল। পানের খিলিটা মুখে পুরল। সতেজ পানের পাতা, আর সুপুরি চিবানোর মচমচ কটকট শব্দটাও আমি শুনতে পেলাম। আর, আমাকে এড়িয়ে দোকানদার—ছেলেটা মুচকি হেসে শনিটাকেই জিজ্ঞাসা করল—সিগারেট দেব?

—দাও। গালের মধ্যে পানের পিক সামলে লোকটা উত্তর দিল।

—কটা?

—পাঁচটা দাও।

ব্যাপারটা মুহূর্তে আমাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। দুপাটি দাঁত কটকট করে পিষে আমি বাড়ানো হাতখানা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম—আমাকে সিগারেট দেবে? সিগারেট?

অমনি বাঁপাশের খদ্দের দুজন, আর সেই লোকটাও আমার দিকে তাকিয়ে পড়ল। আমার গলার স্বর অস্বাভাবিক চড়ে গেছে। দোকানদার-ছোকরা অবাক হয়ে প্রথমে আমাকে দেখল। পরমুহূর্তে মুচকি হেসে বলল—একটু দাঁড়ান।

কিন্তু আমি তো সহ্য সীমার বাইরে চলে এসেছি। ফের অভদ্রের মতো হাতখানা ঝাঁকিয়ে বললাম—দেবে, কিনা?

—দেখছেন তো একজনকে মিটাচ্ছি।

ছেলেটা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেশ ঝাঁঝিয়ে দিলাম—তুমি তো আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, তাই না?

ঠকঠক্ করে আমার হাতখানা কাঁপছিল। কিছুতেই আর সামলাতে পারছি না। সেই শনিটা পিটপিট করে আমাকে দেখছে। এখন ও আমার মুখে স্থির দৃষ্টি রেখেছে। দু-তিনজন খদ্দেরও উৎসাহিত হয়ে, মজা দেখতে তাকিয়ে আছে। অথচ আমি—হা ঈশ্বর—দোকানদার-ছেলেটা খপ করে আমার হাত থেকে নোটখানা নিয়ে নিল। হাতের কাজ রেখে বলল—কি নেবেন?

—সিগারেট।

—কটা?

—পাঁচটা।

—আরো টাকা লাগবে।

—কেন?

—চারটাকা করে হলে পাঁচটার দাম হয় কুড়ি টাকা।

এমনভাবে কেটে কেটে জবাব দিল ছেলেটা যেন আমাকে হিশাব কষা শেখাচ্ছে। ওর কথা বলার ধরণে কি এক রসিকতা, ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছিল। আর আমি একনজর শুধু ওই লোকটাকে দেখলাম—লোকটার সেই গোঁফ, সেই নাক, সেই চোখ। উফস্, মনে মনে কি ভেবেছিলাম জানি নে, আমি নিমেষে পার্সটা বার করে একখানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরলাম—দশটা সিগারেট দাও।

—মানে, এক প্যাকেট?

—তাই তো হয়!

—দোকানদার ছেলেটা ঠোঁট টিপে হাসি চাপল। সেই লোকটা আর অন্যেরা কি করছিল, দেখিনি।

রিয়্যালিটি শো

আইভি চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর শীতল ভার্মা। স্টেথো খুলে গলায় জড়িয়ে নিলেন। আকুল দু-জোড়া চোখ। চেয়ে আছে তাঁর দিকেই। রোজই এমন আকুলতার সঙ্গে দেখা হয়। এত অস্থির তো লাগে না কোনোদিন। আজ যে কেন এমন।

চশমাটা খুলে একবার হাতে নিলেন, তারপর মাথার ওপর তুলে দিলেন। কি ভেবে সেটা নামিয়ে এনে আবার অ্যাপ্রনের পকেটে রাখলেন। যেন চশমাটা রাখাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ। তারপর বললেন, 'ও এবার পরীক্ষা ড্রপ করুক। লেট হার রিল্যাক্স ফর আ ইয়ার।' আকুল দু-জোড়া চোখে এবার উদ্বেগ নেমে এল, 'না না, তা কি করে হয় ডক্টর? একটা বছর নষ্ট হবে?'

উজ্জয়িনী বলল, 'আমি এখন একদম ঠিক আছি ডক্টর। আমি পরীক্ষা দিতে পারব।' 'আমি হলের বাইরে বসে থাকব। কালকের পরীক্ষার পর আবার সোমবার পরীক্ষা। ওকে পুরো বিশ্রাম দেব।' মা বললেন।

'আমি স্কুলের সঙ্গে কথা বলছি, ও যেন সিক-বেডে পরীক্ষা দিতে পারে', বাবা বললেন।

'নো প্রবলেম। উজ্জয়িনী ইজ দা ব্রাইটেস্ট চাইল্ড অফ দ্য ব্যাচ। ওর একটা বছর যেন নষ্ট না হয়। ও সিক-বেডে পরীক্ষা দিক। দরকার হলে আমি ওকে এক্সট্রা সময় দেব। কাউন্সিল থেকে আমাদের এক্সট্রা চল্লিশ মিনিট দেবার পারমিশন আছে।' সিস্টার বললেন।

হ্যাঁ, সিস্টারও এসেছেন। সেই সন্ধে থেকেই। উজ্জয়িনী স্কুলের গর্ব। উজ্জয়িনীকে বড্ড ভালোবাসেন সিস্টার। ভালোবাসেন স্কুলের সব টিচার।

ডক্টর ভার্মা তবু অনড়। বোঝাতে বসেন উজ্জয়িনীকেই, 'জীবনে একটা বছর কিছুই নয়। জীবন অনেক বড়ো। এ বছর পরীক্ষা না দিলেই সব শেষ হয়ে যাবে, তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তোমার চিকিৎসা দরকার। ভালো ঘুম। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আমার কথা শোনো উজ্জয়িনী।' 'উই প্রমিস ডক্টর', মা কেঁদে ফেললেন, পরীক্ষার পর আমরা ওকে পুরো বিশ্রাম দেব। আর মাত্র দশ দিন। প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন। একটি মেয়ের কেরিয়ারের ব্যাপার . . .'

'কেরিয়ার'—ডক্টর শীতল ভার্মা হাসলেন। কেরিয়ার। বিদ্যা অর্জন। না, সে অর্জন জ্ঞানের জন্যে নয়। আসলে অর্থ-উপার্জনের উপায়। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই। কতকগুলো পুঁথির শুকনো পাতাকে মস্তিষ্কে ধরে রাখা কেবল। যে যত স্মৃতিধর, যে যত নিপুণভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে, তার কেরিয়ার তত মসৃণ। বিষণ্ণ হাসলেন। 'আমি আবার বলছি একই কথা। উজ্জয়িনী এ বছর পরীক্ষা ড্রপ করুক। আপনারা আমার কথা শুনুন প্লিজ।'

শহরের সবচেয়ে নামি কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী উজ্জয়িনী। বছর বছর প্রথম হয়ে স্কুলের সেরা মেয়ে হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বেশ ভালো ছবি আঁকত। ভালো ভারতনাট্যম নাচত। ক্লাস নাইনে ওঠার পর থেকে সব বন্ধ।

এখন শুধুই পড়া। স্কুলে, বাড়িতে মায়ের কাছে, দেবজিৎ-স্যারের কোচিং ক্লাসে। সিংহ-স্যারের ক্লাসে অঙ্ক, জয়ন্তী-ম্যামের কাছে কম্পিউটার সায়েন্স। মৃদুলা-ম্যামের স্পেশাল ক্লাসে ইংরেজি। নাচগান আঁকাজোকা করার সময় কই!

মা বলেন, 'নাচ শিখে কি হবে? কেরিয়ার বলতে টিভিতে রিয়্যালিটি শো। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা টিভির পর্দা জুড়ে নাচানাচি করছে। তাদের বাপ-মাকেও বলিহারি!'

বাবা বলেন, 'ঠিক তা নয়। রিয়্যালিটি শো অবশ্য আমারও পছন্দ নয়। তবু . . . আজকের দিনে প্রতিযোগিতায় ঠিক থাকার শিক্ষাটাও জরুরি। যা-ই করো, লেখাপড়াই বলো, আর নাচ গান আঁকা, তোমাকে হতে হবে দা বেস্ট। রিয়্যালিটি শো হল সেই সুযোগ।'

মা বলেন, 'লেখাপড়াটা জরুরি। নাচ গান নয়। তুমি আর এসব উল্টোপাল্টা ভাবনা মেয়ের মাথায় ঢুকিও না। দেশটা উচ্ছন্নে গেল। পণ্যমনস্ক দুনিয়ার দেখনদারি।'

মেয়েকে বুঝিয়ে বলেন, 'তপস্যা করার মতো করে পড়াশোনা করতে হবে। এই ক-বছরের জন্যে পৃথিবীর সব ভুলে যাও। একনিষ্ঠ হও। সব ছেড়ে দাও।'

এসব তর্ক শুনে শুনেই বড় হয়েছে উজ্জয়িনী। তপস্যা। ডেডিকেশন, যার বাংলা প্রতিশব্দ হল আত্মোৎসর্গ। নিজেকে উৎসর্গ করার নামই তপস্যা।

বাবা তাপস কর্পোরেট জগতের ব্যস্ত মানুষ। মেয়ে আর মায়ের পড়ার দুনিয়ার খবর রাখেন না। তবু মাঝে মাঝে বলেন, 'বড্ড বেশি পড়ে রানি। ও একটু ফিজিক্যাল কিছু করে না কেন? অন্তত রোজ ক্লাবে গিয়ে একটু সাঁতার কেটে আসুক।'

মা রাগ করেন, 'ওর সময় নেই। তুমি আজেবাজে কথা বলে ওকে ডিস্টার্ব করে দিও না।' মা বিপাশা একটা নামি স্কুলের প্রিন্সিপাল। বেশ অল্প বয়সে এমন উচ্চতায়। বিপাশার স্কুল যে বছর বছর এত ভালো রেজাল্ট করে, তা প্রিন্সিপালের

কড়া অনুশাসনের জন্যেই। খবরের কাগজ আর অভিভাবকমহল একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করেন। স্কুল নিয়ে বিপাশারও চাপা গর্ব আছে। বিপাশার বিশ্বাস, এই সাফল্যের কারণ হল একাগ্র অধ্যবসায়, কাজের প্রতি ডেডিকেশন, ডিসিপ্লিন। নিজের স্কুলে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট যত্ন নেন বিপাশা। হায়ার ক্লাসের জন্যে স্পেশাল ক্লাস। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্যে স্পেশাল কোচিং। টিচারদের সঙ্গে নিয়মিত মিটিং, অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ।

নিজের স্কুলেই মেয়েকে রাখা ভালো ছিল। কিন্তু স্কুলটা কো-এড। ছাত্রবয়সে সংযম কোনোভাবেই নষ্ট করা যায় না। সময়টা তো ভালো নয়। এই তো গত মাসের চোদ্দই আজকাল ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে খুব ধুম। স্কুলে স্পেশাল চেকিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন বিপাশা। গাদা গাদা চকোলেট আর গ্রিটিংস কার্ড জমা পড়েছে। বেশ ক-জন ছেলেমেয়ে শাস্তি পেয়েছে। গার্জিয়ান কল হয়েছে। বিপথে যাবার জন্যে মুখিয়ে থাকে ছেলেমেয়েগুলো।

ছাত্রজীবন মানেই তপস্যা, অনুশীলন আর অনুশাসন। কড়া শাসন আর পড়াশোনার চাপ। এই একমাত্র ওষুধ।

একমাত্র মেয়েকে সেই মন্ত্র শেখান বিপাশা। তিনটে 'ডি'। ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন, ডিভোশন।

রোজ সন্ধেবেলা মায়ের কাছে পড়তে বসে উজ্জয়িনী। সকালে স্কুল, দুপুরে বাড়ি ফিরে আবার বিকেল চারটে থেকে টিউশন ক্লাস। সন্ধেবেলা স্কুলের পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক। তারপর মায়ের কাছে অঙ্ক। রাতের খাবার আবার রাতে দুটো আড়াইটে পর্যন্ত পড়া। এই উজ্জয়িনীর রুটিন। যতক্ষণ মেয়ে পড়ে, বিপাশাও জেগে থাকেন। রানির জন্যেই নোটস, স্কুল-প্রোজেক্টের কাজ। ডেডিকেশন মেয়ের একার থাকলেই চলে না।

পড়া, পড়া আর পড়া। এই জীবন। রানি টিভি দেখে না, গান শোনে না, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয় না। খেলা তো কবেই বন্ধ। তাপস এক একদিন জোর করে রানি-বিপাশাকে নিয়ে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়েছেন। হাইওয়ে দিয়ে কতদূর। গাড়ির সাউন্ডবক্সে গমগম সুরে 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।' কতদিন পরে খোলাগলায় মা-মেয়ে মিলে 'ওই উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন।'

তবে তেমন দিন আসেই খুব কম। ব্যস্ত বাবা, ব্যস্ত মা। সবচেয়ে ব্যস্ত রানি নিজে। মা বলেন, 'একদম সময় নষ্ট নয়। এই চার বছর সব বন্ধ।'

*　　*　　*　　*　　*

এত সতর্কতার পেছনের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

ক্লাস নাইনের ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষায় উজ্জয়িনী অঙ্কে ঊনসত্তর। যদিও বরাবরের মতোই ফার্স্ট হয়েছিল, কেননা পুরো ব্যাচেরই অঙ্ক পেপার খারাপ হয়েছিল। কিন্তু মা এ অজুহাত শোনেননি। অঙ্ক নিয়ে কঠোর হয়েছেন। রোজ একশ'টা অঙ্ক মাস্ট। অঙ্ক করতে হাতব্যথা করত, ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসত। তবু একশ'টা অঙ্ক না করলে ছুটি নেই। অবশেষে সেকেন্ড টার্মিনালে অঙ্কে আটানব্বই।

তবু এই সেকেন্ড টার্মিনালে বরাবরের মতো প্রথম স্থান হল না। প্রথম কেন, কোনো স্থানই পেল না উজ্জয়িনী। কারণ হিন্দি পরীক্ষায় ছত্রিশ।

শিক্ষাব্যবস্থা। এখনো সর্বশিক্ষা পর্যায়ে। একজন অঙ্ক ভালোবাসে, তাকে তাই পড়তে দাও। তা হবে না। তাকে পড়তেই হবে আকবরের শাসনকাল, মোগল সম্রাজ্যের পতনের কারণ। একজন পাখি ভালোবাসে, তাকে হাজার পাখির জীবন পড়তে দাও। তা নয়। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, সোশাল স্টাডি, ড্রয়িং, ড্রিল . . . সব চাই।

ভূগোল পড়তে চাও? দেশ বিদেশের খনি, পাহাড়, জলপ্রপাত? বললেই হবে? আগে দুলে দুলে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করো, তারপর ওসব হবে।

লিটারেচার পড়া আজকাল একটু মান পাচ্ছে, কারণ মাস-কমিউনিকেশন পড়ার ফ্যাশন এখন 'ইন'। তবু সায়েন্স এখনো সবার আগে। এ দেশে সায়েন্স না পড়লেই প্রতিযোগিতা থেকে আউট।

হিন্দি পরীক্ষায় ছত্রিশ। ফেল করলে র‍্যাংক দেবার নিয়ম নেই। এত বছরের ছাত্রীজীবনে এই প্রথম ফেল করার লজ্জা। মাত্র চারটে নম্বর দিয়ে পাসমার্ক দিলে যে ছাত্রী এবং তার পরিবারের মানসিক সম্ভ্রম রক্ষা হয়, তা স্কুল কর্তৃপক্ষ মানেন না। ক্লাস নাইন থেকে খাতা দেখার ব্যাপারে কোনো আপস নেই। মেয়েরা যে মানসিক চাপের মধ্যে পড়ছে, সেটা কাম্য। তবেই তো পড়ায় উৎসাহ বাড়বে, ভালো রেজাল্ট করার জেদ তৈরি হবে।

লজ্জায় অপমানে রাগে মা অসুস্থ। তিনদিন খাওয়া বন্ধ। বাবা অবশ্য একবার বলেছিলেন, 'সামান্য স্কুলের পরীক্ষা। পরের বার ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু উজ্জয়িনী খুব ভয় পেয়েছিল। মাকে মুখ দেখানোর লজ্জা। স্কুলে মুখ দেখানোর লজ্জা। স্কুল থেকে ফেরার পথে এক ঘণ্টা হিন্দি টিউশন ক্লাস শুরু হল।

এত পরিশ্রমের ফল মিলেছে। ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষায় উজ্জয়িনী আবার ফার্স্ট। সব সেকশন মিলিয়ে রেকর্ড মার্কস।

স্কুল জীবনে এই একটা লজ্জার ইতিহাস আছে। যদিও বাইরের কেউ প্রায় ঘটনাটা জানে না, তবু এ নিয়ে উজ্জয়িনী

মরমে মরে আছে। আর কোনো মতেই মাকে ছোটো করবে না। মায়ের আশাভঙ্গের কারণ হবে না কোনোদিন।

বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে স্কুলের শেষ পরীক্ষায়, আইএসসি পরীক্ষায়, ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট নম্বর নিয়ে পাশ করেছে। খবরের কাগজে, টিভিতে ছবি, ইন্টারভিউ।

এবার তাই প্রত্যাশা বেশি। আইএসসি। প্লাস টু। এই পরীক্ষার রেজাল্ট হল উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি। এই দু-বছর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়নি রানি। তাপসকেও কড়া করে বলে দিয়েছেন বিপাশা, 'মেয়েকে নিয়ে কোনো আদিখ্যেতা নয়। রানির পড়া নিয়ে কোনো ছেলেখেলা বরদাস্ত হবে না। ওই লং-ড্রাইভ, বাইরে খাওয়ার প্ল্যান . . . সব বন্ধ। বাড়িতে কোনো বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন নয়। নিজেরাও কোথাও যাওয়া নয়। দু-বছর সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে।'

মা সদা সতর্ক, 'ফিজিক্সে তোমার আরো দু-নম্বর পাওয়া উচিত ছিল রানি। এত করে জিওমেট্রি করিয়ে দিলাম, তবু তিন নম্বর কম কেন? কম্পিউটারে মাত্র ছিয়াশি? এবার থেকে স্কুল থেকে ফিরে কম্পিউটারে বসবে রোজ।'

বাবা বলেন, 'এই সময়টা কোনো দিক দেখিস না। জীবনে দু-বছরের পরিশ্রম, আর সারা জীবন সাফল্যের আনন্দ। বুঝলি রানি?'

সিস্টার বলেন, 'দ্য মোস্ট স্টুডিয়াস অ্যান্ড ওয়েল-বিহেভড গার্ল। তোমার ওপর স্কুলের খুব আশা। উই এক্সপেক্ট ইউ টু টপ দ্য লিস্ট।'

রোজ সকালে স্কুলে অ্যাসেমব্লিতে 'আওয়ার ফাদার, হু আর্ট ইন হেভেন . . .'গাইবার সময় উজ্জয়িনী চোখ বুজে মনে মনে বলে, 'এবার ম্যাথস-এ যেন হানড্রেড পাই।'

দুর্গাঠাকুর দেখতে গিয়ে হাতজোড় করে বলে, 'ফিজিক্স-এ এবার যেন কোনো সিলি মিসটেক না হয়।'

দিদার বাড়ি সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেয় মন দিয়ে, 'কেমিস্ট্রির সব ইকুয়েশন যেন সময়মতো মনে পড়ে।'

* * * * *

বই আর নোটস। নোটস আর বই।

সূর্যের আলোয় পৃথিবী ঝলমল করে। উজ্জয়িনী দেখতে পায় না। সারা সকাল কাচের জানলায় ভারি পর্দা, বাইরের আওয়াজে ডিসটার্ব না হয়। একটা পাখি ডাকে, আর একটা পাখি সাড়া দেয়। উজ্জয়িনী শুনতে পায় না।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর . . . গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ে . . . বাতাসে ফুলের সুগন্ধ। উজ্জয়িনী জানলা বন্ধ করে দেয়, বড্ড শব্দ।

সবুজ ঘাসের বিছানা খেলতে ডাকে। উজ্জয়িনী ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে যায়।

ঝড় উঠেছিল একদিন। কথা নেই, বার্তা নেই, ছোট্ট একটা চড়াই ঢুকে পড়েছিল ঘরে। এদিক সেদিক ফুরুত ফুরুত করে উড়ে গিয়ে গ্লোবের মাথায় বসল। উজ্জয়িনীর দিকে অবাক চেয়ে রইল পাখিটা। বই থেকে মুখ তুলেও দেখল না মেয়েটা!

'যা চড়াই। লক্ষ্মীটি, আমায় পড়তে দে।'

পাটিগণিত বীজগণিত ত্রিকোণমিতি জ্যামিতি। মন দিয়ে করতে হবে সব। গত পরীক্ষায় জিওমেট্রের একটা ডিডাকশনে ভুল হয়েছিল। চড়াইয়ের দিকে তাকাবার সময় নেই।

'যা পাখি, যা তুই। আমায় পড়তে দে। আমার বাবা-মায়ের অনেক আশা আমায় নিয়ে। আমি বরং আসছে জন্মে পাখি হব। তোর মতো। উড়ে উড়ে বেড়াব। আকাশে, মাটিতে। গাছে গাছে। জানলায় জানলায়।'

পেনসিল ইরেজার খাতা কলম। কম্পাস রুলার জিওমেট্রি-বক্স। হোমওয়ার্কের খাতা। গত দশ বছরের প্রশ্নপত্র। টিচারদের সাজেশন। মায়ের দেওয়া টাস্ক।

বাবা-মা বাড়িতে ফিসফিস করে কথা বলেন। কাজের মাসি এলে যা একটু শব্দ শোনা যায়।

'এই যে রানিদিদি, কমপ্ল্যান আনছি। খায়ে নাও. . .'

'আহ্ মিনতি! বলেছি না অমন হুটহাট দিদির ঘরে ঢুকবে না। ওকে ডিসটার্ব করছ কেন?'

মাথাটা অঙ্কের খাতায় ডুবিয়ে দেয় রানি। মায়ের বাধ্য মেয়ে, ভারি লক্ষ্মী, ভারি শান্ত।

মা বলেছেন, 'ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তো সবাই হয়। আমার মেয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। স্পেস সায়েন্টিস্ট। নাসায় গিয়ে রিসার্চ করবে। ফিজিক্সে অন্তত নাইনটি-ফাইভ পার্সেন্ট চাইই চাই।'

বাবা বলেছেন, 'ফিজিক্স ঠিক আছে। কিন্তু রানি, আসল সাবজেক্ট হল ম্যাথমেটিকস। অঙ্কটায় কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট চাই। তারপর সব রাস্তা খুলে যাবে। বৈজ্ঞানিক হতে চাও, প্রফেশনাল হতে চাও, অ্যাকাডেমিক লাইনে থাকতে চাও . . . যা চাইবে তাই।'

বাবার ইচ্ছে, মেয়ে আইএএস হোক। কিংবা আইএফএস। তবে বাবা তেমন জোর করেন না। সবসময় পড়তেও বলেন না। বরং মাঝে মাঝেই 'আয় রানি, টিভি দেখি' বলে ডাক দেন। রিয়্যালিটি শো-মার্কা হিন্দি বাংলা সিরিয়াল নয় অবশ্য, তপস্বিনীকে অমন প্রশ্রয় দেবেন না বাবা।

মা বলবেন, 'আবার টিভি কেন? বরং গান চালিয়ে দাও। রিল্যাক্স করার জন্যে মিউজিক ভালো থেরাপি।'

বাবা বলবেন, 'দ্যাখোই না, টিভিতে এমন প্রোগ্রাম দেখাব রানিকে, যাতে বেশ ফাণ্ডা ক্লিয়ার হয়। জ্ঞান অর্জন হয়।'

'ও আবার কি ভাষা? ফাণ্ডা ক্লিয়ার।'

বাবা হাসেন, 'জেনারেশন ওয়াই-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে না।'

তৃপ্তির হাসি মায়ের মুখেও। আত্মপ্রসাদের হাসি। আদর্শ বাবা-মা কাকে বলে, লোকে দেখুক।

ছোটোবেলায় খুব গল্পের বই পড়ত রানি। রূপকথার গল্প, বাঘ-ভালুক শিকারের গল্প। শুক-সারি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী . . . হাবিজাবি বই এনে দিয়ে নেশা ধরিয়েছিলেন তাপসই।

বিপাশা আস্তে আস্তে সব নেশা ছাড়িয়েছেন। সন্তান-পালনে কোনো ত্রুটি নয়। এনে দিয়েছেন মনীষীদের জীবনের গল্প, খেলার ছলে বিজ্ঞান, ক্লাসিক সাহিত্য। যে কোনো উপায়ে জ্ঞান-অর্জন। ছাত্রজীবনের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারি। বাবা বলেন, 'ইংরেজিটা মন দিয়ে খেয়াল করবি। উচ্চারণ, শব্দ। প্রোনানসিয়েশন আর ভোকাবুলারি। ঠিক আছে, রানি?'

রানি শুনতেই পায়নি। টিভি দেখতে গিয়ে হারিয়ে গেছে কোথায়। মাইলের পর মাইল জল। সমুদ্র। সাত সাগরের পাড়ের দেশ। বরফের দেশ। এস্কিমো, ঈগলু। সবুজ মাঠ, গাছ পাখি। রামধনু। সোনা সোনা আলোর আকাশ। মহাকাশ।

মহাকাশ। আহ্। স্পেস-সায়েন্টিষ্ট। মায়ের স্বপ্ন। ফিজিক্স পরীক্ষাটায় অসাধারণ ভালো করতেই হবে।

* * * * *

অবশেষে এসেছে সেই বহু প্রতীক্ষিত সময়। কাল থেকে শুরু পরীক্ষা। বিপাশা নিজে বারবার টেস্ট নিয়েছেন বাড়িতে। আগামীকাল ফিজিক্স।

আজ দেবজিৎ-স্যার লাস্ট মিনিট ব্রাশ-আপ করানোর জন্যে ডেকেছিলেন। আটজনের ব্যাচ, সবাই ভালো ছাত্র ছাত্রী। ভালো স্টুডেন্ট ছাড়া টিউশন পড়ান না দেবজিৎ-স্যার। ভালো ছাত্রদের স্পেশাল ক্লাসেও উজ্জয়িনী স্পেশালি ভালো। আজও সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছে।

ফিজিক্সে অসাধারণ ভালো রেজাল্ট করতেই হবে যে।

সন্ধে সাতটা প্রায়। এখনো ফিরল না রানি? কাল পরীক্ষা। শ্রীময়ীর বাড়িতে ফোন করলেন না, 'শ্রীময়ী বাড়ি এসে গেছে? কখন শেষ হল ক্লাস?'

শ্রীময়ীর মাও উদ্বিগ্ন হলেন, 'সে কী? এখনো ফেরেনি উজ্জয়িনী? আমি শিলাদিত্যের মাকে ফোন করছি এক্ষুনি। উনি তো ক্লাসের বাইরেই বসেছিলেন, নিশ্চয় দেখেছেন উজ্জয়িনীকে।'

শিলাদিত্যের মায়ের কাছেও বিশেষ খবর পাওয়া গেল না, 'উজ্জয়িনী একটা অটোতে চড়েছিল। হ্যাঁ, ক্লাস থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল।'

দেবজিৎ-স্যারের বাড়ি, মৃদুল ঋত্বিক অনুপ্রিয়া সবার বাড়ি, তাপসের অফিস . . . ফোনের পর ফোন।

বিপাশার পাগল পাগল অবস্থা। কোথায় গেল রানি? আজকাল কত কাণ্ডই না ঘটছে। এ শহরে মেয়েদের নানা লাঞ্ছনার সত্যি গল্প রোজ। কেন যে একলা টিউশনে পাঠালেন রানিকে। ভয়ে উদ্বেগে বিপাশা কেঁদে ফেললেন।

উজ্জয়িনী তখন অটো নিয়ে পৌঁছে গেছে শহরের অন্য দিকে।

'অব কিধর যানা হ্যায়?' অটো-ড্রাইভার বেশ বিরক্ত। সওয়ারি তখন থেকে এদিক সেদিন ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় যাবে ঠিক নেই।

উজ্জয়িনী দিশেহারা। ওর যে কিছুই মনে পড়ছে না। মাথাটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে।

'আমি আর যাব না', বিরক্ত হয়ে অটো থামিয়ে নেমে পড়েছে চালক। উজ্জয়িনীও নামতে বাধ্য হয়েছে। শীর্ণ ভীত মুখ দেখেও অটো-চালকের দয়া হয়নি। 'আমার ভাড়া দিয়ে দিন।'

বারান্দায় বসে এক মহিলা এই দৃশ্য দেখেছেন। স্কুলের ব্যাগ কাঁধে শুকনো মুখের একটি মেয়ে আর এক বিরক্ত অটো-চালক। 'কী হয়েছে?' বারান্দা থেকে ঝুকে জিজ্ঞেসা করেছেন তিনি।

'দেখিয়ে না, কোথায় যাবে জানে না। আজকালের এই ঝামেলা। ছেলেমেয়েরা সব নেশা করে। মাথার ঠিক থাকে না। বাপ-মাগুলো হয়েছে তেমন . . . ছোড় দেতা হ্যায়. . .'

ভদ্রমহিলা কিন্তু বুঝেছেন, এটা ঠিক সে ব্যাপার নয়। উজ্জয়িনীকে ঘরে বসিয়েছেন। ঠিকানা, ফোন নম্বর নেবার চেষ্টা করেছেন। মেয়েটা শুধুই কেঁদে চলেছে, কিছুই মনে পড়ছে না ওর। বইখাতার মধ্যে লেখা একটা ফোন নম্বর পেয়েছেন ভদ্রমহিলা। উজ্জয়িনীর এক টিউশন টিচারের ফোন নম্বর। ভাগ্যিস! বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতেই অজ্ঞান হয়ে গেল মেয়ে।

তারপর হাসপাতাল। জ্ঞান ফিরেছে এক ঘণ্টা পর। এখন উজ্জয়িনী একেবারে স্বাভাবিক।

'আমি এখানে কেন? কাল আমার ফিজিক্স পরীক্ষা।'

কিন্তু ডক্টর ভার্মা বলছেন, 'উজ্জয়িনী এক রাত অবজারভেশনে থাক।'

বিপাশা ব্যস্ত হয়েছেন, 'তা কি করে হয়? ওর কাল ভাইটাল একটা পরীক্ষা। বোর্ড এগজাম। এখন তো ভালই আছে। হাসপাতালে থাকতে হবে কেন?'

ডক্টর ভার্মা বললেন, 'ও এবার পরীক্ষা ড্রপ করুক। লেট হার রিল্যাক্স ফর আ ইয়ার।'

একান্তে বাবা-মাকে বুঝিয়েছেন, 'স্মৃতি চলে যাওয়াটা ভালো লক্ষণ নয়। ওই যে কমপ্লিট ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া . . . আপনারা বুঝতে পারছেন না, ও কতখানি স্ট্রেস নিয়েছে। শী নীডস ট্রিটমেন্ট। কমপ্লিট রেস্ট। চেঞ্জ অফ অ্যাটমস্ফিয়ার। আপনারা বরং ওকে নিয়ে বাইরে চলে যান। ওকে সময় দিন।

জীবনে এক বছর নষ্ট হওয়া কিছুই নয়। ওকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিন।'

'আমাদের একমাত্র সন্তান। ব্রাইট স্টুডেন্ট। আমরা জানি ও দুর্দান্ত রেজাল্ট করবে। বুঝতে পারছি অনিয়ম হয়েছে। খাওয়া ঘুম। কিন্তু আমরা কেয়ার নেব ডক্টর। ও তো এখন পুরো সুস্থ। পরীক্ষা দিতে না পারলে ও ডিপ্রেশনে পড়ে যাবে। প্লিজ ওর এবং আমাদের এত বড়ো ক্ষতি করতে বলবেন না।' অনুরোধ করেন বাবা। অনুনয় করেন মা। ডক্টর ভার্মা অবিচল, 'ও এবার পরীক্ষা ড্রপ করুক।'

বললেই হবে? ডাক্তাররা অমন বলেন। এত বড়ো রিস্ক নেওয়া যায় না। জীবনের সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট পরীক্ষা। আইসিএসসি পরীক্ষায় নাইনটি-সিক্স পার্সেন্ট ছিল, এবার আইএসসি পরীক্ষায় অন্তত নব্বই-বিরানব্বই করতেই হবে।

তাছাড়া মেয়ে তো সম্পূর্ণ সুস্থ। পুষ্টিকর খাবার। ভিটামিন প্রোটিন ট্যাবলেট। হরলিক্স কম্পল্যান হেলথ-ড্রিঙ্ক। মায়ের শ্যেনদৃষ্টি।

সিক-বেডে ফিজিক্স পরীক্ষা। তিনদিন পর সোমবারের কেমিস্ট্রি পরীক্ষাও হয়ে গেল। দারুণ পরীক্ষা দিয়েছে মেয়ে। তিনদিন গ্যাপ। শুক্রবার অঙ্ক। মা-বাবা নিশ্চিন্ত। তারপর কম্পিউটার আর ইংরেজি। চিন্তা নেই।

বৃহস্পতিবার সকালে পড়ার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল উজ্জয়িনী। মা এসে ডেকে তুললেন। 'চোখে মুখে জল দিয়ে আয় রানি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল উজ্জয়িনী।

আবার হাসপাতাল। কিন্তু এবার আর জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তাররা বলছেন, উজ্জয়িনী কোমায় চলে গেছে। এক বছর নষ্ট হলই। আর কত কি যে নষ্ট হল, তার হিসেব যে কে দেবে!

এই সাতদিন তাপস একটা কথাও বলেননি। শূন্যচোখে বসে আছেন বিপাশা। দু-চোখেও ভাষা নেই।

*　*　*　*　*　*

কে এসে পাশে বসল। নির্বাক দৃষ্টি ফেরালেন বিপাশা। ডক্টর শীতল ভার্মা। বিষণ্ণ শান্ত চোখ। আলতো হাতে স্পর্শ করলেন বিপাশার হাত, 'আমি একটা অন্য ভয় পেয়েছিলাম। উজ্জয়িনী তা করেনি। ইউ আর আ লাকি মাদার। ইউ হ্যাভ আ ব্রেভ চাইল্ড। আমাদের গোগোল . . .'

দু-হাতে মুখ ঢাকলেন, 'গোগোল। আমার একমাত্র ভাই। ব্রাইট স্টুডেন্ট। উজ্জ্বল কেরিয়ার। আইআইটি কানপুর। থার্ড ইয়ারে থাকতেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে দারুণ চাকরি পেয়েছে। সেই গোগোল। ফাইনাল পরীক্ষার আগে কলেজে মক-টেস্ট হল। মাকে ফোনে বলেছে, পরীক্ষা খুব ভালো হয়নি। তারপর . . .' জানলা দিয়ে দূরে আকাশের দিকে তাকালেন, 'শেষ চিঠিটাও মাকেই লিখে গিয়েছিল। সুইসাইড নোট। . . . মক-টেস্ট আসলে খুব খারাপ হয়েছে মা, চল্লিশ পার্সেন্ট নম্বরও হবে না। তোমাদের স্বপ্ন আমি পূরণ করতে পারলাম না। আর এই চাপ নিতে পারছি না। তুমি আর বাবা আমায় ক্ষমা কোরো . . .'

জলের ধারা নেমে এল গাল বেয়ে, 'তিনমাস কোমায় থাকার পর মা চলে গেলেন। বারো বছর ধরে বাবা কথা বলেন না। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। বারো বছর ধরে পঙ্গু। গোগোল, আমার ভাই। স্বচ্ছল পরিবারের একমাত্র ছেলে। বাবা-মা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। তবু কেন যে গোগোল . . . সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি কি জানেন? মক-টেস্টের রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল, গোগোল তিয়াত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছে।'

চোখ মুছে চশমা পরে নিলেন শীতল, 'আমাদের প্রত্যাশার চাপ কতটা ছিল, আমরা তা বুঝিনি। কেরিয়ার গড়ার রিয়্যালিটি শো। প্রচণ্ড চাপের প্রতিযোগিতা। পারেনি গোগোল। উজ্জয়িনীও পারেনি। আমরা সবাই লাকি, ও অন্তত গোগোলের মতো . . .' থেমে গেলেন।

হাত বাড়িয়ে বিপাশার কাঁধে চাপ দিলেন, 'আলো-আঁধারিতে ঢাকা কিশোর-মন। তার নাগাল পেতে হলে বাড়তি সচেতনতা দরকার। আমরা ভাবি, সব জানি। হাতের মুঠোয় জ্ঞান। কিন্তু তা তো নয় সত্যিই। সব জানার পরও সেই অজানা অচেনা অন্ধকার। দূরের বাতিঘর। সেখানে পৌঁছোনো হয় না।'

তাপসের দিকে ফিরলেন, 'যারা শুধুই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, তারা কিন্তু বড্ড মিডিওকার হয়ে যায়। জ্ঞানের জন্যে তো পড়ে না তারা, শুধু পরীক্ষায় বেশি নম্বর তোলার জন্যে পড়া। একটা ভালো চাকরির জন্যে পড়া। যে চাকরির দৌলতে বড়ো ফ্ল্যাট, বড়ো গাড়ি, ঘর ঠান্ডা করার মেশিন। ফর্সা সুন্দর স্বামী-স্ত্রী আর স্বাস্থ্যবান একটি শিশু। বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। জীবন কি সত্যিই তেমন?'

আলগা মাথা নাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আগেকার বাবা-মায়েরা ভালো মানুষ হবার শিক্ষা দিতেন। আর আমরা, আজকের বাবা-মায়েরা? সময়ের দোহাই দিয়ে, প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে সন্তানকে ইঁদুর-দৌড়ের জন্যে তৈরি হবার শিক্ষা দিই। 'দ্য বেস্ট' হতেই হবে তোমায়, এমন বলি। কেরিয়ার গড়ার রিয়্যালিটি শো।'

কি বললেন ডক্টর ভার্মা? রিয়্যালিটি শো? তাই তো। অন্য এক রিয়্যালিটি শো। ঝাঁকের কই। ইঁদুর-দৌড়ে দ্য বেস্ট ইঁদুর। স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারটাই চলবে না। এত সচেতন, এত কৃতী, শিক্ষিত বাবা-মা হয়েও সেই রিয়্যালিটি শো-এর বাইরে ভাবতে শেখে

নি? মেয়েকে নামিয়ে এনেছে এই প্রতিযোগিতায়? নামিয়েছে। হ্যাঁ, অধঃপতন। উত্তরণ নয়।

তোতাকাহিনীতে পোক্ত হয়েছে মেয়ে। সেই নিয়ে কি গর্ব . . . আমার সন্তান এ বিশ্বের প্রডিজি। নিজের যা দেবার, তাই তো মানুষ সন্তানকে দিয়ে যেতে চায়। পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কি দিয়েছে বিপাশা? পূর্ণ অভিভাবকত্ব নিয়ে কি দিয়েছে তাপস?

নিছক লেখাপড়াকেন্দ্রিক কেরিয়ার সচেতনতা! খবরদারি, টেনশন আর প্রতিযোগিতা। একটা মানুষকে নিজের ইচ্ছে মতো গড়ার আকাঙ্খায় এ কি ছেলেখেলা করেছে দু-জন মিলে?

* * * * *

রানির জন্মের সময়টা মনে পড়ল তাপসের। লাল কম্বলে জড়ানো ফুটফুটে রানি। জীবনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। হাসি হাসি, আলো আলো।

বড্ড চঞ্চল ছিল ছোটোবেলায়। সাইকেল চালিয়ে সারা বিকেল ক্যাম্পাসে ঘোরা। আজ একটা ডানাভাঙা পাখি, কাল একটা পা-ভাঙা কুকুরছানা কুড়িয়ে আনা। গ্রামের বাড়িতে গেলেই আম গাছ, পেয়ারা গাছে চড়া। ঠাকুমা বলতেন, ‘দেবী চৌধুরাণী নাতনি আমার।’

কবে থেকে এত শান্ত হয়ে গেল রানি? কতদিন হয়ে গেল খোলা আকাশের তলায় হাসেনি রানি। কতদিন হয়ে গেল গ্রামের বাড়িও যাওয়া হয় না। রানির যে খুব পড়া। পড়া, আর পরীক্ষা।

আকাশহীন মানুষ। মানুষের মধ্যে বিপুল বিশ্বের যে অনুভব, তার প্রথম প্রকাশ ওই আকাশ। আকাশমুখী মন হলে তবেই উচ্চতায় পৌঁছোনো। সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা। বিপুল মহাকাশ। মহাবিশ্ব।

বেদ থেকে বাইবেল, সবই আকাশমুখী হবার শিক্ষা দেয়। আবহমান কাল থেকে মানুষ ওই নীল অনন্তের দিকে চেয়ে আছে মুক্তির আশায়। কল্পনায় ডানা মেলার আশায়। আকাশ নেই বলেই মানুষের মধ্যে হতাশা, লোভ, আতঙ্ক, ব্যভিচার, ইগো, আত্মম্ভরিতা। আহা রানি।

ডক্টর ভার্মা বললেন, স্ট্রেস। স্ট্রেস-এর শিকার হয়েছে রাণী। কার দোষে এত স্ট্রেস? এতখানি মানসিক চাপ? কোনো দিন বুঝতেও দেয়নি মেয়েটা। বাবা হিসেবে সেই নির্ভরতা দিতে পারেনি মেয়েকে? সন্তানের জন্ম যে দেয়, জীবনের মূল্য তার চেয়ে বেশি কে বুঝবে? অনেক অনেক বেশি জরুরি সন্তানের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা। কারণ, শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকাটাই এক মস্ত বিস্ময়। এত বড়ো কথাটা শেখানো হয়নি রাণীকে?

কতদিন আর কথা বলে না রানি। হাসে না। ভাবে না। কেউ জানতেও পারে না, ও পৌঁছে গেছে এক অন্য পৃথিবীতে। আশেপাশে একটাও গাছ নেই। ন্যাড়া পাথুরে টিলা। লাল, ধূসর, কালচে পাথর। গোল গোল হলুদ ফুল। ঝরা পাপড়ি। তার মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছে ছোট্ট চড়াই, শালিখ, সাদা পায়রা। উজ্জয়িনী বাদাম ছড়িয়ে দিল।

ওমা, আকাশ থেকে নেমে এল এক ঝাঁক সাদা সীগাল। বাদাম খেতে নেমে এল নাকি। সাদা সাদা সীগাল। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে দেখেছে ওদের। সাদা ডানা, সাদা উড়ান। একঝাঁক সীগাল সাদা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এদিকে মুখ ফেলাতেই . . . ওমা, এ যে বিশাল সমুদ্র। সাদা সাদা ঢেউয়ের মাথায় রুপোলি রোদ্দুর। উজ্জয়িনী যেন এক নতুন মোজেস। নবীন ইহুদি নিয়ে নতুন কোনো সমুদ্রতীরে এসে পড়েছে। মাথার ওপর যেহোভার আশীর্বাদ। সমুদ্র দু-ভাগ হয়ে রাস্তা করে দিল।

বন্ধ চোখ বেয়ে জল নেমে আসে অবিরাম। গালে লেগে থাকে দুঃখ-ফোঁটা। বাবা মুছে নিলেন।

‘কাঁদিস না রানি। তুই স্বপ্নেই থাক। চোখ খুলিস না।’

মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকেন না। মা-মেয়ের স্নেহ-নির্ভরতা। পারস্পরিক বাধ্যতা। পারস্পরিক। মেয়ে হিসেবে তো সবরকম বাধ্যতা দেখিয়েছে রানি, মা হিসেবে সেই বাধ্যতা কেন দেখাতে পারেনি বিপাশা?

আহা রানি! একজনও বন্ধু নেই ওর। কাউকে কাছে পায়নি, যাকে তার ইচ্ছের কথা বলতে পারে। মা রাগ করবে। বাবা বুঝবেই না। বন্ধুরা হয় মজা করবে, নয় মজা পাবে। ভালো রেজাল্ট করে বলে এমনিই বন্ধুরা হিংসে করে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

স্কুলে উজ্জয়িনী প্রত্যাশা মেটাবার যন্ত্র। দারুণ রেজাল্ট করে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে। বাড়িতে মায়ের ইচ্ছেপূরণের যন্ত্র। ছোট্টবেলা থেকে মায়ের স্বপ্ন, মায়ের ইচ্ছে মেনে চলা। আজ মেয়েটা জানেই না, ও নিজে কি চায়। শুধু জানে, কোনো মতেই বাবা-মাকে নিরাশ করতে পারবে না ও।

মেধাবী সন্তান। যে-কোনো বাবা-মায়ের মনের মতো সন্তান। শুধু নিজের সম্বন্ধে কোনো মূল্যায়ণ করে উঠতে পারেনি উজ্জয়িনী। ভাবতে শেখেনি যে, কোনো পরীক্ষাই জীবনের শেষ পরীক্ষা নয়।

পাতার মর্মর, পাখির ডাক, মেঘের মায়া, বৃষ্টির ছোঁয়া। মেয়েকে এসবের স্পর্শ দিতে পারেনি বিপাশা। আধুনিক মানুষ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, এই স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি সর্বস্ব মানুষ। আত্মকেন্দ্রিকতার মূল্য তার কাছে অপরিসীম। বাকি সব মূল্যহীন। প্রথমে প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন, তারপর নিজেদের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন। মা-বাবার কাছে থেকেও একলা দূরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস ছিল রানির? এতখানি অসম্পূর্ণ জীবনে বাস করেছিল মেয়ে?

যা সম্পূর্ণ নয়, তা কি করে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে?

উপত্যকা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল বিপাশা, 'চাই না। চাই না। চাই না।'

অমনি শত শত নীল লাল হলুদ সবুজ পাখিতে ভরে গেল চারদিক। ভোরের পাখি। একঝাঁক মুনিয়া। অপরাজিতা ফুল। কামিনীর ঝোপ। আকাশ বাতাস। মেঘ বৃষ্টি। আকাশ থেকে বৃষ্টি। গাছ থেকে গাছে টুংটাং তরঙ্গ।

নিজের হাতে আজ অঙ্কের খাতায় লিখে দিল মা, ছুটি, ছুটি, ছুটি।

দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। নতুন প্রভাত। রোজ একই রুটিন। এই অপরূপ নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যপটে মেয়েকে যুক্ত করবে বিপাশা এবার। রিয়্যালিটি শো-এ যদি থাকতেই হয়, এও তো এক চমৎকার রিয়্যালিটি শো।

উজ্জয়িনীর ঘুমঘুম চোখে সকালের রোদ্দুর। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় পাখির শিস। মৌটুসি, দুর্গা-টুনটুনি। দু-হাত ছড়িয়ে একটা আকাশে ওর চিল। বিশাল ডানায় ঢেকে যাচ্ছে আকাশ। আকাশকেও এক মহাসমুদ্র মনে হচ্ছে।

উজ্জয়িনীর ঘুম কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে। স্মিত মুখে সোনালি আলো। সেই উত্তাল উদ্বেলের দিকে তাকিয়ে অক্লান্ত হাত নাড়ে বিপাশা। আয়, আয়, রানি আয় রে।

পিয়া ভোল অভিমান

দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী

১

তুমি আমার কে
সময়?
নক্ষত্র?
পড়ার টেবিলে চন্দ্রমল্লিকা?
প্রাচীন মহাসাগরতীরে দু-হাজার বছর আগেকার কোনো রাত্রি?
আষাঢ়ের দুপুরগুলোতে
রোজ না হলেও কোনো কোনো দিন মেঘ করে আসে
নক্ষত্রে তোমার জন্ম হয়
নক্ষত্রে তোমার মৃত্যু হয়
সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
সমুদ্র জ্বলছে . . .

২

স্বাতী তারার চোখ ফেটে জল
ব্রহ্মতালু ছুঁলে
পাখিদের সঙ্গে আমারও মৃত্যু হবে . . .
পরীক্ষার হলঘরে ছেলেরা যখন লেখে
আমি জীবনের বৃক্ষলতার গান শুনি
হঠাৎ সন্ধ্যা নামে . . .

৩

আশি হাজার বছর পর মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে
হাওয়ার রাত
প্রেম ও ছুঁচ
সারা গায়ে তখনও সদ্য শেষ হওয়া বৃষ্টির চিহ্ন
নাম 'অচির' . . .

বিরহিণী

শুভ্রা পাল

নিদাঘের চাঁদিফাটা দুপুরে
অবহেলিত শূন্য উঠান থাকে—কাঙ্খিতের অপেক্ষায়,
ভিতর বাড়ির হিমঘরে বসে কে যেন কাঁদে,
বায়ু হিল্লোলে ঝুমকো লতা বার্তা পাঠায় তাকে—
কাঁচের শার্শি কাঁপে টক্ ঠক্,
ভূপতিত নগ্নশোক উঠে দাঁড়ায়—
নোনাজলের ভেজাবাস ছাড়ে।
আবল্য সরিয়ে দ্যাখে এসেছে স্বর্ণালিবেলা
আকাশ ফেটে ছড়িয়ে গেছে আলো
শূন্য আঙনের বুকে মোহময়ী স্নিগ্ধতা—
পূরবী তানের মধুরীমা ছড়ালো,
সন্ধ্যা নামলো চুপিসাড়ে।
বিষাদের সুরে ছাওয়া ব্যাকুল পরান
ফিরে ফিরে চায়—
দিনান্তের পারে সন্ধানি চোখ
    থমকে দাঁড়ায়,
ঘুমের দেশে তলিয়ে যায় পরিশ্রান্ত দিন
আলো—আধারের খেলা চলে উজানি বেলায়
    দিন-প্রতিদিন।

টেনশান

সুব্রত ভট্টাচার্য

টেনশান, কি সাংঘাতিক একটা শব্দ। টেনশান শুনলেই লোকের টেনশান। কার টেনশান নেই বলুন তো? একটু আগে যে জন্মালো আর একটু পরে যে মারা যাবে তার প্রত্যেকের।

'ঠিকঠাক মরছি তো? ক্যাথিটা খুলে যায়নি তো? কে কে এখনও দেখতে আসেনি?' ইত্যাদি।

আসলে টেনশান বিষয়টি হল চিন্তা, উদ্বেগ আর অনেক পরিমান ভয়ের এক ঘন মিশ্রণ। মানে তিনটিকে এক কড়াইতে ফেলে ভাল করে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে উনুনে পাক দিয়ে দিয়ে একবারে কড়া করে নামিয়ে ঠান্ডা করে কড়াপাকের সন্দেশের মতো পাতে দেওয়া। ভাঙতে দাঁত ভাঙবে। অথচ অদ্ভুত দেখুন, যে টেনশান দিবারাত্র আমাদের সাথে তার কোন রংও নেই গন্ধও নেই, কিন্তু উপস্থিতি আছে।

টেনশন যদি থার্মোমিটারে মাপা যেত তবে মাঝে মধ্যেই এর চড়াই-উতরাই টের পাওয়া যেত। মানে এই চড়ল তো আবার এই নামল। 'কেমন করে?'

ধরুন প্রচণ্ড ভিড়ে Sealdah অথবা Howrah Stn. দিয়ে হাঁটছেন। একটু আগে আগে আপনার বউ বাচ্চা তারা লোকের ঠ্যালা, মানুষের গুঁতো, ব্যাগ, অ্যাটাচির গুতো সামলে এগোচ্ছে হঠাৎ আপনি Break মারলেন কেন উল্টোদিকের ভদ্রলোক তার ব্যাগ দিয়ে আপনার ব্যাগ টেনে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল। সেটাকে ঠিক করে সামনের দিকে তাকাতেই আপনার বউ বাচ্চা গায়েব। গলাটাকে জিরাফের মতো লম্বা করেও দেখতে পেলেন না। সবাই যাচ্ছে শুধু ওরাই নেই। তখন টেনশানটা কেমন চড়চড় করে বেড়ে যায়? তাড়াতাড়ি একটু এগিয়েই যখন দেখতে পেলেন আবার নেমে গেল। টেনশানের আবার বয়সানুযায়ী রকমফের আছে। সেটাই স্বাভাবিক। দাদুর যে টেনশান নাতনির সেই টেনশান কি করে হয়? আর বউমার টেনশান তো সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকে আবার নিজেরটা ছাড়াও অন্যের টেনশান নিতে ভালবাসেন। যারা আবার এর ধার্মিক গোছের মানে ভক্ত Type, তারা দিনরাত তাদের Tension ভগবানকে দিয়ে যাচ্ছেন। যদিও ভবিষ্যতে বেঁচে থাকে এটাই sofest উপায়। Cricket-এর সময় অনেকে এত Tension-এ ভোগেন যে যদি India Bat করে আর Last Ball-এ Match-এর Deceission থাকে কিছুতেই সেই বলটি দেখতে পারেন না। হয় বালিশের তলায় বা চাদরের তলায় মুখ ঢুকিয়ে দেন পরে লোকের চিৎকারে বা ক্ষোভে বোঝেন জেতা না হারা। ওতে ওনাদের Tension কম হয় বা কমে যায়।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টেনশান। উঠতে বসতে শুতে, বেড়াতে সবসময়ই এক ভয় এক চিন্তা। হারাবার ভয়, হারিয়ে যাবার ভয়, অনেকের আবার পেয়ে যাবার ভয়। মানে যদি কিছু পেয়ে যাই তার জন্যে ভয় যদি কিছু পাইয়ে দেয়। অত বড়ো যে মহাপুরুষ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ তারও টেনশান ছিল যদি কেউ তার বিছানাতে টাকাপয়সা বা মূল্যবান কোনো জিনিস দেন। ওনার অবশ্য সুবিধা ছিল। সেই বিছানাতে বসলেই গা জ্বালা করত। পেয়ে যাবার ভয় শুনলেই যেটা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে সেটা হয় কোথাও যাবার সময়, দেখা যাবে প্রায় পুরোপুরি Ready হয়ে উনি একটি বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে ঢুকে গেলেন যথাস্থানে 'এক্ষুনি আসছি' বলে। অনেক মহিলারও আছে। Make up full complete. লিপস্টিকের শেষ আঁচড়টিও শেষ। মাথাটি নামিয়ে চোখ যথাসম্ভব ওপরে তুলে মাথার মাঝখানের চুলটি ঠিক করে শাড়িতে finishing touch দিয়ে 'একটু আসছি' তোমরা এগোও' বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। এগুলো হচ্ছে future tension মানে ভবিষ্যতে যদি Tension হয় তাই আগে থাকতে ব্যবস্থা করা।

যে কথা বলছিলাম টেনশানে পড়লে এক একজনের এক একরকম ভাবপ্রকাশ হয়। যেমন গা জ্বালা করা, বমি পাওয়া, বারে বারে বিড়ি সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। অনেকে আবার কিছু খেতে পারেন না। অনেকে খুব স্বল্প জায়গায় খুব জোরে জোরে হাঁটেন অবশ্যই মাথা নিচু করে। তখন তাদের সামনে কেউ পড়ে গেলে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবেন। অনেকে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে রক্ত বার করে ফেলেন। ধরুন ছেলে বা মেয়ে বাড়িতে ফিরতে রাত করছে বা ফিরছে না। প্রায় বেশিরভাগ বাবা-মা বাড়ির থেকে বেরিয়ে যান কিন্তু বেশিদূর অবধি যান না। ঠিক মোড়ের মাথায় বা Bufftend-র কাছে অথবা station-এ যাবার রাস্তার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। যেন ওই জায়গা থেকে বাড়ি অবধি ছেলে বা মেয়ে যেতে পারে না। অনেকে আবার একটানা দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন না। একবার বাড়ি অবধি যান আবার ফিরে আসেন। এইরকম করতে করতে অনেক রাতে সেবার বজ্রবাবুকে পাড়ার কুকুরেরা সন্দেহ করল, কুকুরদেরও তো টেনশান থাকে না কি? পুরো রাস্তা ফাঁকা, শুনশান, একটাই লোক কেবল বারবার যায় আর আসে, কুকুরেরা মানুষের মতো নয়, বেশিক্ষণ টেনশানের ধার ধারে না। একবার তারা বজ্রবাবুকে আর বাড়ি ফেরার রাস্তায় যেতে দিল না। একে তো ছেলে ফিরছে না,

এখন আবার কুকুরেরা নতুন টেনশানে বা চিন্তায় ফেলে দিল। কি ঝামেলা। একবার পালাতেও চেষ্টা করল কিন্তু দৌড়ের সেই speed তো আর নেই। শেষে যদি কামড় দেয় সেই ভয়ে ছেড়ে দিলেন। অনেক আ আ চু চু করেও ছাড়া পেলেন না শেষ পর্যন্ত তারা ছেলেই তাকে এসে উদ্ধার করল যে নাকি আগেই ঘুরপথে বাড়ি চলে এসেছিল। অনেকেরই টেনশানের চোটে খুব জলতেষ্টা পায়। অনেকে একদম চুপ করে বসে থাকেন, কেউ কেউ কি কি হতে পারে এই নিয়ে বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে আলোচনা করেন এবং হাসিমুখে সবাইকে বোঝান যে টেনশানের কোন কারণই নেই কিন্তু তিনি মনে মনে ভালোই টেনশানে। এই টেনশানের আরেকটা নাম হয়েছে যেটা বেশি ব্যবহৃত। তার নাম হল চাপ। সবেতেই সবার এক কথা—চাপ নিও না ভাই, বা 'বাবা কাজের কি চাপ'! গরমে চাপ, শীতে চাপ, বর্ষায় চাপ, অত সুন্দর যে বসন্ত তাও নাকি চাপের। বাসের চাপ, বসের চাপ, বাড়িতে চাপ, বাইরে চাপ মানে সর্বত্রই টেনশান। তবে ছোটোদের সবচেয়ে বেশি টেনশানের সময় school-র পরীক্ষার দিনগুলোতে আর পরীক্ষার result বেরোবার দিন। আর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরাই টেনশানে কিছু খেতে পারেন না। কিন্তু কেউ কেউ আবার টেনশানে বেশি খেয়ে ফেলেন। বেশি বেশি যে কখন খেয়ে ফেলেন টেরই পান না কারণ তখন তো উনি টেনশানে থাকেন। কিছু মানুষ আছেন টেনশানে পড়লেই মানে বিরক্তি এসে যায়। ভালো কথাতেও খিঁচিয়ে ওঠেন। যাকে তাকে অকারনে বকে দিচ্ছেন। ছেলে হয়তো বলল 'বাবা, খবরে চলেছে তোমাদের D.A. বেড়েছে। বাবা খিঁচিয়ে উঠল, 'বাড়ুক তোর বাপের কি?' ছেলে ভ্যাবাচাকা, শুধু গিন্নী বুঝলেন হয় খিদে পেয়েছে বা টেনশানে আছেন। অনেকে আবার কিছুতেই টেনশানের কথাটা নিজের ভেতরে রাখতে পারেন না, বাড়ির লোককে ৫০ বার তো বলতেনই এবং রাস্তায় গিয়ে চেনা অচেনা সবাইকে ধরে ধরে বলবেন। সেবার ওই ব্রজবাবুর ছোটো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যাবার পর ১ ঘণ্টা হয়ে গেলেও Phone করল না অথচ উনি মেয়েকে বারে বারে বলে দিয়েছিলেন যেন পৌঁছেই Phone করে। ব্যাস এইবার ব্রজবার বেশ কিছুক্ষণ ঘরের লোককে বিরক্ত করে রাস্তায় যাকে পাচ্ছেন তাকে থামিয়ে বলতে শুরু করলেন, মেয়ের বৃত্তান্ত, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কথা এত কেন যে তিনি মেয়ের বাড়িতে phone করছেন না তার হিসাব সব, শোনাতে গিয়ে বেশিরভাগ লোকেরাই বিরক্ত হচ্ছেন এবং চলে যাচ্ছেন। শেষে একটু মাঝবয়সী এক লোককে তিনি বলতে শুরু করলেন আর লোকটিও দিব্যি মাথা নাড়িয়ে বোঝার মতো করে গেলেন। বজ্রবাবু তবু একটু খুশি হলেন, কেউ একজন তো কেউ ওনার কথা শুনছেন আর ব্যাটাগুলোর যে কি অত কাজ কে জানে বাপু! ব্রজবাবু যখন কথা শেষ করে বললেন বুঝলেন তো এই হল ব্যাপার তখন সেই লোকটি বলে উঠল 'অব তক আপ নে কা কহা কুছ না সময়ে মে না আধলু, অব খইনি খাইবু?' ব্রজবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। কি আশ্চর্য একজন লোকও কি নেই যে তার কথাটা শোনেন, ব্রজবাবু রেগেমেগে ঘরে চলে গেলেন আর ওই লোকটি খৈনি পিটতে পিটতে চলে গেলেন।

তবে টেনশানের নিজস্ব একটা গুরুত্ব এবং ওজন আছে। আসল কারণ যদি খুঁজতে যাওয়া হয় তবে দেখা যায় ৮০-৯০% কারণ হচ্ছে ভয় একেবারে গোড়ার কারণটা দেখা যাবে ভয়ের থেকেই হচ্ছে। অথচ কোন টেনশানে ভুগছে এমন লোককে বলুন 'ভয় পাচ্ছিস কেন?' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ আসবে—'না না ভয় পাবো কেন? আমি ওসব ভয় টয় পাই না' আর যদি বলেন 'অত টেনশান করছিস কেন?' উনি মনে মনে মেনে নিয়ে বলবেন, 'না, মানে কিছুটা টেনশান তো থাকেই'। টেনশানের সাথে সময়ের এক দারুণ সম্পর্ক আছে। সময়ের কাজ সময়ে না হলেই শুরু হয় টেনশান বা চাপ, তাই সময়ের সাথে টেনশানের যোগসূত্র আমাদের কাছে আর মধুর থাকে না। যেমন—সকালবেলায় কাজের মাসির আসার সময় পার হয়ে চলে গেলেই শুরু হয় টেনশান, তারপর যখন দেখা যায় Phone করলেও ওপার থেকে কেউ ধরছে না তখন তো একেবারে সর্বরূপে সেজে 'আয় মা শ্যামা নেচে নেচে'। আমরা যখন দূরে কোথাও যাই তখন যতক্ষণ না আমরা Station বা Airport পৌঁছোতে পারছি মোটামুটি এক বা দেড় ঘণ্টা আগে ততক্ষণ শান্তি নেই কিন্তু টেনশান আছে। অনেকের এই টেনশানের কারণে সদিচ্ছা বা সমাজসেবা করা হয়ে ওঠে না। আমাদের পাড়ার কান্তিদা অন্যান্য যত সমাজসেবাই করুক না কেন রক্তদানের সময় কিছুতেই একবারে তিনি রক্ত দিতেই পারবেন না—টেনশানের চোটে শিরা উপশিরা খুঁজেই নাকি পাওয়া যায় না। কেউ কেউ টাকা গোনার সময় (যদি সেটা কাউকে দিতে হয়) এত টেনশান করবেন যে জিভের সব থুতু শেষ হয়ে গেলেও টাকা গোনা কিছুতেই মনঃপুত হবে না শেষে থাকে দেবেন তাকে দিয়েও একবার গুনিয়ে নিয়ে শান্তি। টেনশান নাকি নিতে নেই দিতে হয়। তাই কথায় কথায় শোনা যায় 'ভাই টেনশান লেনে কা নহী দেনে কা হ্যায়।' তাই আজকাল free তে সবাই নিজের নিজের টেনশান অন্যকে দিয়ে যাচ্ছেন। দিয়েই বলছেন আরে অত চাপ নিচ্ছ কেন? ছেলে-মেয়ে ভালো result করলেও চাপ খারাপ করলেও চাপ। অনেকের আবার অদূর অদূর ভবিষ্যতের কথা মানে যে সময় উনি বা ওনার দু-পুরুষ

থাকবেন কিনা সন্দেহ তখনকার কথা ভেবে টেনশান করতে করতে সিঁটিয়ে যান। যেমন পৃথিবী কবে ধ্বংস হয়ে যাবে? কবে বাতাসের 'ওজন লেয়ার' পুরোপুরি ছিঁড়ে গিয়ে সূর্যালোকে পৃথিবী জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে ইত্যাদি। অনেকের টেনশান তার Bank-র Park book-র ডানদিকের কলামের সংখ্যা বাড়ছে না কেন?

আপনার টেনশান নেই? মানে আপনি একটা ফালতু লোক। হয় নির্বোধ, বা মাথার গন্ডোগোল অথবা সাধু। এছাড়া পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটা কান না থাকলেও চলবে কিন্তু টেনশান বা চাপ থাকবে না — উঁহু হবেই না। দেখি আরও কি কি কারণে টেনশান? —বিয়ে না হওয়া মেয়ে ও তার বাপের চাকরি না পাওয়া ছেলের, বাড়ির লোক বাইরে থাকলে, রক্ত পরীক্ষার report আনার দিন, যে-কোনো টিকিটের Line-এ দাঁড়িয়ে, চুল পেকে বা পড়ে যাবার জন্য, যারা নতুন প্রেম করছে এবং যারা নতুন বিয়ে করেছে। যিনি Reteired হচ্ছেন, উৎসবের দিনগুলি, Teacher-র কাছে গেলে—খেলার অথবা পড়ার যার teacher-ই হোক, ডাক্তার এবং জ্যোতিষীর কাছে গেলে, পাশের বাড়ির লোকের হঠাৎ উন্নতি হলে, প্রিয় বন্ধু দামি দামি জিনিস কিনতে শুরু করলে, কাজের জায়গায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ভালো ব্যবহার শুরু করলে, সন্তান বড়ো হতে শুরু করে তার হাবভাব পাল্টে গেলে, বৃষ্টি না হলে বা অতিবৃষ্টি হলে। রাজনৈতিক নেতাদের টেনশান তো খুব common ব্যাপার। কখন যে কে পড়ে যায় আর কে আবার দাঁড়িয়ে যায় তাই নিয়ে সর্বক্ষণ চাপ। এছাড়াও প্রচুর প্রচুর টেনশানের কারণ আছে ও থাকবে কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রচুর মানুষ আছেন যারা চাপের দিকে না তাকিয়ে তারা তাদের ক্ষমতার দিকে নজর দিয়েছেন। ক্ষমতা বাড়িয়েছেন বলে জীবনের কোন অবস্থাতেই তাদেরকে টেনশান বা চাপে ফেলা যায় না। আসলে স্থিতি যদি ঠিক থাকে তাহলে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কোনো টেনশান গ্রাস করে না। এই টেনশান থেকে আমাদের প্রচুর রোগ হয় তা আমরা জানি। বেশিরভাগ মানসিক সমস্যা ও শারীরিক সমস্যার মূল কারণ টেনশান স্ট্রেস (stress) বা চাপ। এর থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে জীবনশৈলী পাল্টে ফেলছি তাতে করে আরও তাড়াতাড়ি ডেকে আনছি ওই রোগগুলিকে। WHO (World Health Organisation)-র মতে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে মহামারীর আকার ধারণ করবে মানসিক অবসাদ। কি? আবার টেনশানে পড়লেন? না, না টেনশান করবেন না। আসুন আমরা সবাই মিলে আনন্দে থাকি। আনন্দ ছড়িয়ে দিন। যেই ভাববেন আমি কি করে একলাই আনন্দে থাকবেন দেখা যায় ওই আনন্দের জন্য একটু একটু চাপ শুরু হচ্ছে। আসুন আমরা যেহেতু প্রকৃতির সন্তান তাই তার কাছে, তার মতো থাকার চেষ্টা করি। কারণ প্রকৃতি সবাইকে সমান চোখে দ্যাখে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কিন্তু শরীরে দুটো লিভার বা তিনটে ফুসফুস দেয়নি। এবং প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন, তাকে ছাপিয়ে বা ডিঙিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই বা হবেও না কোনদিন।

বিজ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাবো আমাদের সুবিধার্থে কিন্তু কখনই তার দ্বারা অপ্রাকৃতিক কিছুকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়। তাই আগে থাকতেই ভয় নয় কারণ প্রকৃতি আমাদের ঠিক রক্ষা করবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে শুধু তার Signal অনুযায়ী যদি আমাদের Traffic control করি।

কাল

রাজু দাশ

মাঝপথে হাত গলে
চলে গেছে সময়।
ঠাহর করিনি আগে
নিভে গেছে আগুন।
বুকের ভেতরে বাঁশি
ওঠে না আর বেজে।
ঝড়ের মুখে খড়কুটো
এখন এ জীবন!

তবু শিকড়ে পড়লে টান
তরঙ্গ ওঠে মূলে।
রশি ধরার এ মুঠো
এখনো কলম ধরে।
এখনো সেভাবে ছুঁলে
এ মন দেয় সাড়া।
এখনো বলতে পারি
আমিই সে ঝড়!!

অনুগল্প

পারমিতা

সকাল

কলিং বেলের আওয়াজেই ঘুমটা ভেঙে গেল, ঘুমটা জমল না। দরজা খুলতেই পাশের ঘরের রবিনার মুখ ওর স্বামী নির্ণয় হঠাৎ মাঝ রাত থেকে অসুস্থ — আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটি Ambulence, Hospital এখন দুপুর ১২টা বাজতে মিনিট সাতেক বাকি। রবিনা বলল—বৌদি নির্ণয় আমার চাকরি আছে, পয়সা আছে, মা-বাবা আছে। শ্বশুর-শাশুড়ী আছে, মেয়েও আছে কিন্তু -ও, সবে তো ছ-বছর বিয়ে হয়েছে ১২টা বাজতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল গির্জার ঘড়িতে — সবাই চুপচাপ নার্স একটা ট্রলিতে সাদা কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছে কাকে? নির্ণয় নয় তো?

দুপুর

বাড়ি, কর্তারা office-এর ছেলে-মেয়ে সব স্কুলে, পুরো complex টা বেশ শান্ত শান্ত — পাশের রাস্তায় কার্পেট ওয়ালা ভ্যানে করে কার্পেট নিয়ে যাচ্ছে — আর বেশ জোরে হাঁক পাড়ছে — দু-একটা রিক্সা পক্ পক্ করতে করতে যাচ্ছে গাড়ি চলছে — রাত্রিদি দুপুর বেলায় বড্ড একা — মনে পড়ছে শুধু সুপ্রিয়র কথা। ওর প্রথম প্রেম — প্রথম ভালোবাসা যদিও সব ছারখার হয়ে গেছে তবু রাত্রিদির বুকের তলায় সুপ্রিয়— এই দুপুরটায়।

বিকেল

অসামান্য একটা বিকেল হতেও পারত allready আজ office থেকে কেটে পড়বে ঠিক ঠাক আত্রেয় বেরুবে আজ অনেক বছর পরে ঋষিতাকে সময় দিয়েছে — আজ আত্রেয়র মনে হচ্ছে ভুলের ঢেউ গুলো ভেঙে দিয়ে ঋষিতাকে সব উজাড় করে দেবে। কোনো বাঁধা থাকবে না। ছুটি পেয়ে গেছে C.P. Shut down করে সোজা টয়লেট — কি খাবে কোথায় বসবে। কিভাবে চুল আঁচড়াবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ Mobile বেজে উঠল ঋষিতার phone হ্যালো আজ না হচ্ছে না। যদি অন্য কোন দিন আসি?

রাত্রি

উৎসবের রাত্রি বলে সবাই আনন্দে একেবারে মশগুল, খাওয়া দাওয়া হৈ চৈ করবে বলে বাড়ির থেকে তিনটে গাড়ি বেরিয়েছে। নবরূপা সে ঘরে ছোট্ট আলোতে একা একা বসে কে আর দেখে? সবাই বলতে বলতে বেরুলো এই বয়সে আর উনি কি করবেন T.V. দেখুননা নইলে ঘুমিয়ে পড়বে।

ভিতরে তোলপাড়, তবু নবরূপা মুখে হাসি এনে বলল— ঠিকই তো তোমরা ভালো করে ঘুরে এসো বড়ো ছেলে আবার বলল, কাজের মেয়ে রমা তো রয়েছেই।

আজকের খুশি

গার্গী সরকার

আকাশ আজ খুঁজছে আমায়,
বলছে হেঁকে ‘‘বেরিয়ে আয়’’।
মনের থেকে ওই সুদূরে
গাছের পাতায় রোদ যে ধ’রে
ওই খানেতে গঙ্গা ফড়িং
ইচ্ছে হয়ে তার সাথে আজ
খুঁটছে খুশির আদল
নাচছে সেথায় জলের বুকে
লক্ষ নুপূর মাদল
ফুটছে যত শতেক কুঁচি
হীরে মানিক ইচ্ছে খুশি
কাটছে সাঁতার দিচ্ছে উঁকি
লক্ষ ভুলের ফাঁকি . . .

তাই দামাল চোখে স্বপ্ন বুনি
পাশেই আছে মানুষগুলি
হাড়-হাভাতে সময় ঘিরে
মানুষ কেমন নামছে ধীরে,
হাত বাড়ালেই খুঁজে পাবি
একলা বসে হাতড়ে যাবি
বেরিয়ে তোকেই আসতে হবে
নাইলে কি আর স্বপ্ন রবে?
অবিশ্বাসের টুঁটি টিপে
মিছিলে পা মেলাতে হবে
স্বপ্ন নয়তো বেবাক ফাঁকি
পলক ফেলেই নে’না ঝুঁকি . . .

Woman in Theatre

জয়শ্রী ভূষণ

শুরুটা ঠিক কোথা থেকে করবো বুঝতে পারছি না। তবু চলতে চলতে একদিন পথ খুঁজে পাবই এই আশায় কলম খুলে, মনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, আমার ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করার প্রয়াস আরম্ভ করলাম। এবার, —কাকে চয়ন করে আমার কলমের চাকা চলবে? ''থিয়েটার'', ''জীবন'', ''আমি'', ''আমরা'', ''নারী'' না আরও ''অন্য কিছু''। আসলে আমার ভাবনাচিন্তা, মননের অপার সাগরে আমি কখনও ডুবে যাই অতলে, আবার কখনও ভেসে উঠি, কিন্তু আজ অবধি কোনো পারেই পৌঁছোতে পারিনি, কিন্তু অবিরাম সাঁতার কেটে চলেছি।

আমাকে যখন লিখতে বলা হলো আঁতকে উঠেছিলাম, আমি তো লেখিকা নই, কিছু একটা হয়তো লিখে নেব, ভালো করে পারবো কি? এই সমস্ত কিন্তু-পরন্তু প্রশ্নে আমার 'আমিকে' জেরবার করে আমার সাথে আমার আমির যে-দ্বন্দ্ব তাকে অতিক্রান্ত করে অবশেষে আমি লিখতে শুরু করলাম। কি করি, আমি কিছুতেই—পারবো না' বলতে যে পারি না, বড্ড কষ্ট হয়। শুরু হলো আমার চেতন-অবচেতন মনের ভাবনা গুলোকে অক্ষরের মোড়কে বেঁধে লেখার পথ পাড়ি দেওয়া।

কোথাও ছোটবেলায় পড়েছিলাম আমরা নাকি সবাই ''জীবন নামক রঙ্গমঞ্চের কাঠ-পুতুল''। খুব সত্যি যদিও, কিন্তু আমার নিজের জানি না কেন এভাবে নিজেকে কাঠ-পুতুল ভাবতে ভাল লাগে না। তাই জীবন থিয়েটারে যখন যে-চরিত্রটি আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছে তার সঠিক রূপায়নে আমি সদাই সদর্থক চেষ্টা করেছি, করেছি ও করে চলবো। এখনো মনে পড়ে, ছোটোবেলায় যখনই বড়োরা কোনো-কিছু নিয়ে হাহুতাশ করতো, তখন আমি বিজ্ঞের মত নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলতাম, আমার নিজের ভাগ্য আমি নিজেই গড়বো, আমার কর্মই আমার হাতের রেখা বদল করবে, তাই শুধু কাজ করে যাও সময় মতো ফল পাবে—ও খুব গম্ভীর হয়ে বলতাম ''যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে'', —বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের এই বাংলা Phraseটি মনের মধ্যে গেঁথে গেছিল—তাই নাটকের সংলাপের মতো আওড়াতাম ও নিজের জীবনে সাহস সঞ্চয়ে ও অনেক পাহাড় ডিঙোতে এই ধরনের অনেক উপাদান অনেক দূর আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমি আমার উপলব্ধিতে থিয়েটারকে ভাগ করেছি দুই প্রকারে। (১) জীবন থিয়েটার ও (২) থিয়েটার নামক জীবনদর্শন। প্রথমটিতে চরিত্রগুলো নির্বাচনে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকে না, Script-ও জানা থাকে না, কোন দিকে যে আমরা এগিয়ে চলেছি তাও আমাদের অজানা এবং সর্বপরি উপসংহারটুকুও থাকে অজ্ঞাত। শুধুমাত্র যে চরিত্র বা পরিস্থিতি নিয়তির দ্বারা আমাদের ভাগ্যে জোটে সেটি সফল রূপায়ণ কতটুকু করতে পারি—বা কতদূর ভালোভাবে জীবনে দর্শাতে পারি তাই বোধ হয় জীবনের প্রধান উপপাদ্য। আর এই জীবন থিয়েটারের জীবন যুদ্ধে, যে ব্যক্তি, যত বড়ো যোদ্ধা, ব্যতিব্যস্ত ও সমস্যার জালে জড়ানো সত্ত্বেও নিজের দোমড়ানো-মোচড়ানো জীবনকে আশার কিরণে স্বপ্নের আলোর আভায় ভাসিয়ে দেয় সেই মানুষই জীবন থিয়েটারের সফল নায়ক/নায়িকা—কারণ বেঁচে থাকতে হলে এগিয়ে যেতে হবে আর চলার আর এক নামই হচ্ছে জীবন। আর স্বপ্নের আলোর আভায় ভাসতে হলে ''আমি'' র অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করতে হয়। ঠিক যেন রূপকথার সেই সোনার কাঠির মতো। তাই দু-ধরনের থিয়েটারেই ''আমাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর জন্য''—''আমি''—factorটি খুব জরুরি দায়িত্ব পালন করছে। ''আমি''র জন্মও কিন্তু আমাদের আশেপাশে সবার প্ররোচনায়ই হচ্ছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন সব সামাজিক চরিত্রগুলি মিলেই আমাদের মধ্যের এই ''আমি''-কে রোপণ ও বপন করতে সহায়তা করে। তাই আমি যতই ''আমি''র কথা বলি না কেন—আমার ''আমি'' তে ''আমরা'' মিলেমিশে একাকার হয়ে আছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ''আমি'' কে আমরা কিভাবে বাড়তে সাহায্য করছি ''পরিপূর্ণ মানুষ আমি'' না শুধু ''পুরুষ আমি'' না ''নারী আমি'' হিসেবে। সঠিকভাবে সমাজে আমরা এই ''পরিপূর্ণ মানুষ আমি'' রূপায়নে, মূল্যায়নে কতখানি পথ-পাহাড়-মরুভূমি-নদী-নালা-খানা-খন্দ পেরিয়েছি। গন্তব্য অনেক দূর এখনো, আরও অনেক পথ-অনেক বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

এখন যদি ইতিহাস ও সমাজের বিভিন্ন পটে চোখ রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাই, সেই আদিকাল হতে

(লেখাটি 'অভিনয় ত্রিপুরা' কাগজের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২ সংখ্যাতে বেরিয়েছিল)

অজ্ঞতা, কুসংস্কার, প্রহসন, দুর্নীতিও এরকম আরও অনেক সামাজিক কু-বিধি-সমাজের উন্নতির পরিপন্থী কু-ব্যবস্থা ও কু-রীতিনীতির জন্য বিশেষ করে নারীরা মাতৃগর্ভ থেকে নাড়ীর পথটুকু পার হয়ে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলার আগেই, ভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ আজও ঘটে চলেছে। শুধু তাই নয় মেয়ে, কিশোরী, মহিলা, বা নারী-কে, যেকোনো স্তরেই, মানুষ হয়ে বাঁচার জন্য আজীবন সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হয়। আপেক্ষিক ভাবে যদিও আমাদের মনে হতে পারে যে, মেয়েদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু যেভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, খোলামেলা পোশাক-আশাক পরিধান আমরা যেভাবে মেনে নিয়েছি, সেইভাবে কিন্তু—আমাদের মানসিকতার স্তরের ঊর্ধ্বগামী বিচার ধারা,—সাম্যবাদী মনোভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের স্তিমিতগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলেই, অন্তত আমার মনে হয়। এক কথায় বোঝাতে হলে বলতে হয়, নারী এখনও এই বিশ্বায়নের যুগে সবথেকে কম দামী ভোগ্য ও সহজলভ্য পণ্য। শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত হয়েছে, একান্নবর্তী পরিবার ধারা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, মানুষ আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, মানুষ হন্যে হয়ে শুধু ছুটছে আর ছুটছে . . . যার আছে, তার আরও আরও চাই, যার নেই তার কিছুই নেই, . . . সে চোখের সামনে কেউ মরে গেলেও আমাদের কিছু যায় আসে না। কোথায় তাহলে দাঁড়িয়ে আজকের নারী? নিশ্চয় খুব সুবিধাজনক স্থানে নয়। কারণ, সুস্থ সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার প্রথম বিকাশ ও শিক্ষার প্রথম ক্ষণটি শুরু হয় মাতৃগর্ভেই। জন্মের পরেই একটি মানব শিশুকে তার মানবিক বিকাশের পথে পা না বাড়িয়ে প্রথমে শুরু হয় লিঙ্গ নির্ধারণের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়ে হিসেবে বিভাজন, যা সমাজের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এবং এরপর যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তা আজও গতানুগতিক ভাবেই চলছে। পৃথিবী যদিও আমাদের হাতের মুঠোয়, কিন্তু দিনকে দিন বেড়ে চলেছে শিশু-শ্রম, দাসত্ব, যৌন-বৃত্তি, পণপ্রথার দরুন মৃত্যুর হার, মানুষ বেচা-কেনা, আরও কত কী! মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাবে কম পরিচর্যা পেয়ে, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অবহেলায়, অবাঞ্ছিত, উপেক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠছে, এবং ছোটবেলা থেকে প্রতি মুহূর্তে ওদের মনে রাখতে বাধ্য করা হয়, ওরা মানুষজন, ওরা মেয়ে, কিশোরী, নারী এবং নিপীড়ন ও শোষণ ওদের প্রাপ্য সমাজ থেকে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রতিটি পরিবারে যতদিন শিশুর বিকাশে পিতা ও মাতা সম-ভূমিকা পালনে অপারগ থাকবেন ততদিন সুষ্ঠু, সুন্দর ও গঠনমূলক সমাজের বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এবং আমরা অপেক্ষা করছি কবে জীবন নদীতে নিজেদের গা না ভাসিয়ে সবাইকে পারে নিয়ে যাবার জন্য স্রোতে বিপরীতে সাঁতার কাটবো—কবে আমরা মানুষরূপী জীবের খোলস থেকে বের হয়ে আসবো ও মান আর হুঁশ সম্পন্ন মানুষ হবো?

আমাকে যদিও লেখার বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে কিন্তু আমি এখনও বিষয়ের মূল উদ্দেশে পৌঁছোনোর জন্য অলিগলি হয়ে গুটিগুটি পায়ে বড়ো সড়কে পাড়ি দেওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস করছি। ছোটোবেলা থেকেই খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বড়ো হয়েছি। খুব খেলাধূলা করেছি, ছবি আঁকা, চুটিয়ে আড্ডা, গান, নাচ, যোগচর্চা, নাটক, ভর দুপুরে মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা-আম, জলপাই, আমলকী আরও কত কী খাওয়া, পড়ার বইয়ের ভেতরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, তারাশঙ্কর, বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদাভোদা, অরণ্যদেব, ম্যানড্রেক ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র বই পড়া, আবার পরীক্ষার আগে ১০/১৫ দিন খাওয়া-নাওয়া বন্ধ করে, রুদ্ধশ্বাসে শুধুই পড়াশুনা করে দিব্যি ভালো করেই উতরে যাওয়া, . . .সবই করেছি, একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসেবে, কিন্তু নিজেকে সেভাবে নাবালিকা, মেয়ে বলে কখনও ভাবিনি বা ভাবতে হয়নি বা বাধ্য করেনি কেউ। সেই পারিপার্শিক অবস্থা আমার ছিল এবং সেইজন্য I feel proud and lucky too। কখনও কখনও বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চেয়ে দেখতাম আমি অন্য একজন অচেনা পথচারীর হাত ধরে হাঁটছি। ভয় ও লজ্জা পেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছি বাবা দূরে মিটিমিটি হাসছেন। আমিও ছুটে এসে বাবার হাত ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে শতশত প্রশ্নবান ছুঁড়ে গল্প করতে করতে আবার পথ চলা শুরু করেছি। এখনও মনে পড়ে, . . .বাবা খুব মিষ্টি করে বকুনি দিয়ে বলেছিলেন—''মা, কতদিন বলেছি তোমায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটবে না, মাটির দিকে তাকাও, নোংরায় পা পড়বে যে''। তখন কথাটা এত গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি, সত্যি সবসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চলা যায় না। একদিন ঝুপ করে আমার ছেলেবেলা নামক অঙ্কের যবনিকা পাত হলো। বাসন্তী পূজার মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যা আরতির ঢাক বাজছে, এর মধ্যে আমার প্রিয় খেলার সাথি, আমার সকল আবদার মেটানোর চাবি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। আমার বাবা পার্থিব শরীর ত্যাগ করলেন। পায়ের নীচের থেকে হঠাৎ যেন মাটি সরে গেলো, মাথার ওপর যেন বিশাল ছাদ ভেঙ্গে পড়ল, নিরাপত্তার ছায়া সরে গেল মাথার ওপর থেকে—হঠাৎ করে যেন বড়ো হয়ে গেলাম—বৃষ্টি এলেই মনে হতো আকাশেরও আমার মতো মন খারাপ, নিজের অজান্তেই নিজেকে গুটিয়ে নিলাম আস্তে আস্তে, নিজের চারিদিকে এক কঠিন আবরণের

বর্ম পরিধান করে নিজেকে খোলসের মধ্যে পুরে দিলাম ঠিক যেন কচ্ছপের মতো, আর সেই সঙ্গে নিজের মনের ভেতরে অনেকগুলি দরজা খুলতে খুলতে এক অন্য দুনিয়ায় পৌঁছে গেলাম, পেয়ে গেলাম আমার এক অনন্য ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধুকে–আমার বিবেক–বা অন্য আমি। সেই আমার মনের অনাবিল সাগরে যখন আমি ডুব দিলাম, অবাক হয়ে দেখলাম এ তো আরেক দুনিয়া, ঠিক যেন সমুদ্রের ভেতরের মতোন। ওপর থেকে সমুদ্রকে দেখলে মনে হয় শুধু জল আর জল-কিন্তু তার গভীর অতলে আছে আর এক অন্য জীবন-সেখানে অনেক নাম না-জানা রংবেরঙের সুন্দর প্রাণী-পাহাড়, গাছপালা ও আরও অনেক কিছু আমাদের অজানা। সব মানুষের মনের ভেতরেরই এই গভীরতা বর্তমান। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অভাব অনটন, মৃত্যু, লোভ, লালসা, প্রতিহিংসা, অজ্ঞতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতার জন্য জীবনের আকাশে শুধু অসীম শূন্যতা ও জীবন সমুদ্রের অপার জলরাশিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

জীবন থিয়েটারের এই প্রতিবন্ধকতার নিরসনের প্রয়াসই দ্বিতীয়টি, থিয়েটার নামক জীবনদর্শন বা নাটক। দ্বিতীয়টি ঠিক উল্টো, এখানে আমরা জীবন নাটকের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন ঘটনাবলীকে, সমাজের বিভিন্ন চিত্রকে, নাট্যরূপ দিয়ে যথাসম্ভব বাস্তবভাবে জীবনদানে সচেষ্ট হই, ও বিভিন্ন নাট্য চরিত্রগুলি দর্শকদের মননে, আদর্শে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে দর্শক নামক সমাজের একটি অংশের ভাবাবেগকে আলোড়িত করার জন্য সচেষ্ট হই। আর একজন পরিপূর্ণ মানুষ-একজন নারী ও একজন নাট্যকর্মী হিসাবে-সমাজের প্রতি আমার যে দায়বদ্ধতা, 'আমার আমি'কে নতুন করে খুঁজে পাবার যে প্রচেষ্টা, মনের অতল গভীর থেকে ভেসে উঠে জীবন আকাশে পাখি হয়ে ভাসার যে স্বপ্ন দেখা—যে প্রান্তে আকাশ আর সমুদ্র মিলেমিশে একাকার হয়েছে, সেই প্রান্তে পৌঁছে জীবনে সূর্য উঠা-সূর্য ডোবার যে সন্ধিক্ষণ তার মায়াময় আলোয়-আবেগে অপূর্বকে আস্বাদ করা ও সেই উপলব্ধি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারার মতো অনুভূতিগুলোর অনুরণন . . .পেয়েছি থিয়েটার নামক জীবনদর্শনের মাধ্যমে—তাই আমার কাছে, থিয়েটার/নাটক মানে—বেঁচে থাকার রসদ,—থিয়েটার/নাটক মানে—বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যম, —থিয়েটার/নাটক মানে সমাজ গঠনের হাতিয়ার—নাটক মানে অজস্র ঘটনার সহস্র বিবরণ—থিয়েটার/নাটক মানেই জীবন আর জীবন মানেই নাটক।

আমার খুব ছেলেবেলার বিস্মৃতির স্মৃতিতে এখনও ঝলমল যে-নাটকটির একটি দৃশ্য বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠে,. . .ছোট্ট মিনি ডাকছে-কাবুলিওয়ালাকে . . . সেই আবেগ,—বেদনা,—ছোট্ট মিনি'র বড়ো হয়ে ওঠা ও কাবুলিওয়ালারূপী মানুষের ভেতরে তাঁর আর্ত পিতৃসুলভ আবেগতাড়িত আচরণ আজও আমাকে বিষণ্ণ করে . . . এক নিমেষে সেই ছেলেবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় . . .। ছোটবেলায় অনেক ছোটোদের নাটক ও বড়োদের নাটক দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে অনেক ছোটোদের নাটকে অংশগ্রহণও করেছি। লাল পরী ও নীল পরীদের সাথে ঠাকুরমার ঝুলিতে অনেক মজাদার সব নাটকের সাথে একাত্ম হয়ে রূপকথার দুনিয়ায় ডানা মেলেছি। এইভাবেই চোখের পলকে বড়োবেলার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম কবে নিজের অজান্তে। এরই মধ্যে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের পাট শেষ করতে করতেই রত হয়ে গেলাম ব্যস্ত কর্মজীবনে।

যদিও ''জীবন নাটক'' ও ''নাটক জীবন'' দুই-এরই সিংহভাগ পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। দুই ক্ষেত্রেই পুরুষরাই সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও গুরুভার বয়ে চলেছে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় এখনো দুই ধরনের থিয়েটারই বহুলভাবে পুরুষতান্ত্রিক। কিন্তু আমার বলতে দ্বিধা নেই সেই ''থিয়েটার পুরুষ''-রাই আমাকে থিয়েটার নামক জীবন দর্শনের মঞ্চের উচ্চতার শিখরের উত্তরণের প্রথম সিঁড়িতে পা দেওয়ার জন্য সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন। . . . আমিও আস্তে আস্তে আমার আমির খোলস ছেড়ে কবে যে বেরিয়ে এলাম জানি না, . . . একদিন আবিষ্কার করলাম আমি আরও সাহসী, দৃঢ়, আমি সদর্পে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি, আমি উদ্দাম হয়ে হাসছি, আমি ভাসছি, নিজেকে সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ মনে হয়েছে, . . . মনে হয়েছে হ্যাঁ, আমি চোখ বুঁজে-হাতে হাত রেখে বসে নেই, আমি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করেছি, —কারণ নাটক আমার প্রতিবাদের ভাষা, নাটক আমার মতো করে আমার কথা বলার সাহস। নাটক আমাকে আবার স্বপ্ন দেখার বিলাস ফিরিয়ে দিয়েছে, নাটক আমাকে আবার প্রাণ খুলে গাইতে শিখিয়েছে—নাটক আমাকে উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আওড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে—আমার সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত করেছে, নাটক আমাকে আমার জীবনের টানাপোড়েন, সাংসারিক ঝুটো-ঝামেলাকে সহ্য করেও আশার ছায়াকে আঁকড়ে ধরে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয় তাই নাটক এখন আমার কাছে সেই রূপকথার জীয়ন কাঠি, আর এই জীয়ন কাঠি আমায় দেখিয়েছে—নাটক সমাজের দর্পণ,—যে দর্পণে জীবনের প্রতিফলন ঘটে . . . মঞ্চে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অভিনয় শিল্প স্বত্বেরই মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার দর্শন, মননশীলতা ও নাটকীয়তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেন। কিন্তু এই সমাজ দর্পণে নারীরা

এত মুষ্টিমেয় কেন? কেন আমরা শুধু নারী না হয়ে সম্পূর্ণা হয়ে উঠতে পারছি না। কবে একে অপরের হাত ধরে আমরা নারী-পুরুষ সমভাবে দুই থিয়েটারে দাপিয়ে বেড়াবো? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদেরকে আরও ভাবতে হবে ও ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করতে হবে, বিশেষ করে ''থিয়েটার পুরুষ''-দের মুঠো থেকে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠির সূত্রটি ''থিয়েটার নারী''-দের হাতে কিছুটা হলেও ভাগ করে দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষ নাট্য ব্যক্তিত্বদের নিতে হবে। তবেই বোধ হয় আমরা জীবন নদীর চরে আবার সবাইকে নিয়ে খুশি ও উদ্দীপনার স্রোতের ছোঁয়ায় বয়ে যেতে পারব, আর এই স্রোতই একদিন আমাদের জীবন সমুদ্রের অপার আনন্দের গভীরে নিয়ে যাবে যার শেষ হবে দিগন্তের সীমানায়।

"Social revolution is impossible without active participation of women" . . . এবং এই ভাবনা দু-ধরনের থিয়েটারেই নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দুই ধরনের থিয়েটার জীবনেই নারীকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণতা পায় না, অসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাকে আমার অভিজ্ঞতা বলে, it is really hard to bean woman because she must think like a man, act like a lady, look like a young girl and work like a horse, যদিও হাস্যকর ও অবাস্তব কিন্তু এটাই সত্যি। ঘরে বাইরে অফিস আদালতে, মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে, পরিচারিকা ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় নারীদের সমাজের সবার প্রতি জীবন থিয়েটারে যে অমানুষিক নিঃস্বার্থ অবদান, তাঁর সঠিক মূল্যায়ন আমরা কখনও করি না, করতে জানি না, তাই থিয়েটার জীবনে নারীদের এত কম উপস্থিতি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলতে হচ্ছে নারীরা ভুলে যায় ওরা মানুষ, ওদেরও মনের খোরাক চাই, ওদের দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, চঞ্চলতা, উচ্ছলতার প্রকাশ জরুরি। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মা, বোন, মেয়ে, পরিচালিকা, স্ত্রী, হয়েই জীবন কাটিয়ে দিই, ক্লান্ত ও অপাংক্তেয়ভাবে।

এখানেই নাটকজীবনের সার্থকতা। নাটকের মঞ্চ এমন একটি জায়গা . . . অনেকটা খোলা আকাশের মতো, অসীম অনাবিল সমুদ্রের ঢেউ এর চাদরে উথাল পাথাল করতে পারে, আমাদের সেই শৈশবে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমাদেরকে আমাদের কষ্টের কথা, যা কাউকে বলা যায় না, সে যন্ত্রণা, ব্যথা, অবিরত কুরে কুরে খায়, নাটকের মঞ্চে আমরা স্বাধীন, আমি ও আমরা চিৎকার করে বলতে পারি. . . .''আমি বাঁচতে চাই . . . সবাই কে নিয়ে আমি বাঁচতে চাই. . . .'' অথবা . . .''জীবনে ভালোলাগাটাই হচ্ছে সব চেয়ে জরুরি'' . . . এবং এই যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ প্রকারান্তরে আমাদের মনের কোণে জমাট বাঁধা ক্ষতে মলমের কাজ করে, মনের মলিনতা ধুইয়ে দেয়, মানিয়ে নেয় অনেক কিছু, অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে. . . এই মঞ্চে। এবং মঞ্চ বা থিয়েটারে, আমরা যা নই, যা কখনও হতে পারিনি, বলতে পারি না, বিশেষ মুহূর্তগুলো, ফেলে আসা সোনার খাঁচার দিনগুলিকে আবার উপলব্ধি বা আস্বাদ করতে পারি। আর এই অনুভূতির আস্বাদ যে পায় সেই থিয়েটার জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে জড়িয়ে নিই। বহু সংখ্যক নারীদের এবং অবশ্যই পুরুষ ও নতুন প্রজন্মকে নাটক জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে আসতে হলে সেই অনুভূতির আস্বাদন করাতে হবে, এবং সবার মনের ভেতরের অন্যরকম ইচ্ছেগুলোকে উসকিয়ে দিতে হবে।

আমার স্বপ্ল জ্ঞানের পরিসরে, বিগত এক দশক ধরে, আমার পর্যবেক্ষণ,—বরাকের নাট্যচর্চা, বরাকের প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিকুল রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় স্তরের ও এখানের নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, নাট্য কর্মীদের অভিনয়-প্রতিভা এবং গণনাট্য আন্দোলনের যে জোয়ার, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিপূর্ণ নাট্য প্রতিভা সম্পন্না নারী যিনি পরিচালনা ও অভিনয় এবং নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকে নিপুণ, এরকম নারী নাট্য ব্যক্তিত্ব সর্বভারতীয় স্তরেই হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতিরেকে বিরল। 'জনমের' মলয়শ্রীহাসমির সঙ্গে পরিচয়ের পর ও 'জনমের' নাট্যকর্ম আমার নাটক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু মলয়শ্রীহাসমি, ঊষাগাঙ্গুলী, শাঁওলী মিত্র ও সাইপারাঞ্জপের মতো মহিলা নাট্য ব্যক্তিত্ব এতদঞ্চলে প্রায় শূন্যই বলা যায়।

এই অঞ্চলের নাট্যচর্চার ইতিহাস শুধু ইতিহাস হয়েই আছে, কারণ নাট্যচর্চাকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও নাট্যচর্চার জন্য যে ধরনের পড়াশুনা ও চিন্তাধারা করতে হয়, তা থেকে এক বিশেষ অংশ নিস্পৃহ হয়ে আছেন বলেই আমার ধারণা। এ অঞ্চলে মহিলা নাট্য ব্যক্তিত্ব নাটক নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তাভাবনা ও কাজ করছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। তবে সুখের কথা বিগত দু-তিনটি মহিলা নাট্য সংগঠন শুধু মাত্র মহিলাদের নিয়ে নাটক পরিবেশন করছেন, এমনকি এবার এর মধ্যে একটি নাটকের পরিচালিকাও মহিলা ছিলেন। তবে আশা রাখবো অদূর ভবিষ্যতে এই সংগঠনগুলিই মহিলা নিয়ন্ত্রিত নাট্য পরিচালনার সাথে সাথে পুরুষদের চরিত্রে পুরুষদের নিয়েও নাটক করবে।

কিন্তু একটি ব্যাপার আমাকে খুব পীড়া দেয় যে বরাকের নাট্যচর্চা—বিশেষত ''রূপম সর্ব ভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা'' ও আরও কয়েকটি হাতে গোনা প্রতিযোগিতা মূলক নাট্য প্রদর্শনকে কেন্দ্র করেই কোনো মতে জীবিত আছে। এ যেন প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের মতো, পূজা এল তো পূজার ধুমধাম, আর ''রূপমের'' সময় বরাকের সমস্ত নাট্য সংগঠনগুলি জুড়ে কে কার থেকে কত ভালো নাটক করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা, সবাই ব্যস্ত মহড়ায়। তারপর যে যার কাজে,

নাটক নিয়ে আর সেরকম কোনো মাথা ব্যথা কারও থাকে বলে মনে হয় না। অথচ যে মানের নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয় প্রতি বছর, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই অঞ্চলের নাট্য সংগঠন ও নাট্যচর্চা মূলত শহরকেন্দ্রিক। যদিও এ অঞ্চলের বলিষ্ঠ নাট্যকারদের লেখনীতে গ্রামের সমস্যা, নারীদের বিভিন্ন চরিত্রায়ণ থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট বাড়ি ও সন্ত্রাসবাদের মতো সমস্ত বিষয়ই উঠে আসে, কিন্তু নাটকগুলি পর্যাপ্ত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না এবং এখানে অনেক ভালো অভিনেত্রী ও বোধ সম্পন্না মহিলা নাট্য ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, সারা বৎসর অনেকেই নাটক করার কোনো সুযোগ পান না, তাই ওদের প্রতিভা অব্যহৃত থেকে যায়। যেহেতু বেশিরভাগ নাটকেই নারী চরিত্র খুব কম থাকে, এবং প্রায় সব সংগঠনই রূপমে অংশ গ্রহণ করে, তাই নতুন মহিলা নাট্য কর্মীদের আগমনের পথ ও প্রায় রুদ্ধদ্বার। বরাকের এই সমস্যাটি নিয়ে ও নাট্যচর্চাকে নতুন ভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ ও চিন্তাভাবনার বিশেষ প্রয়োজন অবিলম্বেই।

যদিও বাল্য সুলভ চিন্তাধারা, তবুও না লিখে পারছি না, সেদিন Cricket এর IPL খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, নাটককে আরও মনগ্রাহী করার জন্য যদি আমরা এতদঞ্চলে অন্তত IPL এর ধাঁচে নাট্য উৎসবের ব্যবস্থাপনা করতে পারি তা হলে কেমন হয়। শুধুমাত্র নাটকের স্বার্থে ও নাট্য উৎসবের জন্য নিজেদের নাট্য সংগঠনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে, নতুন ভাবে, কিন্তু সংগঠনের নাট্যকর্মীরা সাংগঠনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে, নতুন ভাবে, কিছু সংগঠনের নাট্যকর্মীরা সাংগঠনিক প্রথা ভেঙে যে যার মতো অদল বদল করে মিলেমিশে IPL style-এ, ভালো নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াস যদি করা যায়, আমার মনে হয় নাটকের সংখ্যা যেমন বাড়বে, ঠিক তেমনি সবাই সবার সাথে কাজ/নাটক করার ও সুযোগ পাবে, বৈচিত্র আসবে, একঘেয়েমিও কাটবে। যেহেতু বেশিরভাগ নাট্য সংগঠন গুলিই রূপম ছাড়া সেইভাবে নাটক করার সুযোগ পায় না, তাই আমরা যদি বছরে দুই-তিনটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করি এবং সেই আয়োজনের দায়িত্ব rotationwise কয়েকটি নাট্য সংগঠন ভাগ করে নেয়, এবং এই নাট্য উৎসবে বিভিন্ন সংগঠনের সবার সহযোগে পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়, তবে আরও বেশি মহিলা ও পুরুষ, নতুন প্রজন্ম সবাই ওতপ্রোত ভাবে নাটক ও সমাজ এবং মূল্যবোধের সাথে একাত্ম হতে পারবে। social network sites like, facebook, google+, orkut ইত্যাদি আজকের জমানায় ওই social network site-গুলি visit করলেই আমরা বুঝতে পারি নারী-পুরুষ জাত ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ শুধু মানুষকে চায়, নিজের মত আদানপ্রদানের জন্য, একে অপরের ভাবনা বিনিময় করেন, নিজের আদর্শে অন্যকে প্রভাবিত করেন ও অন্যের আবেগে আন্দোলিত হন। কিন্তু social network site-এ শুধুমাত্র আক্ষরিক ভাবেই আমরা মানুষের আবেগগুলো বুঝতে পারি, আর নাটকই একমাত্র শিল্প মাধ্যম যেখানের নাটকের জড়িত প্রতিটি মানুষ যে পরিচালকই হন, আবহকার, আলো, মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কিংবা makeup, prompter, ইত্যাদি নানা ধরনের যে দায়িত্বেই থাকেন না কেন, নাটকের মধ্যে সমাবেশ করেন গভীর ভাবে, সমাবেত ভাবে। নাটকের মঞ্চ একটি বিশাল canvas-এর মতো, এতে sketch করেন নাট্যকার, কোথায় কি-কোন রং দিতে হবে সেই তুলির কাজ করেন পরিচালক, বিভিন্ন রং এ ভরিয়ে দেন অভিনেতা, অভিনেত্রী ও বাকি আরও সমস্ত নাট্যকলা কুশীলবগণ এবং পরিশেষে যে ছবি ফুটে ওঠে, তার বিভিন্ন রঙে দর্শকরা নিজেদের মন ও আবেগ রাঙিয়ে নেন। এখানেই নাটকের প্রাসঙ্গিকতা। জীবন থিয়েটার ও থিয়েটার নামক জীবন, নারী ও পুরুষদের সম্মিলিত প্রয়াসে, আরও সমৃদ্ধ হোক, আর একজন ''নারী অথবা পুরুষ'' নাট্য কর্মী হিসেবে আমাদের অঙ্গীকার হোক জীবনের দুধের থেকে হাঁসের মতো আমরা শুধু দুধটুকু দর্শকদের জন্য রাখবো, আর সমস্ত জল ধুয়ে মুছে ফেলে দেবে।

আমি প্রবন্ধকার নই, নই গবেষক, বিশ্লেষকও নই। সাধারন নাট্যকর্মী হিসেবে আমার নাটকের প্রতি ভালবাসা, ও নাটকের মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়ভার থেকেই আমার লেখনীর সঞ্চালনা। আমার উপরোক্ত লেখা পড়ে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে, আমি নাটকের অনুরাগে অনুরক্ত, সেই অনুরাগের ছোঁয়া আমার মননে, মস্তিষ্কে, বোধের দায়রায়—নাটকের প্রতি আমার বিশ্বস্ততার আবেশ হয়তো আপনারও পাচ্ছেন। আর সেই বোধের অনুভব থেকেই আজকের এই লেখার অবতারনা। নাটকই আমার লেখনী। একজন সাধারন নাট্যকর্মী হিসেবে আমিও কখনও জীবন ও নাটককে আলাদা করতে পারিনি তাই আমার লেখায় হয়তো জীবন নাটক ও নাটক জীবনের একটা মিশ্রণ ঘটেছে কারণ আমি জীবন ও নাটকের মেলবন্ধন পেয়েছি মাটির সাথে আকাশের মেলবন্ধনের মতো এবং সেই বন্ধন থেকে আমি কখনো মুক্তি পেতে চাই না, আমি আকাশেও মেঘের মতো ভাসতে চাই আবার সেই আমি চাই মাটিতে আমার শক্ত শিকড়ের ভিত।

দিনের-পর-দিন, বছরের-পর-বছরের বঞ্চনা, উপেক্ষা, অনেক বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্বায়নের আগ্রাসন, অপসংস্কৃতির দুর্বার হাতছানিকে উপেক্ষা করেও আজকের এতদঞ্চলের নবীন প্রজন্ম প্রবীণের সাথে

তাল মিলিয়ে চেষ্টা করছে, নিরন্তর নতুন চিন্তা ধারায় সমৃদ্ধ করছে নতুন নতুন নাটক, তাতে রুপালি রেখার মতো ক্ষীণ হলেও আশার আলোয় উজ্জীবিত হই, অদূর ভবিষ্যতে উত্তরসূরিয়া ওদের করিশ্মা দেখাবে, আমরা সবাই এক সাথে একাত্মভাবে, জীবন ও থিয়েটারের উত্তরণের জন্য কাজ করে যাবো নিরলস ভাবে, নতুন ভোরের নতুন সূর্য কিরণের আভার ছটায় আমাদের চারপাশ ছেয়ে যাবে, এই আশায় বুক বাঁধি।

উপরোক্ত আলোচনা, ভাবনার দোলায় বয়ে যাওয়া, তখনই শুধুমাত্র পূর্ণ মাত্রা নেবে, যখন এই ভাবনা গুলো নাটকের মাধ্যমে আমরা আরও সহজ, সতেজ ও পরিপূর্ণ ভাবে নিজের আবেগ ও কথা দিয়ে—যারা সত্যি এই ভাবনাগুলোর সহায়তায় জীবনের পাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, মানুষ নামক জীবের গোড়াপত্তনের কাজে বিন্দু মাত্র হলেও সঞ্চালকের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো, তবেই আমি ও আমরা সত্যিকারের নাট্যকর্মী হয়ে উঠতে পারবো।

তারজন্য নিয়মিত নাটক নিয়ে কাজ করতে হবে। এবং যারা সত্যি নাটক নিয়ে কাজ করছেন, মানুষের জন্য, সমাজের মানবিক বিকাশের জন্য, তাদের জন্য সাধন কিন্তু অধরা নয়। তাদের জন্য অভিনেত্রী ভালো অভিনয় করছে কি করছে না, দলে কতজন মহিলা নাট্যকর্মী আছেন কি নেই, ভালো মঞ্চ আছে কি নেই, আলো ভালো হল না খারাপ, মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা হল কি না, তা গুরুত্ব পূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে, নাটকটি সুস্পষ্ট ভাবে অভিনীত হল কি না এবং সেই নাটকটির মাধ্যমে যে বার্তা প্রকাশ করতে চান, তা কতখানি সঠিক ভাবে উঠে এল সেটাই বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যখন নাট্যকর্মীরা এবং নাট্য দলগুলি নাটক কে ক্ষুরধার কলমের মতো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই নাটক নাটক হয়ে উঠতে পারে।

নাটককে একটি বিশেষ মাধ্যমের মতো ব্যবহার করার পারদর্শিতা দেখানোর জন্য বিশেষ অভিনয় প্রতিভা, বা বিশেষ দলের সদস্য বা সদস্যা হতেই হবে আমি অন্তত তা বিশ্বাস করি না। আমার মতে শুধুমাত্র একটি বিশেষ গুণ প্রয়োজন আর তা হচ্ছে, নাটক নামক কলম বা তুলি দিয়ে যে কাহিনী বা ঘটনাবলী বর্ণনা করতে যাওয়া হচ্ছে, বা যে সামগ্রিক পরিস্থিতির ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হচ্ছে, তা করার চেষ্টা করার আন্তরিক প্রচেষ্টা জারি আছে কি নেই সেটাই হবে মোদ্দা কথা। নাটককে আমার মুখের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, মানে আমি ও আমরা যা বলতে চাই তা আমরা নাটকের ভাষায় বলব, নাটক হবে আমার সেই আঙ্গুল যা তুলে আমি ও আমরা দেখবো কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। আমরা হানাহানি খুনোখুনি করবো না, আমাদের সমস্ত বিবাদ-মারামারি, আমাদের ঝগড়া, আমাদের বঞ্চনার বিবরণ হবে প্রতীকী ভাষায়, আর সেই প্রতীকী ভাষাই নাটক। আর এ আমার শুধু বিশ্বাস নয় দৃঢ় বিশ্বাস যে—এই পৃথিবীতে অসংখ্য নাট্যকর্মী বিভিন্নভাবে, প্রচার বিমুখ হয়ে এই কাজ করে যাচ্ছেন।

আমার কিছুদিন আগের একটি অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরেই পত্রিকাতে আমাদের এখানের চা বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ হচ্ছিল এবং সব থেকে দুঃখজনক খবর ছিল যে চা বাগানের শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণটি অনাহার। আজকের দিনেও অনাহারে মৃত্যুর খবর নিয়ে অবশ্যই পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখাজোখা, শাসকগোষ্ঠীর গা-বাঁচানো বয়ান সবই পড়েছি, কিন্তু সবই যেন কাগজের কচকচানি হয়েই রয়ে গেছে,—কিন্তু কিছুদিন অগে শিলচরের নাট্য সংস্থা ''কোরাস" আয়োজিত দুই দিনের একটি চা বাগান নিয়ে Workshop-এর শেষ দিনের একটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে আমি অফিস থেকে ফেরার পথে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দেরিতেই হাজির হলাম। একটি নাটক চলছিল, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই সবাই চা বাগানেরই বাসিন্দা, ওদের নাটকের ভাষাও চা বাগানের ব্যবহৃত ভাষাই ছিল, এবং সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, একটি বাচ্চা ছেলেও ছিল। নাটকটি আমি পুরো দেখতে পারিনি কারণ আমি দেরি করে গিয়েছিলাম, কিন্তু যতটুকু দেখেছি, তাতে আমি আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি, আমার ভেতরে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, আর ভাবছিলাম আমরা কি সত্যি মানুষ না অন্য কিছু। কিছু করতে না পারার জন্য নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রথম অভিনয় করছিলেন, ওদের কষ্ট, ওদের ক্ষিদে, ওদের বঞ্চনার যে চিত্র, ওদের বোধ ও ওদের কিছু করতে না পারার অপারগতার আবেগ-কান্না—সব নাটক বলে দিয়েছিল—আমি কিন্তু ওদের ভাষাও ভালো করে বুঝিনি, কিন্তু যে যন্ত্রণার ছবি খবরের কাগজ আমাকে দিতে পারেনি, সেই নাটক আমার গায়ে শিহরণ দিয়ে জানান দিয়েছে, কি চলছে ওখানে, দুর্নীতির কোন পর্যায়ে সমাজ, নির্লিপ্ত শাসক, আর আমরা অন্ধ সামাজিক জীব। নাটকের কোনো বিশেষ সাজ, আলো বলতে গেলে কিছুই ছিল না। কিন্তু শুধু আমি ছাড়াও সমস্ত উপস্থিত বোদ্ধা ও নাট্য ব্যক্তিত্বদেরও সেই একই অনুভূতি ছিল। নাটক

শেষ হওয়ার পর আরও চমক ছিল আমার জন্য, আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম, এবং মনে প্রাণে আমার বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় হয়েছিল, "Where there is a will, there is a way"। আমাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হল একজন মহিলা—নাম ''কাজলদেমতা''-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা—উনি এই উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ''বরসিঙ্গা-চা বাগান''-এর বাসিন্দা, এবং উনি দীর্ঘ সময় ধরে এই কাজ করে আসছেন। এই সমস্ত নাটকের মাধ্যমে উনি চা বাগানের মানুষদের নিপীড়নের কারণ ও মূল যন্ত্রণার থেকে বেরিয়ে আসার আশার-আলো দেখাবার চেষ্টা করছেন, আমার কাছে উনি বিশাল বড়ো মাপের নাট্য পরিচালক, নাট্য সঞ্চালক, বিশাল নাট্য মহিলা ব্যক্তিত্ব, একজন সমাজসেবিকা, সবথেকে বড়ো পরিচয় উনি একজন সাহসী, উচ্চ মানসিকতার শুধুমাত্র মহিলা নন, পরিপূর্ণ মানুষ, এবং অবশ্যই আমার নমস্য। আমার স্মৃতিতে আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সর্বদা জ্বলজ্বল করবেন। সেই সাথে আমি ''কোরাস''এর কাছে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য ও আমার এই উপলব্ধির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। ''কোরাস'' বহুদিন ধরে নাটকের মাধ্যমে এ ধরনের সাহসী ও ব্যতিক্রমী কাজ করে যাচ্ছে, এবং চা বাগানের উপর কর্মকাণ্ডকে প্রচারের আলোকে নিয়ে এসে ওদের নাট্য চর্চার ও এতদঞ্চলের নাট্য চর্চার ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

শিলচরের একজন বলিষ্ঠ নাট্যকার, শ্রীচিত্রভানু ভৌমিকের ''বরাক-মঙ্গল'' নাটকটির কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। নাট্যকার শ্রীচিত্রভানু ভৌমিকের বেশিরভাগ নাটকেরই মূল বিষয় বস্তু থাকে স্থানীয় সমস্যা। ''দশরূপক'' সংস্থার ''বরাক-মঙ্গল'' নাটকে আমাদের এই অঞ্চলের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সরকারী বিভিন্ন সুবিধাগুলো যে আদৌ সাধারন নাগরিকদের জন্য নয়, এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের জরা জীর্ণ অবস্থার জন্য যে নির্বোধ রাজনৈতিক চেলাচামুণ্ডা ও আমরা সাধারন জনগণই দায়ি, এবং video conference-এর মাধ্যমের এই অঞ্চলের ভিন্ন চিত্র আদর্শ গ্রাম হিসেবে America ও দেশের অন্যান্য প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া যায়—তারই একটি চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল। নাটক চলাকালীন টানটান হয়ে বসে নাটকটি দেখেছিলাম। ভীষণ ভালো লেগেছিল নাটকটি, মনে হয়েছে, যথার্থ—এইরকম একটি নাটকের খুব আবশ্যকতা ছিল। সব থেকে মন ছুঁয়ে গেছিল গরিব দিনমজুরের কিশোরী মেয়ের অভিব্যক্তি, একটু ভালো করে বাঁচার আশা, মা ও বাবার সাথে পেট পুরে দুবেলা ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নতুন ভোরের আলো দেখার স্বপ্ন দেখতে চাওয়া—খুব বেশি তো কিছু নয়!!! অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছে কিশোরী ''ফুলমতিয়া'' চরিত্রে ''অঙ্কিতা সেনগুপ্ত''. . . নাটকের শেষাংশে যখন ''ফুলমভিয়া''-কে পঞ্চায়েত নেতাদের নির্দেশানুসারে ওদের ভালো থাকার গল্প আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে শোনাতে বলা হয়,—আলো পড়ে ''ফুলমভিয়া''র উপর—ওর চোখটা খুশিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে—ফুলমভিয়া বলতে শুরু করে—''বাবুউউউউ. . . ঐ টিল্লার পিছে, হামদের ঘর. . . হাওয়া দিলে মড়মড় করে হিলে. . . আর বারিষ দিলে একদম গিলা হইয়ে যায়. . .আর তখন আমরা সারা রাত জেইগে বসে থাকি. . .মা বলে ঘরটা কখন গিরে যাবে. . .বাবা বলে. . .গিরবেক নাই. . .আরও ধার লিবে. . .মা বলে. . .আর ধার মিলবেক নাই. . .বাবা বলে না দিলে গাই টা বেইচে দিবে''। এই নাটকটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ যে ইন্দিরা আবাস যোজনা সত্যি যাদের জন্য ওরা আজও ভাঙ্গা ঘরের চাল মেরামত করতে অক্ষম, ধার নিয়ে কোন দিনও ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম—হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও—কিশোরী মেয়ের নিরাপত্তা ও দুমুঠো অন্ন ও মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করতে পারে না. . .''ফুলমভিয়া''র প্রিয় গাইটাকে যখন নিয়ে চলে যায়, তখন তার আর্ত চিৎকার. . .বাপ ও বাপ. . .আমার গাই টাকে বাবু লিয়ে যাচ্ছে গো. . .এবং সবশেষে ''ফুলমতিয়ার'' এইসব অভিব্যক্তির জন্য বকাঝকা ও চড় জুটল, দোভাষী অবশ্য সব সামলে নিয়েছিল। এই নাটকের সমস্ত চরিত্রায়ন প্রায় নিখুঁত. . .কিন্তু আমার কাছে ''ফুলমতিয়া'' চরিত্রটি নাট্যকারের অসাধারণ সৃষ্টি। এই নাটকটিও আমার মতে গ্রামে ও মফস্বল অঞ্চলে আরও বহুবার মঞ্চস্থ হওয়া খুব উচিত ছিল, তবেই হবে এই নাটকের সার্থকতা।

আমার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির চাদরে মোড়া অনেক এরকম নাটকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নাটক দিয়ে আমার সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়নি। শিলচরে আমার প্রথম কাজ ''মানুষের খোঁজে''. . . নাটক নয়, একটি videofilm . . . script writing এবং Directed by শ্রী দেবব্রত চৌধুরী. . . এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণ হিন্দু মুসলমান নয়—ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ যাচাই হয় না, তাই ছিল আসল বক্তব্য। আমার বড়বেলায় ''নঈমা'' চরিত্রটি আমার প্রথম অভিনীত চরিত্র। অভিনয় জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, আমাকে রাজি হতে হয়েছে, কারণ, ''নঈমা'' চরিত্রায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের ''মানুষের খোঁজে''র সন্ধানে দর্শকদের পথদর্শাতে শ্রী দেবব্রত চৌধুরী আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, আমি না করতে পারিনি। প্রায় তিন বৎসর ওদের সাথে কাজ করেছি, এবং ওই Team-এ আমিই একমাত্র মহিলা ছিলাম, এবং ''মানুষের খোঁজে''র ''নঈমা'' চরিত্রায়নের সাথে সাথে আমিও অনেক মানুষের

খোঁজ পেলাম, জানি না কবে কখন থিয়েটার মানুষদের সংস্পর্শে এসে গেলাম ও আস্তে আস্তে কি ভাবে যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে গেলাম নিজেই জানি না। যুবতী ''নঈমা'' নিজের দাঙ্গা কবলিত গ্রাম ও দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলন্ত নিজের বাড়ি থেকে অসুস্থ বৃদ্ধ পিতাকে ও নিজেকে অমানুষদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলে, অবশেষে একজন মানুষের (যদিও হিন্দু) দেখা পাওয়া যায়, —যার সাহায্যে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে ট্রেনে চড়ে নতুন অজানা গন্তব্যে রওনা দেয় . . .একটি মেয়ের বাঁচার লড়াই যার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নেই বন্দুক, আছে শুধু বোধ, মানুষকে চেনার চোখ আর সবাইকে নিয়ে বাঁচার ইচ্ছা। তাই ''নঈমা'' চরিত্রটি আমার ''আমি'' কে আরও সমৃদ্ধ করেছে, আমাকে মুসলমান মেয়েদের অবস্থান গত সমস্যা নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। যদিও আমাদের কাছাড় তথা বরাক উপত্যকাতে হিন্দু মুসলমান দুইয়েরই প্রায় সহাবস্থান তথাপি হিন্দু মেয়েরা, মুসলমান মেয়েদের চেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, অনেকাংশে এগিয়ে। কিন্তু আমার পরিসংখ্যান বলে, আজও এতদঞ্চলের মুসলমান মেয়েদের নাবালিকা অবস্থায় নিজের থেকে প্রায় ২০/২৫ বড় পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়, ওরা অনবরত ঘরোয়া হিংসার শিকার, প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজে পণ প্রথাও এই ধরনের দাবী দাওয়ার জন্য পিটিয়ে খুনের খবর থাকে, সব থেকে যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, এই অঞ্চলের মুসলমান মেয়েদের গান, বাজনা, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ও ভাগ নেওয়ার পরিসংখ্যান প্রায় নেই বললেই চলে, আর বিষয়টি আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই কারনেই, এবং হয়তো এটাও একটি মূল কারণ এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারী সমাজ। এখানে আমরা এখনও হিন্দু ও মুসলমান নামক ধর্মের বর্ম থেকে বেরিয়ে আমরা বরাকের বাঙালি হয়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মুসলমান নারীরা কিন্তু এদিকে অনেক এগিয়ে। ঠিক এই ধরণের একটি বিষয় নিয়ে একটি নাটকের কথা মনে পড়ছে, এ অঞ্চলের স্বনামধন্য বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রীশেখর দেবরায়ের লেখা ও নির্দেশনায় ''কালচারেল ইউনিট শিলচর''এর নাটক ''জিম্মা''। ভীষণ ভালো একটি প্রযোজনা এবং মুসলিম মহিলা ''সাবিনা'' চরিত্রে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। চরিত্রটি খুব প্রশংসিত হয়েছিল, এবং আমার সবথেকে ভালো লেগেছিল যে ''জিম্মা'' নাটকটির দর্শকের আসনে প্রচুর মুসলিম বর্গের পুরুষ ও মহিলারা ছিলেন। এই যে এক অদ্ভুত বা অজভুত বললেও ভুল হবে না,—এক দ্বন্দ্ব—হিন্দু ও মুসলমান,—আমাদের মধ্যে এক বিশাল দেওয়াল. . .অথচ আমাদের ভাষা, চলাফেরা, কথা বার্তা, খাওয়া-দাওয়া প্রায় সমস্ত কিছুই একই রকম, এবং তার থেকেও বড় কথা, আমরা এই ভাবেই পাশাপাশি বছরের পর বছর বসবাস করে আসছি, কিন্তু আমাদের মানসিকতার আধুনিকীকরণ সেই ভাবে ঘটছে না, সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিকাঠামো এই বিষয়ে সময় পেলেই সুড়সুড়ি দিয়ে জানান দেয়, এই ক্ষতটিকে আরও গভীর করার কুপ্রয়াস চলছে ও চলবে। এই নাটকের মাধ্যমে ''এই অঞ্চলের মুসলিম মেয়েদের তথা মুসলিম সম্প্রদায় ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক দ্বন্দ্ব ভুলে আসলে আমরা হিন্দু-মুসলিম ব্যতিরেকে একে অন্যের পরিপূরক হওয়া উচিত এবং এর জন্য উভয় পক্ষকেই একে অপরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে,''—এই সন্দেশ টুকু দেওয়ার প্রচেষ্টার জন্য নিজেকে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে, মনে হয়েছে, হ্যাঁ আমি অন্তত সেই চেষ্টা করেছি, উভয়ের কাল্পনিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্বমোচনের।

নাটক আমার বোধের পরিসীমা বর্ধিত করেছে, নাটকের চরিত্র গুলি যেন আমার উপর এক বিশাল দায়ভার চাপিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি নাটক নিয়ে কেন এত ভাবি, কেন নাটক নিয়ে আমার এত টানাপোড়েন—কিন্তু যেদিন থেকে আমি আমার কথা আমার মত করে বলতে শুরু করেছি, যদিও কথাগুলো শুধুই আমার জন্য নয়, সেদিন থেকেই জানতে পেরেছি, নাটক মানেই আত্মস্থ হওয়া—নাটক মানে আত্মসমালোচনা করা। আমার খুব ভালো লেগেছিল, যেদিন আমি আবিষ্কার করলাম আমি একজন নাট্যকর্মী। আমাকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল, নাট্যকর্মী হিসেবে, না মহিলাও নয়, পুরুষও নয়, শুধু নাট্যকর্মী। ''বদরপুর থিয়েটার ওয়ার্কশপ'' বদরপুর আয়োজিত একটি থিয়েটার নিয়ে আলোচনা সভায় নাট্য বোদ্ধাদের সাথে আমিও আমন্ত্রণ পেয়ে যোগ দিতে হাজির হলাম। আলোচনার বিষয় ছিল ''নাটক''—নাটকের মান, কেন নাটক হবে, কেন আগের মত নাটক হচ্ছে না, সব সংগঠনকে কিভাবে আরও ওতপ্রোতও ভাবে নাটকের সাথে জড়ানো যায়, ইত্যাদি বিভিন্ন আলোচনা হল। আমার ভালো লেগেছিল এই ভাবের আদান প্রদান। সংবাদ মাধ্যমে কেন নাটকের খবর সেইভাবে প্রচার কেন হয় না, তা নিয়েও কিছু ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেছিলেন কিছু বক্তা। তারপরই হঠাৎ আমাকে আহ্বান করে একজন নাট্যকর্মী বলে পরিচয় করে দিয়ে কিছু বলতে বলা হল। আমি তো প্রায় ঘাবড়ে গেছিলাম, কারণ আমাকে কিছু বলতে হবে আমার জানা ছিল না, তাছাড়া আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো তাও জানা ছিল না, যাই হোক, নতুন পরিচয়ে অভিভূত আমি ''নাট্যকর্মী'' হিসেবে আমার তাৎক্ষণিক মনের ভাবপ্রকাশ করলাম—বললাম সংবাদ মাধ্যমে কেন নাটকের খবর সেইভাবে প্রচার কেন হয় না,

সেটি না ভেবে আমরা নাটককে কিভাবে মাধ্যম হিসেবে আরও বিস্তৃতি দিতে পারি তা নিয়ে আমাদের বেশি করে শুধুই ভাবা নয়, নাটক সাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। নাট্য আন্দোলন, নাট্য সংগঠন ও নাট্যকমী. . . এই শব্দগুলো একটি শক্তিশালী মাধ্যমের কিছু term তাই নাটকের প্রচারের জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। নাটকই একমাত্র সরাসরি মাধ্যম যা দর্শক—শ্রোতা কে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী নাটকের উপস্থাপনা। আর এখানেই পথ নাটকের, বিষয়ে আরও ভাবার ও পথ নাটক নিয়ে কাজ করার সম্ভাবনার রাস্তা খুলে যায়।

জরুরি নয় নাটক করতে হলে স্থায়ী মঞ্চেই করতে হবে, এবং দর্শক ও বাতানুকুল পরিবেশে আরামে বসে নাটকের মজা নেবেন, আমাদের সেই সমস্ত দর্শকদের নিয়েও ভাবতে হবে যাদের নাটক দেখতে আসার, সময় ও সাধ্য নেই, তাই পথ নাটকের মারফত আসল বক্তব্যও সেই সমস্ত দর্শকদের বোধের পরিসীমার দায়রা বাড়ানোর জন্য এগিয়ে যেতে হবে, আর তা কিন্তু সম্ভব নামক মাধ্যমের দ্বারা। এখানে একটি পথ নাটকের উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে, আমার অভিনীত প্রথম পথ নাটক শ্রী শেখর দেবরায় রচনায় ''তিন মন্ত্রের তিন ফুঃ''। নাটকের মূল বিষয় আমাদের এতদঞ্চলের বিপর্যস্ত রাস্তাঘাট এবং নিস্কর্মা মন্ত্রী বিধায়কের নিষ্ক্রিয়তা। পথ নাটকটি lead করার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমাকে বলা হল, আমিও নাটকটিকে কোন মতে উৎরে দেওয়ার জন্য রাজি হলাম, খুব একটা সাহস মানে পথ নাটক করার জন্য যে রকম ক্ষুরধার হতে হয় আমার মনে হচ্ছিল সেই সাহসটা ঠিক যেন আমার মধ্যে নেই। তবুও একবার ১২ এপ্রিল, সফদরহাসমির মৃত্যু দিবসে যা পথ নাটক দিবস হিসেবে পালিত হয়, ভারতীয় গণ নাট্য সংগঠনের পরিচালনায় আমরা নাটকটি শহর ও গ্রাম ও মফস্বলের বেশ কিছু স্থানে পরিবেশন করেছিলাম। খুব ভালো একটি নাটক এবং বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে দর্শকদের আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়াটা ও নাটকের বিষয়বস্তুকে বুঝে নেওয়া ও সহমত পোষণ করা, আমাকে ''আমি'' হতে আরও বলিষ্ঠ করেছে। নাটকটি বহুবার আমরা করেছি এবং সব থেকে মজা পেয়েছিলাম যে হয়তো এমন কোন অনুষ্ঠানে আমরা যখন নাটকটি করছিলাম, দর্শকাসনে বসে ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা ও মন্ত্রী। তখন মনে হয়েছিল, না নাটক তো নয়, সরাসরি নাটকের রূপক কথকোপনের মাধ্যমে চপেটাঘাত করছি এবং কিছু করতে না পারার লজ্জা আমি কিন্তু ওদের চেহারার অভিব্যক্তিতে দেখতে পেয়েছিলাম। এখানেই আমাদের নাটকের সার্থকতা।

কোন একবার মনে আছে, কাছাড় ব্লাড ডোনারস এ্যাসোসিয়েশন শিলচর, ব্লাড ডোনেশনডেতে একটি নাটক করার অনুরোধ করেছিল, ওরা প্রতি বছর দিনটি খুব সুন্দর ভাবে পালন করে, সেবার আমার গিয়ে খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু আমাদের নাটকটি দারুণ ছিল, সবাই নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময় খুব উপভোগ করেছিলাম, দর্শকরাও খুব মজা পেয়েছিল, কিন্তু নাটকটি এত informative ছিল যে, আমি নাটকটিতে অংশগ্রহণ করার ফলে রক্তদান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম, এবং অন্যদের কে জানাতেও পেরেছিলাম। এই নাটকটিও শ্রী শেখর দেবরায়ের লেখা ও নির্দেশিত, আমার সব থেকে ভালো লাগা নাটকের একটি এই নাটকটি। প্রথমে আমরা নাটকটি ''রক্ত'' নামে মঞ্চস্থ করি, পরে শেখরদার পাণ্ডুলিপির যে নাম ছিল ''সমবেত সংলাপ'' নামেই নাটকটি পরিবেশিত করেছিলাম। এই নাটকের মূল বিষয় ছিল, রক্ত ও জীবন—রক্তদান সম্বন্ধে ছোটো ছোটো খুব জরুরি কথা, এবং অবশ্যই রক্ত দানের আবশ্যকতা। নাটকটি পথ নাটক হিসেবেই বেশি পরিবেশিত হয়েছে, তবে মঞ্চে ও বহুবার নাটকটি হয়েছে। আমি যে কথাটি বলতে চাইছি, মূল কথাটি হল, নাটক ও হতে পারে সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা, ভালো গুণাবলী, অন্যায় অবিচার, সামাজিক অজ্ঞতা ইত্যাদি দূরীকরণের একটি পন্থা। সত্যি বলতে কি আমিও আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলাম, নাটক নামক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমরা যদি অন্তত নিজেদের ভাবনার জটগুলো খুলে দিতে পারি, আর সবাইকে নিয়ে সেই রাস্তায় জীবনের কিছুটা পথ পাড়ি দিই, এবং সবাই কে কি করে ভাবনার ছোঁয়ায় মশগুল হতে হয় সেই নেশাটা ধরিয়ে দিতে পারি, তখনই আমরা যথার্থ নাট্যকর্মী হয়ে উঠতে পারবো।

শুরুর দিকের কথা, আমাকে কেউ বিশেষ চেনে না, তখন আমি ''মানুষের খোঁজে'' ভিডিও ফিল্মে কাজ করছিলাম প্রায় শেষের দিকে, হঠাৎ একদিন ফোন করে আমার সাথে দেখা করতে আমার বাসায় এলেন, নিজের পরিচয় দিলেন, নাম বললেন একজন নাট্যকার, সাথে আরও একজন ছিলেন, এসেই চটপট করে আমাকে ওনার চিত্রনাট্য সংক্ষেপে শোনালেন, আমি কিছু বলার আগেই, বললেন কোথায় কখন রিহার্সালে যেতে হবে, আমি একটা হেসে কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, আমি পারবো আপনি জানেন? উনি বললেন তোমাকেই করতে হবে, তুমি চলে এসো। এর আগেও বেশ কয়েকটি অনুরোধ এসেছিল, কিন্তু আমি খুব ইচ্ছুক ছিলাম না। ওনার আমার প্রতি বিশ্বাস ও উনার আত্মবিশ্বাস দুইই আমাকে প্রভাবিত করেছিল। পরে খবর নিয়ে জেনে ছিলাম, তিনিই সেই চিত্রভানু ভৌমিক, এবং উনিই প্রথম নাট্য ব্যক্তিত্ব যার সাথে আমার প্রথম কাজ, যদিও নাটক নয়, ছিল

দূরদর্শন-এর একটি Tele-Play ''সন্ধ্যা''। যেদিন প্রথম রিহার্সেলে গেলাম, ঠিক নাটকের মতোই রিহার্সেল হচ্ছিল, আমি তখনও নাটক অতশত বুঝিনা, তবে ক্যামেরায় সামনে কাজ করার অভিজ্ঞতার সুবাদে বুঝতে পারলাম, একটি নাটক কেই চিত্রনাট্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাকে বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু বললেন তোমার মতো করে ভেবে নাও, এই এই ব্যাপার। অসম্ভব ভালো ও সহজ সরল তথাপি হৃদয় ছোঁয়ানো একটি গল্প। আমার বিশেষ চিন্তা করার অবকাশ ছিল না, কারণ আমি ততদিনে ক্যামেরার সামনে সাবলীল হয়ে গেছি, আর ঝটপট করে shotwise কাজ শেষ করতেই আমি বেশি আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু পুরো shooting টাই একটু অন্যরকম ভাবে ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল, shot division করা হয়ে উঠেনি। মনে মনে ভাবছিলাম, নাটক—ফাটক খুবই বিরক্তিকর, শুধু রিহার্সেল, আমার ক্যামেরাই ভালো, চটপট এসে shot দিয়েই কাজ শেষ। কিন্তু অপর দিকে অন্যরা বলাবলি করতো, নাটকই ভালো, ক্যামেরার সামনে যত ঝামেলা। আমি ছাড়া এই টেলি নাটকে সবাই নাটকের মানুষরাই ছিলেন, এবং সবাই আমার অচেনা। সব শেষে দৃশ্যটি আমার ছিল, এবং আমার এখনো মনে আছে, সারাদিন বসে ছিলাম, ঠিক সন্ধ্যার সময় আমার shot এর shooting শুরু হল, তখনও নাটকটির নাম ঠিক হয়নি, উনি আবার নাটকের নামটি আগাম জানান দেন না, একদম শেষ মুহূর্তে সেটি জানান। কেন্দ্রীয় চরিত্র ''সন্ধ্যা''র ভূমিকায় আমি একজন পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী, যে নিজের সাংসারিক জীবন যুদ্ধে ম্রিয়মাণ, কিন্তু সবাইকে নিয়ে ভালো ভাবে বাঁচার জন্য কোন ত্রুটি রাখতে চাইছে না। মেয়েটি যদিও অল্প বয়সের, কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থার জন্য মেয়েটিকে অনবরত নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বামী পঙ্গু, বিছানায়, তাই সারাদিন কাজ করে রাতে ঘরে ঠোঙা বানিয়ে দোকানে বিক্রি করে কোন মতে শাশুড়ি-স্বামীর মুখে দুটো অন্ন ও স্বামীর পথ্য জোগাড় করতে করতে নাজেহাল। স্বাভাবিক ভাবেই যখন তখন ঘর থেকে বেরোতে হয়, ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়, অনেক পুরুষ মানুষদের সাথে কথা বার্তা বলতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে কিছু কাজে পুরুষ মানুষ এসে খোঁজও করে, যা হয় আজও—আস্তে আস্তে আশে পাশের প্রতিবেশী ওকে সন্দেহ ও খারাপ মেয়ে বলে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু ওর স্বামী কিন্তু কথা বলতে না পারলেও ইশারায় এসবের প্রতিবাদ করে। সব শেষের দৃশ্যে, যখন মেয়েটি একটা হুইল চেয়ার নিয়ে বাড়িতে আসে, সেদিন একটু বেশী রাতই হয়ে গেছিল, কিন্তু নিজেকে নিংড়ে দিয়ে, সবার অনুমান কে মিথ্যা প্রমাণিত করে যখন সন্ধ্যা প্রমাণ করল সে কতটা আশাবাদী, নিজের পঙ্গু স্বামী কে আবার জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে, হুইল চেয়ারে বসিয়ে নতুন করে বাঁচার জন্য যে সংঘর্ষ করে যাচ্ছে, আর এই হুইল চেয়ারটি জোগাড় করার জন্যই যত কাণ্ড। আমার এখনো মনে আছে, যখন সন্ধ্যা, কলিং বেল বাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো, পেছন থেকে টেনে নিয়ে এলো হুইল চেয়ারটি, তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিল। ''সন্ধ্যা'' যে হুইল চেয়ারে স্বামীকে বসিয়ে এই জীবন চলার পথে ভালো ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিল. . .শুধু তাই নয়, নিজেও বাঁচতে চেয়েছিল সবাইকে নিয়ে। সেই সাথে সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার এই যে আন্তরিক প্রয়াস থেকেই কি আমরা বুঝতে পারি না ''সন্ধ্যা''রা কত শক্তিশালী, ওরা দুর্বল নয়, ওরা খারাপ মেয়ে মানুষ নয়, ওরাও শুধু মানুষ, স্বপ্ন দেখতে চায়, বাঁচতে চায়, হাসতে চায়। ভীষণ ভালো শক্তিশালী একটি চরিত্র. . .আমার মনে আছে, নাটকের শেষ দৃশ্য, কিন্তু আমার অভিনীত প্রথম shot, আমার চোখটা জ্বলজ্বল করছিল, বুকের ভেতর কেমন জানি একটা কষ্ট হচ্ছিল, cut and OK শুনতে পেলাম, আরও শুনলাম একজন co-actor আশ্চর্য হয়ে আমায় বলছেন first takeই ok হয়ে গেল! অপ্রিয় হলেও আজও সত্যি, যে নারীরা, কিশোরীরা, মেয়েরা, মহিলারা যত বেশি বুঝছে বেঁচে থাকার জন্য, সমাজ আজ ও হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ওদের দিকে আঙ্গুল তুলতেই বেশি আগ্রহী। কিন্তু সব কিছুকে, সব বাধাকে নস্যাৎ করে দিয়েও এই সমাজের অগুনতি ''সন্ধ্যা''রা জীবন রাতের অন্ধকার আকাশে সন্ধ্যাতারা হয়ে অন্যদের আলো দেখাবার আপ্রান চেষ্টা করছে, এবং অপেক্ষা করছে কখন ভোরের আলো ফুটবে। এই চরিত্রটি-র মাধ্যমেই আমি বিশেষ পরিচিতি পেয়েছি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল দর্শকদের কাছে। অসম্ভব ভালো কিন্তু খুব সাদামাটা ছিমছাম একটি প্রযোজনা, এখনও প্রায়ই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয়ে থাকে। নাট্যকার শ্রী চিত্রভানু ভৌমিক এর এই যে প্রয়াস অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয়ে থাকে। নাট্যকার শ্রী চিত্রভানু ভৌলিক এর এই যে প্রয়াস, নাটকের মাধ্যমে ''সন্ধ্যা''দের বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার ও জীবনের স্রোতের বিপরীতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ভেসে থাকার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার চিত্রাঙ্কন আসলে সামাজিক জীবদের মান ও হুঁশ নামক বোধের আদল দিয়ে মানুষ রূপ দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয়।

এই যে ছোট ছোট অথচ খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলি কে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা ও দর্শকের মনে প্রশ্ন উত্তরের ডামাডোল তৈরী করে দেওয়া, সব পারেন নাট্যকার। আমি যে চরিত্র বা নাটকের কথাগুলো এখানে আলোচনা করছি, হয়তো মনে হতে পারে পাঠকবর্গের কাছে আমি শুধু বাছা চরিত্র গুলিকেই বিশ্লেষণ করছি তা নয়, আসলে আমি যে চরিত্রগুলিকে মনন করেছি, উপলব্ধি করেছি,

আমার মতো করে ভেবেছি, আমার জীবন থিয়েটারের অনেক মুহূর্তের সাথে একাত্ম হতে পেরেছি যেসব চরিত্রায়নের মাধ্যমে, সেগুলি আমাকে আমার ''আমি'' থেকে সমাজের ''আমরা'' হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, সেই গুলিই আপনাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি। আমাদের রোজকার জীবনের অনেক কিছুই আমি মেনে নিতে পারি না, মেনে নিতে কষ্ট হয়, একেক সময় মনে হয় কেন মানুষ সব সময় এত আত্মকেন্দ্রিক, কেন চোখ থাকা সত্ত্বেও না দেখে অন্ধের মত পাশ কেটে চলে যায়, এত সব আমি একা কি করে প্রতিরোধ করবো, মাঝে মাঝে ভীষণ হতাশ লাগে, কিন্তু আমার বিবেক আমার অন্য ''আমি'' আমাকে কবিগুরুর ভাষায় জানান দেয়, ''অন্তর গ্লানি সংসার ভাব. . .পলক ফেলিতে কোথা হাহাকার. . .'' আর তাই আমার মন বলে ''যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে. . .'' . . . যে কোন ভাবেই হোক এগিয়ে যেতে হবে, থামা চলবেনা, এই আশায়. . . চলতে চলতে একদিন ঠিক পৌঁছে যাবোই।

এই মুহূর্তে আমার আরও একটি নাটকের কথা খুব মনে পড়ছে কয়েক বছর আগের কথা, সব থেকে দুঃখজনক যে নাটকটি আমরা মাত্র একবারই মঞ্চস্থ করেছি, তারপর আর সম্ভব হয়ে উঠেনি, একটি পরীক্ষা মূলক নাটক, বিশিষ্ট নাট্যকার শেখর দেবরায়ের লেখা ও নির্দেশনায় ''শিলচরকালচারেল ইউনিট''এর পরিবেশনা ''রূপান্তর''। উত্তরপূর্বাঞ্চল এর বিবিধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং এতদঞ্চলের সমস্যা, রাজনীতি এবং সন্ত্রাসবাদ এবং প্রতিবাদের সঠিক ভাষা কি সেই প্রশ্ন নিয়েই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। একটি চর্চিত নাটকের অন্যতম এই নাটক। পত্র পত্রিকায় অনেক দিন ধরে অনেক বিদগ্ধজনের মতামত, সমালোচনা ও আলোচনা প্রকাশ হয়েছিল। নাটকটি খুব প্রশংসিত ও হয়েছিল। নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার একটি প্রশ্ন দর্শকদের জন্য তুলে ধরেছিলেন—কি হওয়া উচিত আমাদের প্রতিবাদের ভাষা? প্রকৃতির প্রাচুর্যে ভরপুর কিন্তু সঙ্কুল জনক ও কঠিন ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন, উত্তরপূর্বাঞ্চল ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক পিছিয়ে, এবং তার জন্য রাজনীতি বহুলাংশে দায়ী।

মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম. . .এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ও বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে কিছু সুযোগ সন্ধানী অমানুষ, রাজনীতিবিদ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর নিরীহ ও বোকা জনগণ কে প্রতিবাদের নামে ফুসলিয়ে সন্ত্রাসবাদ নামক এক স্থায়ী ব্যবসাপ্রস্থ স্থাপন করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, সাধারন মানুযের মনের ক্ষতকে উস্কে দিয়ে সন্ত্রাস নামক ভয়ংকর ছোঁয়াচে মারণ রোগের শিকার বানাচ্ছে। আর যারা সন্ত্রাসী, ওরা নিজের জীবন ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে অক্লেশে ঠাণ্ডা মাথায় খুনী রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু ওদের এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পেছনে যে যুক্তি কাজ করে তা হচ্ছে. . .এই পন্থা ওদের প্রতিবাদের ভাষা. . .আবার এই প্রতিবাদ কে দমনের জন্য সেনাবাহিনী ও সরকার মণিপুরে যে দমন নীতি চালাচ্ছে (যার মধ্যে অত্যাচার ও ধর্ষণ ইত্যাদি ও বর্তমান), তার প্রতিবাদে একবার মণিপুরের একটি ঘটনায় কিছু সংখ্যক ইমারা (মনিপুরীমায়েরা) সেনা বাহিনীর কার্যালয়ের সামনে একসাথে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গর্জন করে উঠেছিল—''আয় আমাদের ধর্ষণ কর, দেখি তোদের কত ক্ষমতা''. . .এই যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এবং তার পরবর্তী প্রতিবাদ. . .একই সাথে আমরা যদি গৌহাটির সেই আদিবাসীদের নিজস্ব দাবী নিয়ে মিছিলের ঘটনার দিনের কথা স্মরণ করি. . .এবং পরে পুলিশের ব্যভিচারী লাঠি চালানো. . . . এবং একাংশ জনগণের সেই মিছিলের প্রতিবাদ স্বরূপ লক্ষ্মী ওরাং নামের আদিবাসী কিশোরী কে সম্পূর্ণ নগ্ন করে রাজপথে প্রকাশ্যে দিবালোকে চলতে বাধ্য করেছিল. . . ঐ ঘটনা গুলির সমন্বয় করে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি বিভিন্ন প্রতিবাদী ভাষা. . .আমি এই নাটকে ইমা ও আদিবাসী মেয়েটির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। ইমা চরিত্রটি আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল. . . আমার ভাবতে গা শিউরে উঠেছিল. . . যে কতখানি চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন নারী স্বেচ্ছায় এ কাজ করতে পাবে. . . কতখানি অসহায় মনিপুরের ইমারা. . . আর লক্ষ্মী ওরাং আমাদের মহাভারতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, সত্যি আজও নারী কত অসহায়,. . . আমরা আমাদের নাটকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলাম, সাত বোনের রাজ্যের সমন্বয় মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, আমরা আমাদের বিবিধ ভাষা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সবুজ পরিমণ্ডল, বাধা বিপত্তি এসব নিয়েই আছি ও থাকব। শুধু আমাদেরকে আমাদের মত করে থাকতে দাও. . . এবং দর্শক সমস্ত প্রতিবাদের ভাষা পর্যালোচনা করে নিজেই ঠিক করে নিক—কি হওয়া চাই সঠিক প্রতিবাদের ভাষা। আলোচনা, একে অপরের সাথে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও মানবিক বোধ সম্পন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশই হওয়া উচিত আমাদের সঠিক প্রতিবাদের ভাষা।

প্রকৃতির মতো সমাজও বিবর্তনমুখী. . . এবং সামাজিক রীতি নীতি, প্রথা ও উন্নত চিন্তাধারা ও সমাজ সংস্কার মূলক কার্যকলাপ দলগত প্রয়াসের ফসল নাও হতে পারে। একক প্রচেষ্টাও খুব সুক্ষ্ম ভাবে বিশাল বৈপ্লবিক জোয়ার আনতে পারে এবং সামাজিক কুপ্রথা নিরসনে এক ইতিহাস গড়ে তুলতে পারে। সত্য ঘটনা ও ইতিহাস অবলম্বনে আরও একটি নাটকের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই। নাটক

''শিলালিপি'', নাট্যকার শেখর দেবরায়, পরিবেশিত হয়েছিল ''শিলচরকালচারাল ইউনিট''-এর প্রয়োজনায়। খুব পুরনো নয়, ২০১১ তে প্রথম মঞ্চস্থ হয়, পরে এই অঞ্চলের বিভিন্ন নাট্য উৎসবে ও ত্রিপুরাতেও নাটকটি পরিবেশিত হয়েছিল। গত বছরই মেলাঘর-ত্রিপুরানাট্য উৎসবেও নাটকটি পরিবেশিত হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত বাংলাদেশের নাট্য দল ''লোক নাট্য দল'' এর নাট্য কর্মীরাও সবাই খুব ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নাটকটির। নাটকটির মূল বিষয় আমাদের কাছাড়ের আজকের যে অঞ্চলটি ''ডিমা হাসাও'' যা পূর্বে উত্তর কাছাড় বলে পরিচিত ছিল, হাফলঙ-মাইবঙ-হারাঙ্গাজাও-মাহুর-জাটিঙ্গা-মাহুর. . .ইত্যাদি অঞ্চলগুলির সমাহারই আজকের ডিমা হাসাও, সেই অঞ্চলের রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে নরবলি নামক কুপ্রথার অবলুপ্তি ও পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনাবলীর নাট্যরূপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সেই সঙ্গে খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস দুর্নীতি এই অঞ্চলটিকে আজ আসাম তথা বরাক উপত্যকা এবং অবশ্যই ভারতবর্ষের রক্তক্ষয়ী বধ্যভূমির একটি অগ্নি গর্ভে পরিণত হয়েছে। কয়েক হাজার বছর পূর্বে সেই কাছাড় রাজ্যের রাজার অকাল প্রয়াণে তাঁর নাবালক পুত্র সুরদর্পনারায়ণকে রাজা রূপে স্থলাভিষিক্ত করা হয়, কিন্তু যেহেতু রাজকুমার সুরদর্পনারায়ণ খুবই ছোট ছিলেন, মাতা চন্দ্রপ্রভা রাজকুমার সুরদর্পনারায়ণের হয়ে সমস্ত রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের যে বিভিন্ন hypocracy এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রায়নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা নাটকটিকে শুধু মাত্র একটি ভালো নাটকই নয়, একই সাথে নাটকের বিষয় বস্তুকে contemplative and contemporary করে তুলেছে। ''রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা'' চরিত্রটি আমার মতে আমার অভিনীত কঠিন চরিত্র গুলির মধ্যে একটি। রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি অকাল মহামারী ইত্যাদি নিরসনে রাজ্যের ধর্মাধ্যক্ষের আদেশে প্রতি বছর মায়ের মন্দিরে মায়ের চরণে নরবলি উৎসর্গ করা হয়। যারা নর বলির যোগানদার ''মাইপাডাউ'' নামে ওর পরিচিত, সমাজতন্ত্রের অংশ বলি, এবং অবশ্যই রাজ তন্ত্রের কেউ কিন্তু নর বলির জন্য আজ অবধি বলি হয়নি। রাজ্যের সুখ শান্তির জন্য সাধারন নিরীহ প্রজাদের কেই সব সময় বলির পাঁঠা হতে হয়। কারণ সমাজতন্ত্রের ও রাজতন্ত্রের প্রতি সমীহ ও সত্বার অধিকারকে হাতের মুঠোতে রাখতে কিছু মানুষ সবসময় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। রাজ মাতা চন্দ্রপ্রভার চিন্তাধারার প্রভাবে রাজা সুরদর্প নারায়ণ বড়ো হয়ে উঠলেন, কোন তন্ত্রের কাঠপুতুল না হয়ে সত্যিকারের রাজা হলেন এবং ইতিহাসে পাতায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ভুবনেশ্বর বাচস্পতি প্রেমের বাণী, হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে সৌহার্দের ভাষা রাজা মাতা চন্দ্রপ্রভাকে নিজের ভাবনার প্রতিফলন ভেবে উল্লসিত হওয়া এবং স্বীকারোক্তি যে এমন ব্যক্তিত্ব রাজসভায় চাই যার জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধকার দূরীভূত হবে, এবং অবশেষে যখন রাজা সুরদর্পনারায়ণ ঘোষণা করলেন আজ থেকে নর বলি রাজ্যে নিষিদ্ধ হল, তখন সমাজতন্ত্রের কুশীলবরা এই আদেশ মেনে নিলেও ''মাইপাডাও''রা কিন্তু মানতে পারল না। ওরা বলল, আপনারাই তো আমাদের নরবলির যোগানদার বানিয়েছেন, হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তাই করে আসছি, এখন না বললে কি করে হবে, আমরা সেই যুগেও ছিলাম, আমরা এই যুগেও আছি, আমরা ভবিষ্যতেও থাকব। নর বলির খড়্গ নিষিদ্ধ হল, কিন্তু সেই খড়্গের আজ জায়গা নিয়েছে বন্দুক পিস্তল, বোমা, অপহরণ, এবং অহরহ নরবলি চলছে, আজ আসামে জ্বলছে, হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হচ্ছে. . . কাল ত্রিপুরাতে সন্ত্রাসবাদের নামে আতঙ্ক খুন লোপাট জল ভাতের মত চলছিল, পরশু মণিপুর . . . মুম্বাই. . .দিল্লি. . .আমেরিকা. . . মিশর. . . সিরিয়া. . . ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তান পাকিস্তান. . .সমস্ত বিশ্ব জুড়ে চরম অমানবিকতা. . .চলছেই চলছে. . .এবং চলবে যতদিন না রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের বিভেদ ঘুচবে. . .সমাজতন্ত্র সঠিক ভাবে কাজ করবে তত দিন রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা পোষিত ও পালিত ''মাইপাড়াও''রা এই নিধন যজ্ঞ চালিয়ে যাবে। মানুষ মারার খেলা চলবে। তাই ঘরে ঘরে রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতিটি অংশে যারা আছেন তাদের ভাবনা চিন্তাধারা রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার ব্যক্তিত্বের আবেশে আবেগে চালিত হতে হবে এবং বহুলাংশে রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে ''রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা''দের মত ব্যক্তিত্বের যোগদান আবশ্যক। আমাদের সমাজে ''রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা'', ''কুন্তী'', ''দ্রৌপদী''. . . এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব খুবই জরুরী, যারা রাজতন্ত্রে থেকে সমাজতন্ত্রকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে প্রজাতন্দ্রের উন্নতির জন্য। মনে পড়ে গেলো আরও একটি নাটকের কিছু চরিত্রের কথা, বুদ্ধদেব বসুর ''প্রথমপার্থ''. . .নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য কর্মী শ্রী রাহুল দাশগুপ্ত. . .প্রযোজনায় ''প্রান্তিক'' সংস্থা. . .''দ্রৌপদী'' চরিত্রে আমার ভূমিকা. . .মহাভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রের একটি. . .অদ্ভুত লেগেছিল আমার. . .এত হাজার বছর পূর্বেও এত বলিষ্ঠ নারী চরিত্র. . .''দ্রৌপদী'' চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে মতাদর্শ গত জায়গায় অবস্থান করা যে ক্ষেত্রটি. . .আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল। ''কুন্তী'' ও ''দ্রৌপদী'' এবং কর্ণ এই তিনটি চরিত্রই মুখ্য। খুব বিখ্যাত একটি নাটক। এই নাটকটিও একটু অন্য ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার মনে আছে ''প্রথম পার্থ'' ''রূপমশিলচর সর্ব

ভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা”-তে আমার অভিনীতি প্রথম নাটক। এই নাটকটিও খুব প্রশংসিত হয়েছিল।

হাজার হাজার বছর পূর্বে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার প্রয়াস করেছিল, সেই কুকর্মের জন্য দ্রৌপদী শুধুমাত্র দুঃশাসন বা দুর্যোধনকে নয় যুধিষ্ঠির থেকে শুরু করে পঞ্চ পাণ্ডবকেও তার জন্য প্রকাশ্যে দায়ী করেছিলেন, এবং তার প্রতিবাদ স্বরূপ কুরু বংশ ধ্বংস করার জন্য যে পণ করেছিলেন তার ইতিহাস সবার জানা। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়তা হল, সেই যুগেও দ্রৌপদীর মত নারীও প্রতিবাদ করার স্পৃহা ও স্পর্ধা দেখিয়েছিল এবং পরিণামে কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছিল। আজ এই বিশ্বায়নের যুগে আমরা কি সেই স্পৃহা ও স্পর্ধা দেখাবার সাহস অর্জন করেছি। কোন নারী কি সমাজে. . .বিশেষ করে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত বংশের নারীরা, প্রকাশ্যে এভাবে স্বামী বা সমাজের অন্য পুরুষদের ব্যভিচারের, বিরুদ্ধে সরব হতে পারবে. . .প্রকারান্তরে, আমরা যদি মনিপুরের ইমাদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই আজকের সমাজের দুঃশাসনরাই মাদের বাধ্য করছে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ ইমারা প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় বিবস্ত্র হচ্ছে. . .আজ সমাজ অসংখ্য দুঃশাসনের সমাহার তাই প্রকাশ্যে দিবালোকে লক্ষ্মী ওরাং নামের কিশোরীকে রাজপথে বিবস্ত্র করার ঔদ্ধত্য আমরা দেখতে পেয়েছি। আর সম্প্রতি গৌহাটির মৌসুমী কাণ্ডতে চোখ বুলালেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরাই সেই যুগের দুঃশাসন থেকে শত গুণ দুঃসাহসী অসংখ্য দুঃশাসনকে জন্ম দিচ্ছি, প্রতিপালন করছি, এবং তাতে আমাদের বিন্দু মাত্র লজ্জা শরম নেই। আর তার থেকেও লজ্জাকর যে ঘটনা, আমরা নীরবে এই ধরনের ঘটনাবলীকে সায় দিয়ে যাচ্ছি, কখনও বা মেয়েদের চরিত্রহীন বলে, কখনও বা মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের দোহাই দিয়ে, কখনও বা সমাজের দোহাই দিয়ে, কিন্তু আমরা কখনও নিজে এর দায়ভার স্বীকার করে নিতে পারি না, আর পারি না বলেই অহরহ ঘটে যাচ্ছে আজও এইসব ঘটনাচক্র। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে অ-মানবিক কার্যকলাপ, দাঙ্গা, খুন, রাহাজানি, দুর্নীতি ইত্যাদি চলছে, তাতে মেয়েদের যোগদান কম। তাই আমাদের সমাজে রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা, দ্রৌপদীর ইত্যাদি এরকম অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের আমাদের সমাজের দুই ধরনের থিয়েটারেই বিশেষ করে জীবন থিয়েটারে, সমাজের হাত ধরতে হবেও দুই ধরনের থিয়েটার নারীদের আরও মানসিক ভাবে শক্তিশালী হতে হবে।

শুরুতে দ্বিধা ছিল, আদৌ এগোতে পারবো কিনা, কিন্তু চলতে শুরু করলে অনেক দূর পাড়ি দেওয়া যায়। শুরু কিভাবে করবো ভাবতে ভাবতেই শুরু করেছিলাম, এবার থামার জন্য নিজের রাশ টানছি। এবার আমায় থামতে হবে। এই হয়, সর্বক্ষেত্রেই শুরু করাটাই সবথেকে বেশী জরুরি, শেষ হবেই। চলুন যে যার মতো করে শুরু করি, সে জীবন থিয়েটার হোক আর থিয়েটার জীবনদর্শনই হোক। আমরা সবাই ভাবতে জানি, কিন্তু ভাবনার সমুদ্রের অগুনতি ঢেউগুলি শুধু যাওয়া আর আসা করতে থাকে, তারপর একসময় মনের কোনে আবার হারিয়ে যায়, ভাবনার বুদবুদ কে যে কোন ভাবে ধরে ফেলি চলুন এই আমি যে ভাবে আমার লেখনীর আধারে কাগজ বন্দী করে নিলাম। এত যে কাগজে কলমে যুদ্ধ করলাম তা আপনাদের জন্য নয় কিন্তু, প্রথম পাঠক আমি, আমার সাথে আমার যে কথোকথন আমার ভাবনার দোলায় চড়তে চড়তে আমার মনের জানলা দিয়ে অনেক কিছু দেখলাম, নিজেকে ফিরে দেখার সুযোগ করে দিলেন লক্ষণ ঘটক বাবু, উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, না হলে আমি কিন্তু সত্যি কখনও আমার ভাবনাগুলোকে চিত্রায়িত করতে পারি বলে জানতামই না।

আবার সেই আমিতে এসেই শেষ করছি, সব আমার জন্য,

আত্মশুদ্ধির জন্য, এ আমি থেকেই শুরু করতে হবে, আমি যে কত শক্তিশালী তা একটি বীজকে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়, একটি বীজের মধ্যে একটি বৃহৎ অঞ্চলকে গহীন ঘন সবুজ অরণ্যে পরিণত করার ক্ষমতা সুপ্ত থাকে। আমাদের সেই সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলে সমাজকে, আমাদের চারপাশকে মানুষের বাস যোগ্য করে তোলার প্রয়াস করতে হবে। একটি বীজ যখন মহীরূহে পরিণত হয়, এবং সেই মহীরূহ থেকেই অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হয়। মনে হতে পারে বীজ, অরণ্য, মহীরূহ. . .এগুলোর সাথে, সমাজ, থিয়েটার, নারী এসবের কি সম্পর্ক। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এ পৃথিবীতে সব কিছু একে অপরের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত। শিকড়ের সাথে জলের, গাছের পাতার সাথে সূর্যের আলোর, প্রখর রোদ্দুরের সাথে বৃষ্টির, আর এসব কিছুর সাথে জলের, গাছের পাতার সাথে সূর্যের আলোর, প্রখর রোদ্দুরের সাথে বৃষ্টির, আর এসব কিছুর সাথে সৃষ্টির, এবং এটাই সত্যি। আমরা সবাই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আমি, আপনি আমি, তোমরা আমি ও আমরা আমি সব আমি মিলে চলুন এগিয়ে যাই সভ্যতার দিকে, হাত বাড়িয়ে দিই যে আমি পেছনে রয়ে গেছে তার জন্যে, সমস্ত ‘‘আমি’’রা যে যার মত করে সে হতে পারে নাটক দিয়ে, গান দিয়ে, কবিতা দিয়ে, আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম দিয়ে, সবাই কে নিয়ে স্বপ্ন দেখার, এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হই।